

চার্বাক দর্শন

(রূপরেখা)

লভিকা চট্টোপাধ্যায়

নিউ গ্রুপ পাবলিশাস। প্রাঃ লিমিটেড
কলিকাতা-৭৩



প্রথম প্রকাশ :

আষাঢ় : ১৩৬২

জুলাই : ১৯৬২

প্রকাশক :

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট :

চন্দ্রাবলী

মুদ্রক :

শ্রীমতী বাণী ঘোষ

রেনবো প্রিন্টার্স

১এ, কার্তিক বোস লেন

কলিকাতা-৬

পূর্বভাষ

ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের একমাত্র প্রতিভূ চার্বাকের ছবি সুস্পষ্ট রেখায় রেখায়িত নয়। বোধকরি এ মতবাদ তার সমগ্র আকৃতিতে কোনদিন আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হবে না, কারণ ইতিহাসের নিগূঢ় পরিহাসে তার নিজস্ব বক্তব্যের সবটুকুই প্রায় আজ লুপ্ত। চার্বাক দর্শনের যে রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করেছি এই বই-এর মাধ্যমে, তার মালমশলার জোগানদার ভারতের ইতিহাসের চলার পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাসঙ্গিক নানা ধরনের রচনা, যদিও তা প্রধানতঃই চার্বাকেতর গোষ্ঠীর। তাতে চার্বাকের রূপ কি আকার নিয়েছে জানি না— তবে যদি এই বইখানি চার্বাককে সাধারণের দরবারে পরিচিত করতে সামান্য সাহায্যও করে, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আমার স্বামী প্রয়াত শ্রীস্বধাকর চট্টোপাধ্যায়কে—এই বই-এর কাজ নিয়ে অগ্রসর হবার পথে নানাভাবে যিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার কন্যা অনুরাধা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বই সরবরাহের মাধ্যমে আমার এই কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

পরিশেষে সুরুতজ্জ ধন্যবাদ জানাই শ্রীজানকি সিংহ রায় মহাশয়কে, যিনি প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বইটি সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

শান্তিনিকেতন

লজ্জিকা চট্টোপাধ্যায়

আদরের

অঙ্কুর-কে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা :

১। চার্বাক দর্শন ও বৃহস্পতি	...	১
২। নাস্তিকবাদ	...	৮
৩। চার্বাক দর্শনের আদিরূপ	...	১৪
৪। চার্বাক	...	১৭
৫। বার্ষস্পত্য	...	১৯
৬। লোকায়ত—আত্মীক্ষিকী, বিতণ্ডা ও হেতুবাদ	...	২২
৭। লোকায়ত ও চার্বাক	...	২৩
৮। চার্বাক সাহিত্য ও চার্বাক দর্শনে শ্রেণীগত ভেদ	...	৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি প্রসঙ্গে :

১। ভারতীয় দর্শনের পটভূমি	...	৪২
২। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ	...	৪৫
৩। ঈশ্বরবাদ	...	৬১
৪। চার্বাক সিদ্ধান্ত—আলোচনা ও সমালোচনা	...	৬৭
৫। চার্বাক ও বেদ	...	১২২
৬। চার্বাক সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন	...	১৪২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১। চার্বাক দর্শন ও বৃহস্পতি

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের একক প্রতিদ্বন্দিতার সূত্র ধরে ভারতের দর্শননীতির আসরে চার্বাক দর্শন প্রাচীনকাল থেকে তার নিজস্ব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বস্তুতাত্ত্বিক বা জড়বাদী ধারার সঙ্গে অভিন্ন সম্ভাষণ চার্বাক মতবাদ সাধারণতঃ আমাদের কাছে প্রতিভাত; কিন্তু কেবল এই পরিচয়েই চার্বাকী চিন্তা পূর্ণরূপে প্রকাশমান কিনা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে গায়ে গা মিলিয়ে ভারতেরই মাটিতে এই মতবাদ স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে বহুদিন ধরে প্রবহমান। ভারতীয় দার্শনিকরা নিজ নিজ মতবাদের রূপায়ণে এই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তির সম্ভাবনা অহুমান করে যুক্তি তর্কের সাহায্যে সেই আপত্তি খণ্ডনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের স্বরূপ প্রধানতঃ এক পক্ষের আয়োজন থেকে অহুমান করা ছাড়া আমাদের অগ্র উপায় নেই, কারণ, অপর পক্ষের অবস্থানের জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু ‘চার্বাক’ সংজ্ঞায় বিশেষিত এই অপর পক্ষ যে প্রতিদ্বন্দিতায় দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখে, সমরায়োজনের প্রস্তুতি থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

ভারতের দর্শন জগতে চার্বাক একটি সুপরিচিত নাম। এই দর্শনসম্বন্ধীয় ধারণার জন্ম আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রধানতঃ অশ্বের রচনার উপর; কারণ চার্বাক গোষ্ঠীর নিজস্ব রচনা হিসাবে ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’^১ নামে একটিমাত্র পুস্তক বর্তমানে আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এই পুস্তকের মধ্যেও চার্বাক দর্শনের যে প্রতিফলন, তা সম্ভবতঃ চার্বাকের বিশেষ এক শাখার সিদ্ধান্ত। কারণ চার্বাক দর্শনের যে ছবি অশ্বত্রু পাওয়া যায় তা একটু ভিন্ন। অবশ্য সংখ্যায় একক এবং চার্বাক দর্শনের অংশমাত্রের পরিচায়ক হলেও চার্বাকী বৈশিষ্ট্যের বিচারের ক্ষেত্রে চার্বাক পক্ষের একমাত্র নিজস্ব দলিল হিসাবে এই পুস্তকের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার উৎস প্রধানতঃ

- ১। জয়রাশি ভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ আত্মমানিক অষ্টম শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা হয়; Tattvopaplavasimha, Intro, P. X

চার্বাকের ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চার্বাকী মতবাদের সমালোচনা—যেখানে চার্বাক সব সময়েই পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থিত। অর্থাৎ চার্বাকী বক্তব্যের কেবলমাত্র সেই অংশগুলি প্রচারিত হয়েছে যাহার মারফৎ, যেগুলি বিরোধিতার জন্য অপেক্ষা যুক্তির তুণে বাণ নিয়ে প্রস্তুত। ভারতীয় দর্শনের সব বিভাগেই চার্বাক মত এভাবেই উপস্থাপিত। কিন্তু চার্বাকী মতের সমালোচনায় প্রধানতম ভূমিকায় অবতীর্ণ বোধ হয় গ্রায় দার্শনিক জয়ন্ত ভট্ট এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদ্বয় শান্তরক্ষিত ও কমলশীল। গ্রায় দার্শনিকের লেখা গ্রন্থ : “শ্রায়মঞ্জরী” এবং বৌদ্ধ আচাৰ্য্যদ্বয় রচিত “তত্ত্বসংগ্রহ” ও “তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা” থেকে চার্বাক মতবাদ সংক্ষেপে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায় ব্যাখ্যা-সম্মত “তত্ত্বসংগ্রহে”। রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী বলে ধারণা করা হয়। “শ্রায়-মঞ্জরীর” রচনাকাল সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে অষ্টম-নবম শতাব্দী চার্বাক দর্শনেরও পূর্ণ বিকাশের যুগ এবং এ-যুগের দার্শনিকের চার্বাককে এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা উন্নয়ন করেছিলেন।

ভারতীয় দর্শনমতের যে সংকলন গ্রন্থগুলি চার্বাক মতের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বেশির পাণ্ডা যায় তার মধ্যে প্রাচীনতম হলো অষ্টম শতাব্দীতে রচিত জৈন দার্শনিক তপিত্ত শ্রীচর “বহুদর্শনসমুচ্চয়”।^{১৪} তবে চার্বাক মতের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তথ্য চতুর্দশ শতাব্দীর মাদিবাচায়েব লেখা “সর্বদর্শনসংগঠ” থেকে পাওয়া যায়। মাদিবাচায়েব রচনা বলে প্রচলিত “সর্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ” এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা “সর্বমতসংগ্রহ” প্রভৃতি গ্রন্থও চার্বাক মতবাদের সামান্য বর্ণনা আছে। এই সংকলনগ্রন্থগুলি ছাড়াও চার্বাক মত সংক্ষেপে আমরা কিছুটা পরিচিত হই কৃষ্ণ মিশ্র রচিত একাদশ শতাব্দীর “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”^{১৫} নামে রূপক নাটকে, তার চার্বাক চরিত্রের মাধ্যমে। এই পুস্তক-

১৪। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের মতে শান্তরক্ষিত এবং কমলশীলের আত্মনানিক সময় ৭০৫-৭৩২ ও ৭১০—৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। (Tattvasamgraha pp. XVI ও XCVI)

১৫। শ্রায়মঞ্জরীর রচনাকাল সংক্ষেপে Keith, A. B., A History of Sanskrit Literature, p. 484

১৬। Ibid, p. 499

১৭। Ibid, p. 500

১৮। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল সংক্ষেপে চার্বাক দর্শন, পৃঃ ২০

গুলিতে চাবাক দর্শনের যে বিশিষ্ট রূপের প্রকাশ, সেই রূপেরই প্রতিফলন দেখা যায় ভারতীয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে চাবাক মতের বর্ণনায়। এই সব বর্ণনা কোন কোন ক্ষেত্রে ‘চাবাক’ বিশেষণে চিহ্নিত। আবাব কোথায়ও বা ‘লোকায়ত’ বা ‘বাহস্পতি’ সংজ্ঞায় পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কোন নামের স্বাক্ষর বহন না করেও বর্ণনাকুলি চাবাকী মতের প্রতিফলন। ভারতের দর্শনজগতে এই বিশেষ মতবাদ ‘চাবাক’ সংজ্ঞার মাধ্যমে পরিচিত এবং চাবাক দর্শন হিসাবে পরিজ্ঞাত।

চাবাক দর্শন সম্বন্ধে যেটুকু নিভরযোগ্য তথ্য আমরা পাই তা থেকে এই মতবাদের স্থানার কাল বা ‘চাবাক’ এই নামের সঙ্গে ইহার যোগাযোগের কাকিতা কিছুই দৃষ্টিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তাধারা চাবাক দর্শন নামে পরিচিতি লাভ করলেও চাবাক নামে কোন ব্যক্তিকে এর প্রবর্তক বলে স্বাক্ষর করা হয়নি। ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’, ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ ইত্যাদি গ্রন্থে এই মতবাদের আদি প্রচারক হিসাবে বৃহস্পতির নাম করা হয়েছে। ব্যক্তিকথা চাবাক এই গ্রন্থগুলিতে স্বাক্ষরিত পলেও বৃহস্পতিশিষ্য হিসাবে এই চাবাকের যে গৌণ মর্যাদা তা থেকে এই বিশিষ্ট মতবাদের চাবাক নামমর্যাদা হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বৃহস্পতিশিষ্য চাবাক অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থগুলির বর্ণনা অনুসারে এই মতের একজন শক্তিশালী প্রচারক। কারণ শিষ্য প্রশিষ্যের মাধ্যমে তিনিই মতটিকে চতুর্দিকে প্রচার করেন। তবে এ সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারের ঘন প্রলেপে ঢাকা। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’, ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ প্রাচীন এই দর্শনের প্রবর্তকের সম্বন্ধে যে খাটি ঐতিহাসিক কোন তথ্য সংবরহ করতে সক্ষম নয়, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। ভারতীয় ঐতিহ্যে চাবাকদর্মী মতের সঙ্গে বৃহস্পতি নামে কোন এক ব্যক্তির যোগ হয়ত প্রাচীন কাল থেকে আছে। এই সব গল্পে ভারতের এই ঐতিহ্যসম্মত ধারণাবই অনুকথন লক্ষ্য করা যেতে পারে। মনে করা অস্বাভাবিক নয়, যে ‘চাবাক’ নামের সঙ্গে এই মতবাদের যোগের কারণ অনুসন্ধানীর চাবাক নামধারী ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করেছেন এবং এই ব্যক্তিবিশেষেরই পরিচিতি চাবাকবাদের একজন শক্তিশালী প্রচারক এবং বৃহস্পতিশিষ্য হিসাবেই।

৭। বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিক শিরোমণিনা চাবাকেন ...সমং পৃঃ ২, লোকায়তমেব শাস্ত্রং.....বাচস্পতিনা প্রণীত চাবাকায় সমর্পিতম্। তেন চ শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারেনাস্মিল্লোকে বহলীকৃতং তন্মম, প্রাচ, পৃঃ:৬৪-৫

চার্বাক গ্রন্থ “তত্ত্বোপপ্লবসিংহের” রচয়িতা জয়রাশি ভট্ট বৃহস্পতিকে যথেষ্ট প্রশংসা করে স্বমতানুসারী ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি তাঁর মতে বৃহস্পতি কর্তৃক রচিত।^৮ এ ছাড়াও তাঁর গ্রন্থে আর কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রগুলি তাঁর মতে আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও অগ্ন্য অর্থ-ছোতক এবং তিনি মনে করেন যে সেই ভিন্ন অর্থ স্বরণে রেখেই সূত্রকার সূত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।^৯ সূত্রগুলির রচয়িতার নাম তিনি উল্লেখ না করলেও অগ্ন্য গ্রন্থে এগুলিকে বাচস্পতি বা বৃহস্পতির রচনা বলা হয়েছে।^{১০} স্বল্পতম অক্ষরবিশিষ্ট কিছু সূত্রের মাধ্যমে প্রথম আত্ম-প্রকাশ ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত ধারা এবং ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ শাখারই আদি রচনা এই জাতীয় কিছু সূত্রের সমষ্টি বলে মনে করা হয়। সূত্রগুলিতে অক্ষরসংখ্যা নিয়মনের দিকে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংক্ষিপ্ততম অবয়বে ব্যাপকতম অর্থ বাঞ্জনার প্রবণতা প্রত্যেক সূত্রে দেখা যায়।^{১১} এইভাবে ভারতীয় দর্শনসাহিত্যে আদিগুরুদের যে রচনার মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের উদ্বোধন তা অধিকাংশ

৮। ইদমেব চেতসি সমরোপ্যাহ ভগবান্ বৃহস্পতিঃ ‘পরলোকিনোহি তাবৎ পরলোকাভাবঃ’ পৃঃ ৪৫, ইদমেব চেতসি সমরোপ্য উক্ত ‘শরীরাদেব’ ইতি বৃহস্পতিঃ, পৃঃ ৮৮, ‘পরমার্থবিভক্তঃ’ (পৃঃ ১) এবং ‘স্বরগুরোঃ’ (পৃঃ ১২৫) শব্দ দুটি বৃহস্পতির উদ্দেশ্যেই নির্দেশিত বলে মনে হয়।

৯। অথাৎসত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ, পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্বানি; তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়সংজ্ঞা, পৃঃ ১

১০। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ঃ গ্রন্থের ব্যাখ্যা তর্করহস্যদীপিকাতে অথাৎসত্ত্বং... পৃথিব্যাপ...এবং তৎসমুদায়ে... এই তিনটি সূত্র বাচস্পতি বা বৃহস্পতির উক্তি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। যদুবাচ বাচস্পতিঃ পৃথিব্যাপঃ...), তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, পৃঃ xii, কমলশীলের তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে (১৮৫৭ ও ১৮৬০) লোকায়তসূত্র হিসাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্রের উদ্ধৃতি আছে। সূত্র দুটি কমলশীলের উদ্ধৃতিতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়, যথা—পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্বানি তেভ্যশ্চৈতন্যম এবং তৎসমুদায়ে

১১। সূত্রের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে

অল্লাক্ষরম্ অসংদিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।

অস্তোভম্ অনবত্তং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥

(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১-এর ভামতী টীকায় উদ্ধৃত)

ক্ষেত্রেই একাধিক অর্থের ছোতনা করেছে। এবং পববতী যুগের ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, এগুলি মাধ্যমে বহু স্থলে পরস্পরবিরোধী সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কলে একই দর্শনে ভিন্নমতাবলম্বী বহু শাখাগোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষণীয়। “তত্ত্বোপলব্ধব-সিংহ”-তে উদ্ধৃত সূত্রগুলি থেকে মনে হয়। অস্বাভাবিক নয় যে সূত্রকে প্রাথমিক স্থান দিয়ে দার্শনিক সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে চাবাঁক দর্শন ভারতীয় সাধারণ ধারারই অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং যে সূত্রসমষ্টির মাধ্যমে চাবাঁক সাহিত্যের সৃচনা তার রচয়িতা হিসাবে বৃহস্পতির পরিচিতি চাবাঁক দর্শনের আদিগুরু রূপে।

“তত্ত্বোপলব্ধবসিংহ”-তে উদ্ধৃত সূত্রগুলির একটি (অথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাশ্রামঃ) কে ত্রায়মঞ্জরীতে চাবাঁক দর্শনের আদি সূত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।^{১২} এ প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টের উক্তি থেকে মনে হয় যে চাবাঁক গ্রন্থকাররা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে এই আদি সূত্রে অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ধারণায় ব্যাখ্যাটি প্রকৃত সূত্রকারেরই অনুমোদন সাপেক্ষ। “তত্ত্বোপলব্ধবসিংহ”তে উদ্ধৃত অত্র দুটি সূত্র কমলশীল রচিত “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”-তে স্থান পেয়েছে লোকায়েত সূত্র হিসাবে।^{১৩}

মোট কথা সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থের ভাষ্যকারদের রচনায় প্রচুর সূত্রের উদ্ধৃতি আছে। এগুলি কখনও চাবাঁক, কখনও লোকায়েত, আবার কখনও বা বারহস্পতি বিশেষণে বিশেষিত।^{১৪} “সর্ব-দর্শনসংগ্রহে” চাবাঁক দর্শনের বর্ণনায় কিছু শ্লোকের অন্তর্ভুক্তি আছে। এগুলি মাধবাচার্যের মতে চাবাঁক সিদ্ধান্তের প্রবর্তক বৃহস্পতির উক্তি।^{১৫} এই শ্লোকেবই অনুরূপ কিছু শ্লোক দেখা যায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাতায়, কোথায়ও চাবাঁক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, কোথায়ও বা অত্রভাবে। এই শ্লোকগুলির রচয়িতা প্রকৃতই বৃহস্পতি নামে কোন ব্যক্তি কিনা তা বলা কঠিন। চাবাঁক মতবাদের সঙ্গে বৃহস্পতির নামের যোগ বহন করে কয়েকটি উপাখ্যান

১২। ত্রায়মঞ্জরী ১, পৃঃ ৫২

১৩। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১৮৫৮ ও ১৮৬৪। ‘শবীরাদেব’ সূত্রটির পরিবর্তে তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে উদ্ধৃত হয়েছে ‘কায়াদেব’ এই সূত্র।

১৪। HIP. iii, p. 516

১৫। সমং, পৃঃ, ১৩—১৫

প্রচলিত। কিন্তু ষথার্থ ইতিহাসের পর্ষায় এগুলিকে কোনক্রমেই ফেলা যায় না। দেবতাদের গুরুর নাম বৃহস্পতি। চার্বাক আচার্য বৃহস্পতির প্রকৃঃ পরিচয় যাই হোক না কেন, তিনি ক্রমে এই দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে একাত্মতা লাভ কবেছেন। “প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকে চার্বাক মতের প্রচারক বৃহস্পতি এই দেবগুরুর সঙ্গে অভিন্ন এবং বাচস্পতি আখ্যায় অভিহিত।^{১৬} বাচস্পতি শব্দের অর্থ বাক্যের অবিপতি। দেবগুরু বৃহস্পতি সাধারণতঃ এই নামের সঙ্গে যুক্ত। প্রচলিত সংস্কৃতিব বিরুদ্ধে যে ধারণা এই চার্বাক মতবাদের মাধ্যমে প্রচারিত, দেবতাদের গুরুর সঙ্গে সে ধারণার যোগের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ ক্ষেত্রে উভয়ের যোগের সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে কিছু কল্পনার সাহায্যে। আর এই কল্পনা বিভ্রান্তি বা মায়ামোহের রূপ নিয়ে বিভিন্ন উপাখ্যানে অন্তর্ভুক্ত। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদের বর্ণনা অনুযায়ী দেবগুরু বৃহস্পতির বিষয়স্বত্বে প্রয়োচনাত্মক বিভ্রান্তিকর শাস্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অসুরদের তুলনায় চালিত করা এবং অসুরগুরু ঋক্রেয় ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি অসুর-কুলকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কাজে ব্রতী হন।^{১৭} বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে অসুরদেব মোহগ্রস্ত করার জন্য ‘মায়ামোহ’ নামধারী ব্যক্তি কর্তৃক তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বৈদবিরোধী মতবাদ প্রচারিত হয় এবং এই মতগুলির প্রভাবে অসুরবা বৈদিক জ্ঞানকে উপহাস করার প্রেরণা পান।^{১৮} বৈদবিরোধী এই মতগুলির মধ্যে চার্বাক দর্শনের অন্তর্ভুক্তি আছে। এবং বৃহস্পতির বচন হিসাবে অগত্যা প্রচলিত শ্লোকের কয়েকটি এখানে দৃষ্ট হয়। “প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের মধ্যেও চার্বাক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ট্রংসমার্টী বাচস্পতি বা দেবগুরু বৃহস্পতির প্রচেষ্টার মূলে ‘মহামোহেব’ প্রভাবের কানকারিতার উল্লেখ আছে।^{১৯}

চার্বাকী মতবাদেব প্রাথমিক রূপ সম্বন্ধে নানা রকম ধারণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আলোকপাতের অভাবে এর সবগুলিই অপরিষ্কৃত। পরিণত রূপের এক বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘চার্বাক’ বিশেষণটি ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনের পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রধানতঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে। ‘লোকায়ত’ এবং বৃহস্পতি বচিত শাস্ত্র হিসাবে ‘বাহস্পত্য’

১৬। প্রচ, পৃঃ ৬৪

১৭। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ, ৭।৮,২

১৮। বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১৮।১৪--২৬

১৯। প্রচ, পৃঃ ৬৪—৫

এই দুটি সংজ্ঞারও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এই একই মতের ক্ষেত্রে—‘চার্বাক’ নামের সঙ্গেই একত্রে। হরিতদ্র সূরীর “ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়” গ্রন্থে চার্বাক এবং লোকায়ত অভিন্ন।^{২০} এই গ্রন্থের চতুর্দশ শতকের টীকাকার গুণরত্ন চার্বাক ও লোকায়তকে একই দর্শনের নামান্তর বলেন।^{২১} অষ্টম শতাব্দীর কমলশীলের রচনা অনুসারে ‘চার্বাক’ এবং ‘লোকায়ত’—একই দার্শনিক গোষ্ঠীর দুটি বিভিন্ন নাম।^{২২} “সর্বমতসংগ্রহে” চার্বাককে লোকায়ত শাস্ত্রের প্রবর্তক বলা হয়েছে।^{২৩} এই গ্রন্থেরই অগ্রত্ব লোকায়ত বৃহস্পতির রচনা হিসাবে বর্ণিত।^{২৪} ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ এবং ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ও লোকায়ত চার্বাক দর্শনেরই নামান্তর।^{২৫} অমরসিংহ রচিত অভিধান “অমরকোষে” চার্বাক এবং লোকায়তিক সমার্থক শব্দ হিসাবে নির্দেশিত।^{২৬} ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনে ‘চার্বাক’ নামের মাধ্যমে বৃহস্পতি প্রবর্তিত যে মতের প্রকাশ তা সব সময়ই ‘লোকায়ত’ নামের সঙ্গে যুক্ত। সেইজন্তু ভারতদর্শনের ইতিহাস লেখায় ঘাঁরা ব্রতী, তাঁদের কাছেও ‘লোকায়ত’ সংজ্ঞা সাধারণতঃ চার্বাক দর্শন অর্থেই প্রযোজ্য। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন, ‘Lokayata (lit., that which is found among people) seems to have been the name by which all Carvaka doctrines were generally known’.^{২৭} P. T. Raju-র মতে বৃহস্পতি, চার্বাক ও লোকায়ত এই তিনটি নাম একই ব্যক্তির। এবং এই ব্যক্তিই চার্বাক দর্শনের আদি গুরু। এর প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ বৃহস্পতি। ‘লোকায়ত’ এবং ‘চার্বাক’, এ দুটি তাঁর বিশেষ উপাধি—প্রথমটি, তাঁর প্রবর্তিত

২০। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, ৭২ ও ৮৫

২১। তন্মামনি চার্বাকা লোকায়তা ইত্যাদীনি, তর্করহস্যদীপিকা, পৃঃ ৩০০

২২। কমলশীল লোকায়তদের মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে লোকায়ত (পৃ পৃঃ ৫০০, ৫৪২) এবং চার্বাক (পৃপৃঃ ৫২৫, ৫৩৮, ৫৪৪, ৫৪৬) দুটি শব্দ একই গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ব্যবহার করেছেন।

২৩। লোকায়তশাস্ত্রপ্রবর্তকস্ত চার্বাকস্ত, পৃঃ, ১৫

২৪। পৃঃ ১৪—৫

২৫। অতএব তস্ত চার্বাকমতস্ত লোকায়তমিত্যর্থমপরং নামধেয়ম, সমং, পৃঃ ২ ; প্রঃ, পৃপৃঃ ৬৪—৬

২৬। চার্বাকলোকায়তিকৌ, পৃঃ ৬৬৮

২৭। HIP. i, p. 78n

মতবাদের বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির এবং দ্বিতীয়টি ঐ মতবাদে অন্তর্ভুক্ত আপাতঃ রমণীয় বচনের জন্য ।^{২৮}

চার্বাক দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আমাদের কৌতূহলের সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, যে চিন্তাধারার সঙ্গে একান্তভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে ‘চার্বাক’ নামের প্রথম আবির্ভাব অঙ্গুমিত হয় তার উদ্ভব কোন সময়ে এবং আদিপর্বের এই মতের সঙ্গে পরবর্তী যুগের চার্বাক মতের সম্বন্ধ কি? দ্বিতীয়তঃ, ‘বাহ্প্পত্য’ এবং ‘লোকাযত’—‘চার্বাক’ নামের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত সংজ্ঞা দুটির প্রয়োগ প্রাচীন যুগেও কি অঙ্গুরূপ অর্থেই ছিল? ভিন্ন অর্থে হলে এই সংজ্ঞাগুলির দ্বারা সূচিত আদি মতবাদের স্বরূপ কি?

প্রশ্নগুলির সমাধানের আশায় ইতিহাসের পথ ধরে আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

২। নাস্তিকবাদ

বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে পরিচিত চার্বাক দর্শন ‘নাস্তিক’ এই বিশিষ্ট অভিধায় ভূষিত—কোথায়ও বা প্রচ্ছন্নভাবে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য বিশেষণের সাহায্যে। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরী নাস্তিক পংক্তিতে চার্বাকের স্থান রেখেছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের সমীক্ষায় চার্বাক নাস্তিকদের শিরোমণি। আদি চার্বাক রূপের চিত্রণে চার্বাক দর্শনের এই নাস্তিকী বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। কারণ প্রাচীন ভারতে নাস্তিকবাদের অস্তিত্বের সপক্ষে বিভিন্ন তথ্যের সাক্ষ্য আছে।

নাস্তিকবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনার সূচনায় ভারতীয় সাহিত্যে ‘নাস্তিক’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আমাদের ধারণা পরিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন। পাবিনি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাকরণকার পতঞ্জলি^{২৯} তাঁর “মহাভাষ্য” গ্রন্থে ‘নাস্তিক’ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ‘আস্তিক’ শব্দের সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছুটা আলোক-

২৮। The Philosophical Traditions of India. p. 86 ; দক্ষিণ-বঙ্গ শাস্ত্রীর মতে “ ‘চার্বাক’ শব্দের একটি অর্থ ‘বৃহস্পতি’, চার্বাক অর্থাৎ বৃহস্পতির বাক্য বা উপদেশ যাহারা অঙ্গুমরণ করে তাহাদিগকে চার্বাক বলা যায়—” চার্বাক দর্শন, পৃঃ ৮

২৯। মহাভাষ্য, ৪।৪।১

পাত করেছেন। পতঞ্জলির মতে ‘অস্তি’ বা ‘আছে’ এই ধারণার বশবর্তী লোকেরা আস্তিক এবং এর বিপরীত, ‘ন অস্তি’ এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত সকলে ‘নাস্তিক’ পদের দ্বারা অভিধেয়। আস্তিকেরা যে বিশেষ বস্তু বা ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন, সেগুলিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য নাস্তিকেরা স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পতঞ্জলির “মহাভাষ্যে” অবশ্য এসবের কোন বিস্তৃত বিবরণ নেই। কিন্তু নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থে যে সব উক্তি দেখা যায়, তা থেকে এ বিষয়ে কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে নাস্তিকদের দ্বারা অস্বীকৃত বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে বৈদিক সমর্থনকে যুক্ত করা হয়েছে।^{১০} “মহুসংহিতা” গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ‘নাস্তিক’ শব্দের উল্লেখ আছে। মহুর মতে বেদনিন্দকেরা ‘নাস্তিক’ আখ্যায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য।^{১১} বেদবিরোধী নাস্তিকদের কার্যকলাপে বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক মহুর সমর্থন না থাকাই স্বাভাবিক। ‘মহুসংহিতা’ গ্রন্থের নানা স্থানে নাস্তিকদের নানাভাবে নিন্দা করা হয়েছে। ‘মহুসংহিতার’ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টাকাকার মেধাতিথি যে উক্তি করেছেন, তা থেকে নাস্তিকদের অবিখ্যাসের পরিধির বিস্তার সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। নাস্তিকদের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞেই সীমাবদ্ধ নয়, পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্বেও তা বিস্তৃত। মেধাতিথির রচনায় এই ইঙ্গিত আছে।^{১২} পাণিনিরই অপর একটি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভট্টৌজি নীক্ষিত নাস্তিকদের অস্বীকৃতির এই বিস্তৃততর পরিধির উল্লেখ করেন।^{১৩}

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ঐতিহ্যের প্রভাবপুষ্ট সকলের কাছে ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞাটি বৈদিক প্রাধান্যের বিরোধীদের অর্থে ব্যবহার্য। ভারতের দর্শনগুলিকে ‘আস্তিক’ এবং ‘নাস্তিক’ এই দুই স্থানির্দিষ্ট বিভাগে চিহ্নিত করার মূলেও আছে এই

১০। মহাভারত ১২।১২।৫; ১২।২৭০।৬৭; ‘নাস্তিক্যামন্ত্রথা চ বেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া’, মহাভারত, ১২।২৬২।৬৭

১১। ‘নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ’ মহু, ২।১১

১২। ‘নাস্তিকা লোকায়াতিকাদয়ঃ, নাস্তি দত্তং নাস্তি হতং নাস্তি পরলোক ইতি যে স্থিতপ্রজ্ঞা’ ৩।৫০; ‘নাস্তিকৈঃ পরলোকাপবাদিভিলোকায়-তিকাঠেঃ...’, ৮।২২; ‘নাস্তি পরলোকা নাস্তি দত্তং নাস্তি হতমিতি নাস্তিকঃ’, ৮।৩০২

১৩। অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্ধন্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্ধন্য স নাস্তিকঃ’, সিদ্ধান্তকোমুদী, ৪।৫।৬০

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রেরণা। বেদ এবং উপনিষদসমূহসারী দর্শনসমূহ এই বিভাগ অনুসারে আন্তিক, অপর পক্ষে চার্বাকদের সঙ্গে একযোগে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, কেবলমাত্র বেদবিরোধিতার অপরাধে ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির ধারকদের কাছে নাস্তিক আখ্যায় অভিহিত।^{৩৪}

ভাষ্যকার মেধাতিথি যখন নাস্তিক শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের উল্লেখ করেন, তখন এ ব্যাপারে ব্যাপকতর অন্য মতের প্রতিফলন তাঁর ব্যাখ্যায় দেখা যায়। ‘অস্তি’ পদের এই ব্যাপক অর্থ বৈদিক প্রাধান্যের অনুমোদনে সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ মূল্যবোধের স্বাক্ষরিতিকে আপন গভীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিতে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ভারতের আন্তিক অন্যান্য দর্শনসমূহের সঙ্গেই এক আসনে বসাব অধিকারী। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার বিচারে বিষয়টি আরও পরিষ্কৃত হবে। জৈন দর্শনকার হরিভদ্র তাঁর “ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়” গ্রন্থে^{৩৫} আন্তিকবাদ হিসাবে যখন বৌদ্ধ ও জৈন মতের উল্লেখ করেন, আন্তিক সংজ্ঞা তখনই এই পরিবর্তিত অর্থেই ব্যবহৃত। গ্রন্থের অন্তর্গত ‘আন্তিকবাদিনাম্’ পদটির অর্থ টীকাকার সোমনতিস্ক দ্বার মতে ‘পরলোকগতিপুণাপাপান্তিকাবাদিনাম্’, অর্থাৎ আন্তিকবাদী বলতে তাদেরই বোঝায়, পরলোক, পুণ্য, পাপ ইত্যাদিতে যাদের আস্থা আছে। চার্বাকরা কিন্তু এই পরিবর্তিত^{৩৬} পটভূমিকাতেও নাস্তিক এবং হরিভদ্র সূরীর গ্রন্থে এঁদের নাস্তিকশোঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘তত্ত্ব-সংগ্রহে’ লোকায়ত মতকে ‘পরানাস্তিকতা’ আখ্যায় অভিহিত করার কারণ পরলোকে অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্যই। নাস্তিক হিসাবে চার্বাকদের এই বিশিষ্ট ভূমিকারই প্রকাশ মাধবাচার্যের ‘নাস্তিকশিরোমণি’ সংজ্ঞার মধ্যে। প্রকৃত-পক্ষে ‘ন অস্তি’ এই ভাবনায় প্রভাবিত অথবা অবিশ্বাসী অর্থে ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞায় কেবল চার্বাকদেরই বোঝায়। ভারতের ঐতিহ্যগত সাধারণ মূল্যবোধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ এবং জৈনরা স্বাভাবিকভাবেই এই নাস্তিক্যভাবের প্রভাবের

৩৪। IP, i, p. 20 ; সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৫।৭৭-তে বৌদ্ধ মতকে নাস্তিক মত বলা হয়েছে।

৩৫। এবমান্তিকবাদিনাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্, যস, ৭৭

৩৬। তত্ত্বসংগ্রহ, ১৮৭০

বাইরে। যদিও বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার না করার জন্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সমর্থকেরা এঁদের আন্তিকের মর্বাদ দিতে চাননি।

মোট কথা 'নাস্তিক' এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহী মনোভাবের মূর্ত প্রতীক চার্বাক। সেইজন্য ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে নাস্তিকবাদের বিভিন্ন বর্ণনায় চার্বাকী চিন্তার আদি রূপের অনুসন্ধান করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ব্রাহ্মণ জাবালির উক্তির মধ্যে নাস্তিকবাদের এক বিবরণ আছে।^{১৩} পিতার মৃত্যুর পর ভরত বনবাসী রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্য অনুবোধ জানালে পিতৃসত্য পালনে কৃতসঙ্কল্প রাম তাঁর সেই অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং অরণ্যজীবনেও কঠোরতা বরণের সমর্থনে অভিমত জ্ঞাপন করেন। রামকে কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ জাবালি উপদেশাত্মক এক বিবৃতি দেন এবং রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত নাস্তিকবাদ এই প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করে। জাবালি বলেন যে পারলৌকিক ধর্মের মোহে বৈষয়িক স্বপ্নকে বিসর্জন দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। এর ফলে বর্তমান জীবন দুঃখময় হয়, কিন্তু পরিণামে দেহত্যাগের পর স্বর্গে কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ফলভোক্তার দেহ-তিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নেই। স্বপ্ন প্রভৃতি ভোজ্য বস্তুর সাহায্যে প্রত্যাশগ্রাহ্য যে ভোগ সম্ভব, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমবা সেটাকেই কেবল নষ্ট করি, নতুন কোন ফল পাই না। জাবালি বলেন যে মৃত্যুর পর প্রাণির কোন অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই মৃত্যুর উদ্দেশ্যে আমরা যে ভোজনের আয়োজন করি তা নিরর্থক হয়। আপাতঃ রমণীয় হলেও জাবালির উপদেশকে রাম প্রতিপালনের অযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন এবং এঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ সঙ্কল্প পবিত্যাগ করেননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামায়ণকারের বর্ণনায় জাবালির মতবাদ বৌদ্ধ নাস্তিকবাদের সমগোত্রীয়। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যক্রান্তিও রামায়ণে দেখা যায়।^{১৪} জাবালির নাস্তিক মতের মধ্যে পরবর্তী যুগে 'চার্বাক' নামের সঙ্গে যুক্ত দর্শনের রূপ

১৩। রামায়ণ, ২।১০৮

১৪। 'যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতঃ নাস্তিকমত্র বিজ্ঞি', রামায়ণ, ২।১০৯।৩৪

সুপরিচ্ছট। যদিও ‘চার্বাক’ বিশেষণটি এই মতের প্রসঙ্গে রামায়ণে উল্লিখিত হয়নি।

মহাভারতের মধ্যেও আমরা নাস্তিকবাদের এক বর্ণনা পাই।^{৩০} দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত পঞ্চপাণ্ডব যখন বন থেকে বনান্তরে ঘুরে অশেষ দুর্দশায় কালাতিপাত করছিলেন, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত দ্রৌপদীর উক্তিৰ মাধ্যমে এই ‘নাস্তিকা’ মতের প্রকাশ। দ্রৌপদী এখানে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের অল্পকূলে নানা ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন। যে স্বাচ্ছন্দ্য নিজ শক্তিতে অর্জন করে নেবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস তাঁর বক্তব্যে লক্ষণীয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাক্তন কর্মের সংস্কার, অদৃষ্ট ইত্যাদি কয়েকটি ধারণা প্রচলিত। এগুলির দ্বারা পূর্ণ প্রভাবিত মানুষ গভীরতম দুঃখেও বিচলিত না হয়ে নিজের দুর্দশাকে অতীতেরই স্বকৃত কর্মফল হিসাবে বিচার করেন এবং ধীরভাবে তা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকেন। মোক্ষকে চরম লক্ষ্য স্থির করে তারই প্রস্তুতি হিসাবে প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপকে এই শ্রেণীর লোকেরা নিয়ন্ত্রিত করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির এই অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। ঈশ্বরে যারা বিশ্বাসী তাঁরা ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার এবং ধর্ম ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্রৌপদীর ভাষণে এই ধরনের সব কিছু মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর মতে ভাগ্যের কবলে আত্মসমর্পণ না করে মানুষকে তার ভবিষ্যৎ সুখের ক্ষেত্র স্বীয় কর্মের দ্বারা প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত। উত্তম মধ্যম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যত জীবনের গতির উপায় একমাত্র কর্মের মাধ্যমে হতে পারে এবং কর্মের ফল অপরিহার্য। মানুষের মোক্ষলাভ অভিলାষের মূলে রয়েছে তার বুদ্ধির মোহগ্রস্ততা। দ্রৌপদীর ‘কর্ম’ এখানে সনাতন ধর্মের প্রতিদ্বন্দী। ধর্মের সংজ্ঞা হিসাবে এ প্রসঙ্গে বৈদিক এবং যুগান্তমোদিত অন্ত্যগ্ন আচার এবং কর্তব্যের সঙ্গে সত্যবাদিতা, নম্রতা, বদান্ধতা ইত্যাদি চরিত্রগত নানা গুণেরও উল্লেখ আছে। দ্রৌপদীর মতে ধর্মকে একান্তভাবে অবলম্বন করেও যে ঐহিক উন্নতি লাভে যুধিষ্ঠির অসমর্থ, ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজ শক্তিতে কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দুর্ধোধন তা অর্জন করেছেন।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও জ্রোপদীর অভিযোগ আছে। যুধিষ্ঠিরকে বিপদ এবং দুর্ধোদনকে সম্পদ প্রদান করার মধ্যে তাঁর যে পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ তার জন্য জ্রোপদী ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন। কর্মফলবাদের নীতি অনুসারে স্বকৃত কর্মের ফল প্রত্যেককে ভোগ করতে হয়। এই নীতি স্বীকৃতি পেলে ঈশ্বরও তাঁর কৃত কর্মের জন্য পাপে লিপ্ত হতে এবং তদনুযায়ী ফল ভোগ করতে বাধ্য। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তিনি যে স্বকৃত পাপের ফল ভোগের ব্যাপারে অব্যাহতি লাভ করেন, তার মূলে ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রতাপ কার্যকরী। মোট কথা হল, নিজ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিস্বকৃত কর্মের মাধ্যমেই কেবল জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব, ধর্ম, কর্মফল বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়। জ্রোপদী তাঁর বক্তব্যে এটাই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

প্রচলিত আচার এবং ধর্মবোধের বিরোধিতায় জ্রোপদীবর্ণিত নাস্তিকবাদ আমাদের পরিচিত চার্বাক মতের মূল নীতিগুলির অনুগামী হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর এখানে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যে নেতিবাচক সূত্র চার্বাক দর্শনের বৈশিষ্ট্য সেই সূত্রের পটভূমিতে ইতিবাচক কর্তব্যেরও এখানে কিছু উপদেশ আছে। সেইজন্য জ্রোপদীর এই বক্তব্যে পরবর্তীকালে রূপায়িত চার্বাক দর্শনের চেহারা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, যদিও চার্বাক চরিত্রের সাধারণ ভাব এর মধ্যে খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কর্মের যে অনুষ্ঠান এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, তা ভারতের ঐতিহ্যসম্মত কর্মফলবাদের নীতি অনুসারী নয়। কর্মফলবাদ সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

মহাভারতের অন্যান্য নাস্তিক মতাবলম্বীদের আরও কিছু উল্লেখ দেখা যায়। শাস্তিপর্বে এই নাস্তিক পণ্ডিতদের ‘নৈতদন্তীতিবাদিনঃ’ আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এঁরা ‘অমৃতস্তাবমন্তারঃ’,^৪ , অর্থাৎ, অমরত্বে এঁদের স্বীকৃতির অভাব। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে অহরন্তর এবং পূর্বশাস্ত্রবিদ জনগণের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এঁদের মধ্যে পরবর্তী যুগের চার্বাকদের আদি রূপ আবিষ্কার করা খুব স্বাভাবিক। মহাভারতের এই

৪০। মহাভারত, ১২।১৯।২৩; মূল গ্রন্থের ‘অনৃতস্তাবমন্তারঃ’ বাক্যাংশটির পাঠ Hopkins-এর মতে ‘অমৃতস্তাবমন্তারঃ’ হওয়া উচিত। গ্রন্থস্থিত ‘পূর্বশাস্ত্র’ সম্ভবতঃ বেদানুসারী ‘পূর্বমীমাংসাসাশ্ত্র’। (The great Epic of India, p. 87)

অংশের বর্ণনা থেকে এই নাস্তিকেরা যে সেই যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত মতগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। চার্বাক দর্শনের আদি রূপ

রামায়ণ এবং মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত নাস্তিক মতগুলি ‘চার্বাক’ নামের দ্বারা চিহ্নিত না হলেও চার্বাকী মতেব প্রতিকলন সেগুলির মধ্যে সুপরিষ্কৃত এবং চার্বাক দর্শনের আদি রূপ হিসাবে সেগুলিকে বর্ণনা করা বোধহয় অসম্ভব হবে না। মহাভারতের শাস্তিপর্বে সাংখ্যাচাৰ্য পঞ্চশিখকে নিজ মতবাদ প্রচারের সময় সমসাময়িক যে সব মতগোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলির উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে চার্বাক মত অন্তর্ভুক্ত, যদিও ‘চার্বাক’ বিশেষণের প্রয়োগ এখানেও দেখা যায় না।^{৮১}

মহাভারতকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই তার রচনাকালেব পূর্ব সীমা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং শেষ সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক বলে সাধারণতঃ বরেনেওয়া হয়। পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় আরও আগে—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষেও দিকে।^{৮২} রামায়ণ এবং মহাভারতের পূর্ণ রূপায়ণের বহু পূর্বেই যে ভারতের দর্শনজগতে চার্বাক মতের আবির্ভাব সৃষ্টি হয়েছিল, উপরের আলোচনা থেকে তা বোঝা যায়।

ভারতীয় উপাখ্যান অনুসারে দেবগুরু বৃহস্পতি বেদবিরোধী মতবাদে অসুরদের দীক্ষিত করেন। দেবগুরুব মধ্যে চার্বাক মতের প্রবর্তক বৃহস্পতিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু ‘অসুর’ আখ্যায় নাস্তিকগোষ্ঠীর বিশেষ কোন শাখা চিহ্নিত কিনা বলা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ‘অসুর’ শব্দটি এক শ্রেণীর অবিশ্বাসীর অর্থে ব্যবহৃত। এঁদের কাছে জাগতিক সুখভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং আত্মা দেহের সঙ্গে অভিন্ন।^{৮৩} ভগবদ্গীতার মধ্যে ‘অসুর’ সংজ্ঞায় অভিহিত এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছে, যারা এই জগতকে অনীশ্বর বলে মনে করেন।^{৮৪} গীতার মতে সর্কার্বুদ্ধি এবং উগ্রকর্মা এই সব

৪১। মহাভারত, ১২।২১৮।২৩-২

৪২। Winternitz, HIL. p. 475

৪৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮।৭-৮

৪৪। ভগবদ্গীতা, ১৬।৬-২০, ভগবদ্গীতা ৪।৪১তে পরলোকে অবিশ্বাসকারীদের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্যক্তি জগতকে বিনষ্ট করার জগুই জয়গ্রহণ করেন। এঁদের পরম লক্ষ্য হল বিষয়স্থ। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জগু যে কোন উপায়ের আশ্রয় নিতেও এঁদের দ্বিধা নেই। মোহের বশে এঁরা অসং কৰ্মের অলুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং এঁদের চিন্তা মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয় না। গীতার ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামীর মতে লোকায়াত বা চাৰ্বাকপন্থীদের উদ্দেশ্য করেই গীতার এই অংশ রচিত।

‘অস্থুর সংজ্ঞা যদি চাৰ্বাক মতে বিশ্বাসী কোন গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে ছান্দোগ্য ও মৈত্ৰায়নীয় উপনিষদের বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত ‘অস্থুর’ শব্দ থেকে উপনিষদের যুগেও এই মতবাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সঙ্গত। চাৰ্বাক দৰ্শনের আদি রূপায়ণের কালকে তাহলে আমরা রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগ থেকে আরও পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারি। সম্ভবতঃ এই উপনিষদের যুগেই চাৰ্বাক ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছিল। আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিভিন্ন উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত ‘অধ্যাত্ম ধারণার বিরোধী পক্ষের কিছু মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগের পরিণত চাৰ্বাকী দেহাস্ত্রবাদের প্রাথমিক রূপের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে—‘আত্মোক্তং পঞ্চবিধং—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীঃ’, অর্থাৎ এই পঞ্চ উক্ত বা মহাত্ম আত্মার সঙ্গে অভিন্ন।^{৪৫} বৃহস্পতিয় উপনিষদের^{৪৬} একটি অল্পচ্ছেদে মরণোত্তর চৈতন্যের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিক দেহ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি এবং দেহনাশের সমকালীন চৈতন্যের বিনাশসম্বন্ধীয় যে ধারণা পরবর্তী চাৰ্বাক মতের অন্তর্ভুক্ত তাব প্রতিচ্ছবি উপনিষদায় এই অল্পচ্ছেদে ভালভাবে লক্ষণীয়। অস্থুর আখ্যায় অভিহিত অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে অংশের উল্লেখ আমরা আগে করেছি চাৰ্বাকী দেহাস্ত্রবাদের নিদর্শন সেখানেও সুস্পষ্ট। অস্থুরকুলের প্রতিনিধি হিসাবে বিরোচন ইন্দ্রের সঙ্গে প্রজাপতির কাছে আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশলাভের জগু সমবেত হলে প্রজাপতি একটি পাত্রস্থিত জলে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করতে বলেন। এবং এই প্রতিবিম্ব রূপায়িত উভয়ের সুসজ্জিত দেহকেই তাঁদের আত্মা হিসাবে নির্দেশ দেন। এইভাবে দেহকেই আত্মা জ্ঞান করে বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ইন্দ্র এতে শেষ পর্যন্ত

৪৫। চাৰ্বাক দৰ্শন, পৃ: ১২১

৪৬। ‘বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বোবাহুবিনশ্চতি, ন প্রোত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমি’ ২।৪।১২

পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন নি। কঠোপানিষদের^{৪৭} মধ্যে পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় বিশেষের উল্লেখ আমাদের চার্বাক মতের কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্নধর্মী এই সব নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদীয় যুগে চার্বাক দর্শনের আদিক্রূপের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না।

উপনিষদ হল বেদের অস্তিম অংশ। সংহিতার মাধ্যমে যে বৈদিক যুগের আরম্ভ এবং বৈদিক ‘ব্রাহ্মণে’ যার পূর্ণ বিকাশ, সেই বৈদিক যুগের পরিসমাপ্তি এই উপনিষদের যুগে। এই যুগের পরিধিকে কোন বিশেষ সীমারেখায় বাঁধা যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কালকে ইতিহাসের এক বিশেষ সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘ছান্দোগ্য’, ‘বৃহদারণ্যক’ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান উপনিষদের রচনাকালকে বহু প্রাচীন এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হলেও ‘মৈত্রায়ণীয়’ এবং অন্যান্য বহু উপনিষদ বুদ্ধোত্তর বলে অনেকের ধারণা।^{৪৮}

চার্বাক দর্শনের যে অংশের সঙ্গে আমরা পরিচিত, বৈদিক সংস্কৃতি এবং বেদবিহিত জিয়াহুষ্ঠানের মধ্যে তার মূল স্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চার্বাক মতবাদকে সেইজন্য বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা চলে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মত উপনিষদীয় যুগের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যেই এই বিদ্রোহ চার্বাক দর্শনের রূপ নিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।^{৪৯} বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত চার্বাকী মতের বিবরণ এই চিন্তাধারার আবির্ভাবের সঠিক কাল সম্বন্ধে সামান্যই আলোকপাত করতে সক্ষম। তবে মোটামুটিভাবে উপনিষদীয় যুগের বৃহৎ পরিসরে এই কালকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

বুদ্ধের প্রায় সমকালবর্তী অজিত কেশকম্বলীর উক্তিই চার্বাকী চিন্তার কিছুটা প্রতিক্ষবি আছে।^{৫০} বৈদিক যজ্ঞ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিশেষ

৪৭। ‘—যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যোকে নায়মন্তীতি চৈকে .’
১।১২০, অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী,’ ১।২।৬

৪৮। HIL, pp. 236-8

৪৯। IP, i, p. 216

৫০। দীঘনিকায়, ২।২২-৪; মজ্জিমনিিকায়, ১; অজিত কেশকম্বলিনের মত সম্বন্ধে বেগীমাধব বড়ুয়ার Pre-Buddhistic Indian Philosophy, pp. 290-6 জেটব্য; বেগীমাধব বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আজ্ঞাতের সঙ্গে মহাভারত বর্ণিত পরিব্রাজক চার্বাকের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পান, Pre-Buddhistic Indian Philosophy, p. 288

সুবিধাভোগের বিরোধিতা এবং বেদবিহিত শ্রাদ্ধাদি অহুষ্ঠানের সমালোচনার মাধ্যমে অজিতের চিন্তাধারা চার্বাক দর্শনের সঙ্গে একই আসনে নিজের স্থান করে নিয়েছে। চার্বাকের মত অজিতও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আর পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফল ইত্যাদি ধারণাও অস্বীকার করেন। জাগতিক বস্তুনিচয়ের উপাদান হিসাবে পঞ্চ মহাভূতের পরিবর্তে চার মহাভূতের স্বীকৃতিতে ভারতীয় সাধারণ ধারণার যে ব্যতিক্রম চার্বাক মতবাদে পরিস্ফুট, অজিতের মধ্যে আমরা তার সূচনা লক্ষ্য করি। চার্বাক দর্শনের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। কেশকস্থলী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে অজিত পরিচিত। অজানিত ভবিষ্যতে সুখের আশায় জীবনের প্রতিদিনের সাধারণ আনন্দের প্রতি যারা উদাসীন—তাদের আদর্শবাদী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত হল এই সম্প্রদায়ের মনোভাব। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চার্বাকদের সঙ্গে কেশকস্থলীদের অনেক সাদৃশ্য থুঁজে পাওয়া যায়।

চার্বাক মতবাদ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত রাজা পায়াসির নাম উল্লেখযোগ্য।^{৫১} বস্তুবাদের সমর্থক হিসাবে পায়াসি বাতীত অশ্ব কোন নৃপতি বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠায় নিজ নাম অঙ্কিত রাখেন নি। সাধু কেসরী সঙ্গে আলোচিত এই রাজার মতবাদে চার্বাক দর্শনের প্রতিফলন লক্ষণীয় যদিও পরবর্তীকালে সাধুরই প্রভাবে পায়াসির এই মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। এই নৃপতির বস্তুবাদী মত অনুসারে আত্মা দেহের সঙ্গে অভিন্ন এবং জন্মান্তরবাদ অস্বীকৃত। জৈন “সুত্রকৃতাজ্জ”র এক অহুচ্ছেদে পায়াসি এবং অজিতের সংমিশ্রিত মতবাদের এক বিবরণ পাওয়া যায়।^{৫২} “সুত্রকৃতাজ্জ” ‘অগ্নাগ্নী-দেব’ মতের যে বিবরণ আছে তা থেকে এই অগ্নানীয়েদের সঙ্গে চার্বাকদের সম্পর্কের যোগসূত্র রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।^{৫৩}

৪। চার্বাক

‘চার্বাক’ শব্দটি পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনে এক বিশেষ মত-

৫১। পায়াসি সুত্তন্ত, দীঘনিকায়, ২; দেহান্ধবাদের সমর্থনে পায়াসি বলেন যে কোষ থেকে তরবারীকে যেভাবে পৃথক করা যায়, আত্মাকে সে ভাবে দেহ থেকে কোন ক্রমেই পৃথক করা যায় না।

৫২। জৈন সুত্রকৃতাজ্জ, ২।১।১০-২৪

৫৩। চার্বাক দর্শন, পৃ: ৩৬

বাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুপরিচিতি লাভ করলেও প্রাচীন সাহিত্যে এ শব্দটি সম্বন্ধে বিশেষ সরব নয়। আগেই বলা হয়েছে যে রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত নাস্তিক মত ‘চার্বাক’ বিশেষণে বিশেষিত হয় নি। বিশিষ্ট এক চিন্তাধারাকে স্বনামে পরিচিত করার উপযোগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন চার্বাকের অস্তিত্বের সমর্থনেও তথ্যের একান্তই অভাব। প্রচলিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই নাস্তিক মতের ‘চার্বাক’ আখ্যায় চিহ্নিত হবার মূলে চার্বাক নামে ব্যক্তির প্রভাব ছাড়াও অল্প কোন কারণ হয়ত থাকতে পারে। আর সেই কারণের সম্ভাবনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যায় না।

মহাভারতের শাস্তিপর্বে পরিত্রাজকরূপী এক চার্বাকের বর্ণনা আছে।^{৫৪} বাহ্য রূপে ‘সাক্ষ্য, শিখী এবং ত্রিদণ্ডী’ ব্রাহ্মণ হলেও মহাভারতে এই চার্বাক রাক্ষস আখ্যায় ভূষিত এবং দুর্ধোধনের সখা হিসাবে বর্ণিত হয়েছেন। চার্বাক দর্শনের ইতিহাসের আবরণ উন্মোচনে আগ্রহী সকলের দৃষ্টি স্বভাবতঃই এঁর উপর পড়ে—বৃহস্পতিশিষ্য নাস্তিকবাদের প্রচারকের ছবি প্রাচীন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দেখার আশায়। এই চার্বাকের মুখে কিন্তু নাস্তিকবাদ সম্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় না। যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এঁর স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতি রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে অপমান করতেই ব্যয়িত হয়েছে, যার পরিণামে সভায় ক্রমাগত ব্রাহ্মণদের রোষবহ্নিতে দগ্ধ এই ব্রাহ্মণবেশী চার্বাকের জীবনে অবশেষে যবনিকাপাত হতে দেখা যায়।

চার্বাককে ব্রাহ্মণদের ক্রোধের বলি করে কাহিনীটি এই ব্রাহ্মণবেশী দুর্ধোধনসখার মধ্যে ব্রাহ্মণবিরোধী এক মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়। ইঙ্গিতটিকে স্পষ্টতর করে তোলে এই মহাভারতেরই অন্তর্গত অল্প এক উপাখ্যান, যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রসাদপুষ্ট অপর এক চার্বাকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপাগত এই চার্বাকের অভিন্নতা প্রদর্শন করেন।^{৫৫} প্রাচীন কালে কঠোর তপস্শ্রাবলে চার্বাক ব্রহ্মার কাছে থেকে এই মর্মে বর লাভ করেন যে তাঁকে বধ করার ক্ষমতা কোন প্রাণীর থাকবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয় তাঁর কার্যকলাপ যেন কোন ব্রাহ্মণের অসন্তোষের হেতু না হয়। ব্রহ্মার বলে বলীয়ান চার্বাক পরে দেবতাদের উপর উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হলে দেবগণ ব্রহ্মার কাছে তাঁদের দুঃস্বপ্নের কাহিনী নিবেদন করেন। ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস-

৫৪। . মহাভারত, ১২।৩৮।২২-৩৬

৫৫। . মহাভারত, ১২।৩৯।৩-১১

বাণী দেন এবং বলেন যে ব্রাহ্মণদের অপমান করে চার্বাক স্বহস্তে নিজের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করবেন। যুধিষ্ঠিরের সভায় সমাগত চার্বাকের বিনাশের মূলে কার্যকর ব্রাহ্মণের অভিশাপ এবং ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার মাধ্যমে অভিশাপটিকে ফলশ্রুত করার দায়িত্ব স্বয়ং চার্বাকেরই—উপাখ্যানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তকে দৃষ্টিপটে তুলে ধবার প্রয়াস এখানে স্পষ্ট। চার্বাক নামে কোন ব্যক্তির কাহিনী মহাভারতের অগ্রদূত বা সম্ভবতঃ অগ্র কোন গ্রন্থেও দেখা যায় না। মহাভারতে 'চার্বাক' নামের এই সামান্য উল্লেখ থেকে চার্বাক মতবাদের সঙ্গে এই নামের যোগ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সমীচীন নয়। তবে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে চার্বাক এখানে বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী দর্শনের একটা মূর্ত রূপ। মহাভারত রচনা সম্পূর্ণ হবার আগেই চার্বাক নামের সঙ্গে এই দর্শন যুক্ত হয়েছিল।

৫। বার্হস্পত্য

চার্বাক দর্শনের আদি গুরু হিসাবে বৃহস্পতির পরিচিতির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। বৃহস্পতি কর্তৃক প্রবর্তিত শাস্ত্র হিসাবে চার্বাক দর্শন 'বার্হস্পত্য' আখ্যায় অভিহিত হবার যোগ্য। বৃহস্পতির মতের অনুগামী বার্হস্পত্যদের উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত এই সব বার্হস্পত্যদের সঙ্গে চার্বাক দর্শনের স্থপতি বৃহস্পতির কোন যোগ ছিল কিনা বিস্তারিত তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে তা নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব নয়। 'বার্হস্পত্যসূত্র' নামে F. W. Thomas-কৃত অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশিত পুস্তিকার সঙ্গেও চার্বাকবাদের যোগ আবিষ্কার করা কঠিন।

মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদীর উক্তির মধ্যে আমরা এক বার্হস্পত্য মতের উল্লেখ দেখি।^{৫৬} পাঞ্চালী বনবাসের কঠোরতার যে পটভূমিতে নাস্তিকবাদের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি—সেই একই পটভূমিতে এই বার্হস্পত্য মতেরও প্রকাশ যুধিষ্ঠিরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃহস্পতি মতের অনুসরণে দ্রৌপদী কর্মযোগের পক্ষে বিতর্কের সূচনা

৫৬। মহাভারত, ৩।৩২ ; মহাভারতেরই অগ্রদূত (১৩।৩২।৬-১০) শুক্র-চার্ভের সঙ্গে একযোগে বৃহস্পতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। প্রতারণা-মূলক শাস্ত্রের প্রবক্তা হিসাবে বর্ণিত এই বৃহস্পতিকে নাস্তিকবাদের প্রবর্তক বৃহস্পতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা অসঙ্গত নয়।

করেন। শ্রৌশদীর এই বিশেষ উক্তি নাস্তিকবাদের ভাবে অমুপ্রাণিত না হলেও পটভূমির অভিন্নতার বিচারে এর সঙ্গে নাস্তিকবাদের যোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে নাস্তিকবাদের আলোচনাতেও শ্রৌশদী কর্মযোগকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই তাঁর উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত বাহ্যম্পত্য মতে বৃহস্পতি প্রবর্তিত নাস্তিকবাদের রূপরেখার অস্পষ্ট পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত^{৫৭} কোটিল্যের “অর্থশাস্ত্রের” সাক্ষ্য থেকে বাহ্যম্পত্য সন্দেহ আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। বিজ্ঞা বা জ্ঞানের বিষয়ের প্রকারভেদ করার সময়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ প্রসঙ্গে কোটিল্য বাহ্যম্পত্য মতের আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞার সংখ্যা কোটিল্যের মতে চার—আত্মীক্ষিকী, ত্রয়ী বা বেদ, দণ্ডনীতি এবং বার্তা। অর্থাৎ কৃষি ইত্যাদি অর্থনীতিসংক্রান্ত বিজ্ঞা।^{৫৮} আত্মীক্ষিকী প্রসঙ্গে কোটিল্য বলেন যে এই বিজ্ঞা হেতু বা যুক্তির মাধ্যমে অপর তিনটি বিজ্ঞার ধর্ম-অধর্ম, অর্থ-অনর্থ, বলাবল ইত্যাদির বিচারের দ্বারা জনসাধারণের উপকার করে এবং এই বিজ্ঞার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাতেও মানুষ বুদ্ধির সমতা অব্যাহত রাখতে পারে। প্রজ্ঞা, বাক্য এবং ক্রিয়ার কুশলতা বুদ্ধির কাজেও এই বিজ্ঞা মানুষকে সহায়তা করে।^{৫৯}

৫৭। “অর্থশাস্ত্রের” রচয়িতা কোটিল্যকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। অবশ্য অনেকের মতে “অর্থশাস্ত্র” পুস্তকটি বর্তমান আকারে রচিত পরবর্তী যুগে আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে (Keith History of Sanskrit Literature, p. 461)।

৫৮। ‘আত্মীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিজ্ঞাঃ’, অর্থশাস্ত্র, ১।২।১ ; বিজ্ঞার সংখ্যা ও প্রকার সন্দেহে ত্রায়ভাষ্যেও অনুরূপ ধারণায় প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও সেখানে ত্রায়শাস্ত্র আত্মীক্ষিকীর সঙ্গে অভিন্ন (‘ইমাস্ত চতস্রো বিজ্ঞাঃ...’) ত্রায়মঞ্জরী ১।১।১ ; Cf. ‘ইয়মেবাশীক্ষিকী চতস্রাং বিজ্ঞানাং মধ্যে ত্রায়বিজ্ঞা গণ্যতে, আত্মীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাস্ত্রতীতি’, ত্রায় মঞ্জরী ১, পৃ: ৪।

৫৯। ধর্মাধর্মো ত্রয়ামর্থানর্থো বার্তায়াং নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাং বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরবীক্ষমাণা লোকশ্রোপকরোতিব্যাসনেহভ্যাসয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি প্রজ্ঞাবাক্য বৈশারদ্যং চ করোতি, অর্থশাস্ত্র, ১।২।১১

‘অর্থশাস্ত্রের’ বর্ণনা অনুসারে আত্মশিক্ষিকী সব রকম বিচার প্রদীপ, সব কাজের উপায় এবং ধর্মের আশ্রয় ।^{৬০}

, কোটিল্যবর্ণিত বার্হস্পত্যদের মতে কিন্তু বিচার সংখ্যা দুই—দণ্ডনীতি এবং বার্তা ।^{৬১} বেদ অথবা আত্মশিক্ষিকীকে বিছা হিসাবে বার্হস্পত্যরা স্বীকৃতি দেন না । ‘লোকষাট্রাবিদ’ বা লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ‘সংবরণ’ বা পোষাক বলে বার্হস্পত্যরা বেদকে অভিহিত করেছেন ।^{৬২} বার্হস্পত্য লক্ষ্যে অর্থশাস্ত্রের উক্তি অনুধাবন করলে মনে হয় যে এঁদের অভিমত অনুসারে বেদজ্ঞ বলে সেই সময়ে যারা নিজেদের প্রচার করতেন তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ সব সময়ে বেদজ্ঞানের আবরণের অন্তরালে গোপন থাকত । ‘অর্থশাস্ত্রের’ অনুসরণে তাৎকালিক বার্হস্পত্য মতবাদকে আমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী বলেই ধরে নিতে পারি ।

কোটিল্যের এই বর্ণনার পটভূমিকায় পরবর্তী যুগের কোন কোন গ্রন্থের চার্বাক দর্শন লক্ষ্যীয় আলোচনার আমরা বিচার করতে পারি । “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়” নাটকে বর্ণিত চার্বাক সিদ্ধান্ত অনুসারে বার্তা দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং এই বার্তাসংযুক্ত দণ্ডনীতি ‘বিছা’ সংজ্ঞায় অভিহিত ; ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ এই মতে ‘ধূর্তপ্রলাপ’ ।^{৬৩} “সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের” বর্ণনা অনুসারে লোকায়তরা কুবি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ইত্যাদি দৃষ্ট উপায়ের মাধ্যমে জাগতিক বস্তু উপভোগের পরামর্শ দেন ।^{৬৪} এই গ্রন্থ দুটিতে আলোচিত বার্হস্পত্য চার্বাক বা বার্হস্পত্য লোকায়তের আদি রূপ হিসাবে কোটিল্যবর্ণিত বার্হস্পত্যের কল্পনা খুব অসঙ্গত নয় ।

বার্হস্পত্য মত হিসাবে সুপরিচিত চার্বাকবাদের আদিগুরু বৃহস্পতি লক্ষ্যে

৬০ । প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্, আশ্রয়ঃ সর্বধর্মানাং শব্দশা-
ক্ষিকী মতা । অর্থশাস্ত্র ১।২।১২ ; ভ্রায়ভাষ্যেও অহরূপ উক্তি দেখা
যায়, ‘প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্, আশ্রয়ঃ সর্বধর্মানাং
বিছোদ্যে প্রকীর্তিতা’ ১।১।১

৬১ । বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, অর্থশাস্ত্র, ১।২।৪

৬২ । সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকষাট্রাবিদ ইতি

৬৩ । দণ্ডনীতিরেব বিছা । অত্রৈব বার্তান্তর্ভবিষ্যতি ধূর্ত প্রলাপস্ত্রয়ী ।

প্রচঃ পৃঃ ৬৫

৬৪ । কুবিগোরক্ষবাণিজ্যাদণ্ডনীত্যাতিভিবৃধঃ । দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈ-
র্ভোগানহুভবো ভুবি । ২।১৫

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর “চার্বাক দর্শন” গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেছেন।^{৬৫} বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত ‘বৃহস্পতি’ নামকে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনা রূপায়িত এবং নাস্তিক চার্বাকবাদের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত এই সব নামগুলিকেই তিনি যুক্ত করতে প্রয়াসী। শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা,—বৃহস্পতি ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়; ব্যাস, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি উপাধির মত বৃহস্পতিকেও উপাধিবিশেষ বলা চলে। চার্বাক মতের প্রচারে যারা সহায়তা করেছেন এই উপাধি তাঁরাই লাভ করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিশিষ্ট, বিদ্বান, বাগ্মী পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে ‘বাচস্পতি’ উপাধির প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ‘বাচস্পতি’ শব্দটি ‘বৃহস্পতি’ শব্দেরই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে ‘বাচস্পতি’ শব্দের মত ‘বৃহস্পতি’ শব্দেরও উপাধি হিসাবে প্রয়োগের পথে তাঁর মতে কোন বাধা থাকতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে ‘স্বদূর অতীতে কোনও সময়ে এই বৃহস্পতিগণ মিলিত হইয়া বার্ষস্পত্য মত প্রবর্তন.....করেন।^{৬৬} ‘বৃহস্পতি উপাধিপ্রাপ্ত’ এই ব্যক্তিদের বর্ণনা বিভিন্ন যুগের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এবং একই সময়ে একই স্থানে তাঁদের মিলিত হবার সপক্ষে প্রমাণের একান্তই অভাব। কাজেই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থন যোগ্য নয়।

অবশ্য বিশেষ কোন বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের প্রবর্তক বলে স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি নেই এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উল্লিখিত লোক্য বৃহস্পতি তাঁর মতে চার্বাকবাদের প্রবক্তা এই বৃহস্পতির সঙ্গে অভিন্ন। “চার্বাক দর্শন” গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, ‘মন্ত্রযুগের ঋষি বৃহস্পতি এই মত প্রবর্তন করিলেন’।^{৬৭} চার্বাক মতের প্রবর্তক সন্দেহে তাঁর এই স্থনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তির দৃঢ় কোন সমর্থন নেই। মনে হয় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লিখিত যতগুলি ‘বৃহস্পতি’ নামের সঙ্গে তিনি চার্বাক মতকে যে কোন ভাবে যুক্ত করতে চান সেগুলির মধ্যে কালের বিচারে ঋগ্বেদোক্ত বৃহস্পতিই প্রাচীনতম। কাজেই শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচারে বোধ হয় চার্বাক মতের প্রবর্তনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

৬। লোকায়ত—আত্মীক্ষিকী, বিতণ্ডা ও হেতুবাদ

যে ‘লোকায়ত’ সংজ্ঞা চার্বাক দর্শনের অর্থে ব্যবহৃত, সেই সংজ্ঞার প্রাচীন

৬৫। চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা: ১৫৩-৮

৬৬। চার্বাক দর্শন পৃ: ১৫৭

৬৭। চার্বাক দর্শন পৃ: ১৭১

উল্লেখের অনুসন্ধানে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনাতেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কারণ, লোকায়াতকে কোটিল্য তাঁর অনুমোদিত বিদ্যাচতুষ্টয়ের অন্যতম আত্মীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন।^{৬৮} “অর্থশাস্ত্রের” বর্ণনা অনুসারে আত্মীক্ষিকী বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। কারণ একমাত্র এই বিদ্যার সহায়তার ভিত্তিতেই অপর বিদ্যাগুলি সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। এই অপর বিদ্যাগুলির মধ্যে বেদ অন্তর্গত। কাজেই অর্থ-শাস্ত্রানুসারী যুক্তি থেকে ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে ক্ষেত্রবিশেষে বেদের সমালোচনা করলেও^{৬৯} আত্মীক্ষিকী বৈদিক সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিল না, বরং বেদের পরিপূরক শাস্ত্র হিসাবেই পরিগণিত হত।

তৎকালীন চিন্তাজগতে আত্মীক্ষিকীর যে যথেষ্ট সম্মান ছিল, কোটিল্যের বর্ণনা-ভঙ্গীতে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়াত এই তিনটি শাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্রে আত্মীক্ষিকীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতের চিন্তা-জগতে সাংখ্য ও যোগের স্থান সুপরিচিত এবং উপনিষদীয় চিন্তাধারা-প্রভাবিত এই দর্শন দুটি যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থনপুষ্ট লে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাস্ত্র হিসাবে লোকায়াতও যে সমসাময়িক সাংখ্য ও যোগের সঙ্গে এ বিষয়ে সমান ছিল, “অর্থশাস্ত্রে”র বিবরণী থেকে তা জানা যায়।

কোটিল্যবর্ণিত বার্ষ্পত্যের ছবি আমরা আগেই এঁকেছি এবং এই মতের অনুগামীরা যে বিদ্যার ক্ষেত্রে আত্মীক্ষিকীকে প্রবেশাধিকার দেন নি তাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অর্থশাস্ত্রোক্ত লোকায়াত যে তৎকালীন বার্ষ-স্পত্য থেকে পৃথক ছিল, এ থেকে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তী যুগের নাস্তিকধর্মী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে যে প্রাচীন এই লোকায়াত শাস্ত্র অভিন্ন ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। যে আত্মীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসাবে লোকায়াতের পরিচিতি, সেই আত্মীক্ষিকীকে কোটিল্য সর্ব ধর্মের আশ্রয় বলে বর্ণনা করেছেন। চার্বাক দর্শনের আলোচনায় পরে আমরা দেখব যে এই দর্শনের পরিধি থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত। কাজেই ‘লোকায়াত’ সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী চার্বাক মতবাদ দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে প্রাচীন

৬৮। সাংখ্যঃ যোগো লোকায়াতং চেত্যাত্মীক্ষিকী, অর্থশাস্ত্র, ১।২।১১

৬৯। ‘ধর্মাধর্মো’ ত্রয়াম্...হেতুভিরত্মীক্ষমাণা’ অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত। এই বাক্যাংশ থেকে মনে হয় যে আত্মীক্ষিকীর বিচারে ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ সব সময়ে ধর্মামুসারী হত না।

লোকায়ত শাস্ত্রের বিপরীত। বিভিন্ন যুগের বিপরীতমুখী এই শাস্ত্র দুটির সাধারণ একটি সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার মূলে উভয়ের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য কোন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব হয়ত কার্যকরী। প্রাচীন এই লোকায়তের আলোচনায় অগ্রসর হলে উভয় দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে।

ভারতের চিন্তাজগতে লোকায়তের আবির্ভাবের সঠিক সময় নির্ধারিত হয় নি। ‘দিব্যাবদানে’ লোকায়ত শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের উপর লেখা ভাষ্য ও প্রবচনের উল্লেখ আছে^{১০} এবং এ থেকে প্রাচীন এই শাস্ত্র যে গ্রন্থপরম্পরায় সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যাকরণকার পতঞ্জলি তাঁর ‘মহাভাষ্যে’ ‘ভাণ্ডুরি’ নামে লোকায়তের এক ‘বর্তিকা’ বা ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন।^{১১} ঐতিহাসিকদের মতে ‘মহাভাষ্যের’ রচনাকাল আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।^{১২} এ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই ‘ভাণ্ডুরি’ ভাষ্যমণ্ডলিত ‘লোকায়ত’ নামে এক পুস্তকের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণের পরিচয় মেলে। লোকায়ত সম্বন্ধীয় আর কোন গ্রন্থের নাম অশ্রু কোথাও পাওয়া যায় না।

এই লোকায়ত শাস্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। Rhys Davids এ ব্যাপারে ‘লোকায়ত’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপর নির্ভর করেছেন।^{১৩} ‘লোকেষু আয়ত’ অর্থাৎ ‘লোক’ বা জনসাধারণের মধ্যে যা বিস্তৃত, লোকায়ত শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ তাকেই বোঝায়। Cowell ‘সর্বদর্শনসংগ্রহের’ অনুবাদ প্রসঙ্গে ‘লোকায়ত’কে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। ‘লোকায়ত’ শব্দের এই অর্থের অঙ্গসরণে Rhys Davids লোকায়তকে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের অবলম্বনে রূপায়িত শাস্ত্র হিসাবে নির্দেশ করেন এবং এই বিশেষ শাস্ত্রটি তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্য বিচারই একটি শাখা।

হরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভিমত কিঙ্ক এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। তিনি মনে করেন যে ‘লোকায়ত’ সংজ্ঞায় তর্ক বা যুক্তিভিত্তিক এক বিশেষ শাস্ত্রকে বোঝায়, যার উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু স্থানে আছে। পালি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত লোকায়তসম্বন্ধীয় মন্তব্য থেকে দাসগুপ্ত মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে ‘লোকায়ত’

১০। ‘লোকায়তং ভাষ্যপ্রবচনম্’, দিব্যাবদান, পৃঃ ৬৩০

১১। মহাভাষ্য, ৭।৩।১

১২। Keith, A. B., A History of Sanskrit Literature, p. 428

১৩। Dialogues of the Buddha, i. p. 171

শাস্ত্রের আশ্রয় এক বিশেষ ধরনের তর্ক, যে তর্কের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে নিরস্ত করা, আত্মপক্ষ উপস্থাপনা নয়। এই জাতীয় তর্কের পারিভাষিক নাম ‘বিতণ্ডা’ এবং পালি লেখক বুদ্ধঘোষ লোকায়তকে বিতণ্ডাম্বক শাস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন।^{১৪}

এখানে ‘বিতণ্ডা’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ সৰ্বদে আমাদের কিছু আলোচনা প্রয়োজন। গ্রায়সূত্রে বিতণ্ডা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ‘স (জল্প:) প্রতিপক্ষস্থাপনা-হীনো বিতণ্ডা, ১৫ অর্থাৎ প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন জল্পকে বিতণ্ডা বলে। ‘বিতণ্ডা’ সৰ্বদে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করতে হলে ‘জল্প’ বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ এই উভয় শব্দেরই অভিধেয় সৰ্বদে ধারণা একমাত্র ‘বাদ’ শব্দের অর্থ নিরূপণের মাধ্যমে হতে পারে।

কোন বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলার নাম ‘বাদ’। এই বলার ব্যাপারে বক্তব্যটির বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে এবং ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হলে বাদী স্বভাবতঃই একটিকে সমর্থন এবং অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। ত্রায়ের ভাবায় একই বিষয়ে বিপরীত এই ধরনের ধর্মের একটিকে পক্ষ এবং অপরটিকে প্রতিপক্ষ বলে। এই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে একটির সাধন বা স্থাপনা এবং অপরটির উপালম্ব বা প্রত্যাখ্যান বাদের আবৃত্তিক অঙ্গ।^{১৬}

এই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষযুক্ত বিষয় জন্মেরও অঙ্গ, কিন্তু কেবল সাধারণ আলোচনা জন্মের প্রতিপাদ্য নয়। জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য অপরের প্রতিবিদ্ধ স্বপক্ষের স্থাপনা^{১৭} এবং জন্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির মধ্যে বিজিগীষার এক মনোভাব থাকে, যে মনোভাব বাদে অদৃশ্য। গ্রায়মঞ্জরীতে বার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ‘বীত-রাগবস্তনির্ণয়কলো বাদঃ’।^{১৮} যে বিজিগীষু মনোভাব জন্মের পটভূমি রচনা করে, জন্মের বিশেষ রূপ বিতণ্ডাতে তারই চরম প্রকাশ কেবল পরপক্ষের দূষণকে কেন্দ্র করে। বৈতণ্ডিকের কাজ পরপক্ষের সমালোচনা এবং এই সমালোচনাতেই

১৪। HIP, iii, pp. 514—516

১৫। স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, গ্রায়সূত্র, ১।২।৪৪

১৬। প্রমাণতর্ক-পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ, গ্রায়সূত্র, ১।২।৪২

১৭। স্বধোক্তপন্নয়নজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানসাধনো পালন্তো জল্পঃ, ঐ ১।২।৪৩

১৮। গ্রায়, ১, পৃঃ ৪

বৈতণ্ডিক তাঁর সমগ্র প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেন এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পরপক্ষের প্রতিপক্ষ যে স্বপক্ষ, সেই স্বপক্ষের মতামত সহজে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন।

বিতণ্ডাস্বক শাস্ত্র হিসাবে বর্ণিত প্রাচীন লোকায়তের মধ্যে অপরের সমালোচনার প্রবণতা যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা সহজে অস্বমেয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন এই লোকায়ত শাস্ত্রে অঙ্কিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অসু-মোদনের নিদর্শন দেখে ধারণা করা বিচিত্র নয় যে বৌদ্ধরাই এক্ষেত্রে লোকায়তের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বৌদ্ধদের সমালোচনাই এই শাস্ত্রে বিতণ্ডাস্বক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল।

বিতণ্ডার প্রচলন যে ধরনের তর্ককে কেন্দ্র করে সেই ধরনের তর্কের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ‘হেতুবিদ্যা’ নামে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এক বিশেষ বিদ্যার আমরা উল্লেখ করতে পারি, যা সাধারণতঃ তর্ককেন্দ্রিক এবং প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করার প্রয়াসেই যার ব্যবহার দেখা যেত। প্রাচীন লোকায়ত শাস্ত্রের উপর হেতুবাদের প্রভাব খুব বেশী। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে বৌদ্ধদের সমালোচনায় তৎপর হেতুবাদমূলক লোকায়ত প্রাচীন যুগে কেবলমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিরাগের পাত্র ছিল; অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ্য বিদ্যার এক বিশেষ শাখা হিসাবে এই শাস্ত্রের অসুশীলনে রত ছিলেন।^{৭২}

‘অর্থশাস্ত্রের’ অন্তর্গত আত্মীক্ষিকীর আলোচনায় ব্যবহৃত ‘হেতু’ শব্দটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোটিল্য তাঁর আলোচনায় অপর বিদ্যাগুলির গুণাগুণ, বলাবল ইত্যাদি বিচারের ব্যাপারে এই হেতুকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে বর্ণনা করেছেন (হেতুভিরস্বীক্ষমাণাঃ)। প্রাচীন ভারতে ‘হেতু’ শব্দ সাধারণতঃ তর্ক অর্থে ব্যবহৃত এবং পূর্বে উল্লিখিত তর্ককেন্দ্রিক বিদ্যাবিশেষের ‘হেতুবিদ্যা’ সংজ্ঞার পিছনে ‘হেতু’ শব্দের এই অর্থেরই প্রয়োগ সূচিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজ মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট উপায়ে তর্কের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন যুগে ভারতে ভালভাবেই অসুভূত হয়েছিল, যার ফলে একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসাবে ভারতের চিন্তাজগতে হেতুবিদ্যার আত্মপ্রকাশ। মহাভারতের^{৭৩} মধ্যে হেতুবাদের আমরা

৭২। HIP, iii, p. 514

৭৩। মহাভারত, ১২। ২। ২৩-৪ (‘...হেতুমন্তোহপি পণ্ডিতাঃ...বক্তারো জনসংসদি চরন্তি বহুধাং কৃতস্মাৎ’) ; ঐ, ১২। ১৮। ৪৮ (‘হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসংস্হ...’)

উল্লেখ পাই। মহাভারতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে হেতুবাদী পণ্ডিতেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে জনসভায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতেন। মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে তর্কযুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী-কিছু হেতুবাদীর উল্লেখ থেকে হেতু বা তর্কের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতকে খণ্ডন করে স্বমতের প্রতিষ্ঠাই যে হেতুবাদী এই বাগ্মীদের উপজীব্য তা বোঝা যায়।^{১১} কোটিল্যের বর্ণনায় এই হেতু বা তর্কবিদ্যারই অঙ্গ হিসাবে আত্মীক্ষিকীর পরিচিতির প্রকাশ। কোটিল্যের সমকালীন হেতুবিদ্যা আত্মীক্ষিকী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবিরোধী ছিল এবং আত্মীক্ষিকীর অগ্রতম লোকায়ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা অমুমোদিত বিদ্যার এক শাখা হিসাবেই পরিগণিত হত।

প্রাথমিক পর্যায়ে বেদের অবিরোধী হিসাবে আবির্ভূত হলেও এই হেতুশাস্ত্র ক্রমে বৈদিক প্রামাণ্যের বিচারকে তার অঙ্গপরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করল। বৈদিক প্রভাবের অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়া-কলাপে ক্রমশঃ বহু লোকের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। ফলে যুক্তির মাধ্যমে বৈদিক সব ধারণাকে ঘাটাই করে দেখার প্রচেষ্টার সূচনা হয়। এর অবশুসম্ভাবী ফল হেতুবাদই হল এই প্রচেষ্টার মাধ্যম। এই বেদবিরোধী নাস্তিকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে কালক্রমে হেতুবাদের প্রতি সনাতনপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষণীয়। হেতুবাদের সংজ্ঞাতেও এর পরিণামে সাহচর্যজনিত কিছু পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়, ফলে পরবর্তী যুগের ‘আত্মীক্ষিকী’ শব্দও ভিন্ন সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত। ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীয় স্থান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উত্তর যুগের আত্মীক্ষিকী তর্ক বা অমুমান শব্দকে আপন সংজ্ঞায় ‘হেতু’ শব্দের স্থলাভিষিক্ত করেছে। অমরকোষে আত্মীক্ষিকী তর্কশাস্ত্র বলে অভিহিত।^{১২} গ্রায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের মতে ঋতি বা বেদের অবিরোধী অতীক্ষা বা অমুমান আত্মীক্ষিকীর প্রধান কাজ এবং একমাত্র গ্রায়শাস্ত্রই প্রকৃত বিচারে আত্মীক্ষিকীর মর্মান্দা লাভের অধিকারী।^{১৩} অপর পক্ষে হেতুবাদকে যারা অবলম্বন করে থাকেন সেই হৈতুকরা সনাতনপন্থীদের নিন্দার পাত্র হলেন। মহাসংহিতায় এই

১১। ‘তন্নিম্ন যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ। হেতুবাদান্ বহুনাহঃ পরস্পরজিগীষবঃ ॥’ মহাভারত, ১৪৮৫।২৭

১২। ‘আত্মীক্ষিকী দণ্ডনীতিতর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রন্যোঃ’, অমরকোষ, পৃঃ ১৩

১৩। ‘প্রত্যক্ষাগমাপ্রিতমমুমানং সা অতীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাত্মীয়াক্ষিতম্যা-বীক্ষণমতীক্ষা, তন্না প্রবর্তত ইত্যাত্মীক্ষিকী’, গ্রায়ভাষ্য, ১।১।১

হেতুবাদে অহরন্ত নাস্তিক ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এঁদের সাধুলমাজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত।^{৮৪} এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত হৈতুকরা বাক্যলাপেরও অযোগ্য বলে বর্ণিত।^{৮৫} ভাস্করার মেধাতিথির মতে হৈতুক শব্দের অর্থ এখানে নাস্তিক, অথবা পরলোক এবং বৈদিক ভাগবজ্ঞে অবিশ্বাসী ব্যক্তি।^{৮৬} মহাসংহিতার অপর ভাস্করার কুজুক ভট্ট মনে করেন যে বেদবিরোধী তর্কের ব্যবহারকারীরা হৈতুক অর্থে পরিচিত।^{৮৭} ভাগবত পুরাণে এই হৈতুক-দের ‘বেদবাদরত’ বা বেদবিশ্বাসীদের সঙ্গে পৃথক এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।^{৮৮} মহাভারতেরও বিভিন্ন স্থানে হেতুবাদরত পণ্ডিতদের নিন্দা দেখা যায়।^{৮৯}

লোকায়তের আলোচনাশ্রমক্ষে কোটিলোর বর্ণনায় যে আত্মীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত এই শাস্ত্র, সেই আত্মীক্ষিকীর পরিচয়ে আবার আমাদের কিরে আসা থাক। কোটিলোর “অর্থশাস্ত্রে” এবং পরবর্তীযুগে গ্রায়ভাষ্যে বর্ণিত আত্মীক্ষিকীর সংজ্ঞা থেকে স্বভাবতঃই অহুম্যে যে আত্মীক্ষিকী প্রধানতঃ বিশ্লেষণমূলক শাস্ত্র। বেদকে অবিসংবাদী সত্য হিসাবে নির্বিচার স্বীকৃতি না দেবার যে প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল, আত্মীক্ষিকীর প্রথম আবির্ভাবের মূল সেই প্রবণতাতেই। আত্মীক্ষিকী অবশ্য বেদলমালোচকদের পরিবর্তে বেদসমর্থকদের শাস্ত্র হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে—বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈদিক বচনকে যুক্তির সমর্থন দিয়ে প্রতিপক্ষে নীরব করাই ছিল বোধ হয় এর উদ্দেশ্য। আত্মীক্ষিকীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি বা বিচার। প্রাথমিক পর্যায়ে বেদের পরিপূরক হিসাবে অপর যে বৈশিষ্ট্য আত্মীক্ষিকী অর্জন করেছিল, তব্রিষ্যত অগ্রগতির ইতিহাসেও সে তাহা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে। গ্রায়ভাষ্যে অতীক্ষা বা বিচারের সঙ্গে ঋতি বা আগমের অবিরোধিতাকেও আত্মীক্ষিকীর প্রধান লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়েছে।^{৯০} গ্রায়মঞ্জরীর বর্ণনাতেও আগমাহুসারী অহুমান বা তর্ক আত্মীক্ষিকীর

৮৪। মহু, ২।১১

৮৫। ‘পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালত্রতিকান্, শঠান্। হৈতুকান্ বকবৃত্তাংশ্চ বাধ্যাজ্ঞে গাপি নার্কয়েৎ ॥’ ঐ, ৪।৩০

৮৬। ‘হৈতুকা নাস্তিকা নাস্তি পরলোকো, নাস্তি দত্তম্, নাস্তি হতমিত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ’।

৮৭। ‘হৈতুকা বেদবিরোধিতর্ক ব্যবহারিণঃ’।

৮৮। ভাগবতপুরাণ, ১১।১৮।৩০

৮৯। ‘... হৈতুসন্তোহপি পণ্ডিতাঃ। দৃঢ়পূর্বে স্বতা মুঢ়ানৈতদমতীতি বাদিনঃ’, মহাভারত, ১২।১৯।২৩-৪

৯০। ‘... আগমাত্ম্যমীক্ষিতাত্মীক্ষণমতীক্ষা’

বিশেষ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।^{২১} মহুসংহিতা, গৌতম ধর্মসূত্র ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতে আত্মিকী চর্চার অল্পমোদনের^{২২} মূল বোধহয় এই বিশেষ শাস্ত্রটির বৈদিক প্রভাব সমর্থনের মধ্যে নিহিত।

আত্মিকী এবং হেতুবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে হেতুবাদের এক শাখা আত্মিকী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেদবিরোধী নাস্তিকদের সঙ্গে একাত্ম হল—বেদবিরোধী বৌদ্ধদের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে তর্কের অন্তর্কে বেদের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও সে প্রসারিত করল। আত্মিকীর সঙ্গে হেতুবাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সময়ের কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কেননা হেতুবাদ যখন ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীর বিরাগভাজন, তখনও কোন কোন ক্ষেত্রে হেতুবাদের সঙ্গে আত্মিকীর ঘনিষ্ঠতার ছাপ সাধারণের চিত্তে অবিচল। যার ফলে আত্মিকীও ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচিত হয়েছে।^{২৩} আবার ব্রাহ্মণ্য সমাজে সাধারণভাবে নিন্দনীয় হৈতুকদেরও স্থানবিশেষে সম্মানের স্বীকৃতি অর্জন করতে দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যে দশাবরী পরিষৎ গঠনের বিধান “মহুসংহিতা”তে আছে, সেই পরিষদের দশ জনের মিলিত সদস্যগোষ্ঠীতে হৈতুকও অন্তর্ভুক্ত।^{২৪}

৭। লোকায়ত ও চার্বাক

প্রাচীন লোকায়ত এবং চার্বাক দর্শনের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয়েছে বোধহয় এই হেতু বা তর্কাত্মকী যুক্তির সাহায্যে। নাস্তিক যে গোষ্ঠী হেতুবাদের আশ্রয় নিয়ে বেদের প্রামাণ্য প্রতি পদে বাচাই করতে আগ্রহী ছিল, লোকায়ত ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হল। ইতিহাসের অগ্রগতির কোন পর্ধ্যায়ে বা কিভাবে উভয়ের এই মিতালি সম্ভব হয়েছিল, তা বলা বড় শক্ত। সুরেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্তের মতে ‘it is difficult, however, to say how and when this

২১। শ্রুতি, ১, পৃঃ ৪

২২। গৌতম ধর্মসূত্র, ১১ এবং মহুসংহিতা ৭।৪৩তে নৃপতিদের আত্মিকী চর্চা অল্পমোদিত হয়েছে।

২৩। রামায়ণ, ২।১০০।৩৬-৩৯। রামায়ণের এই বর্ণনায় হেতুবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও লোকায়ত আত্মিকী সংজ্ঞার সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মহাভারত, ১২।১৮০।৪৭, ‘অহর্মাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিম্বকঃ, আত্মিকীং তর্কবিদ্যামহুরক্তো নিরর্থিকাম্’।

২৪। মহুসংহিতা, ১২।১১১

older science of sophistical logic or of the art of disputation became associated with materialistic theories and revolutionary doctrines of morality, and came to be hated by Buddhism, Jainism and Hinduism alike.^{২৫} পরবর্তী যুগের চার্বাক দর্শনের ‘লোকায়ত’ সংজ্ঞার মধ্যে এই মিতালির ছাপ স্থপরিষ্কৃত।

প্রাচীন লোকায়তের হেতু বা যুক্তিভিত্তিক তর্কের উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হতে দেখা যায় পরবর্তী লোকায়ত বা চার্বাক সিদ্ধান্তে। চার্বাক দর্শন তাই প্রাচীন লোকায়তের অম্লসরণে যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে বিপক্ষের ত্রুটির অম্লসন্ধানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছে। তবে বিপক্ষ এখানে কেবল বৌদ্ধ নয়, জৈন এবং হিন্দু দর্শনের প্রতিটি শাখা এখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে যুক্ত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘বিতণ্ডাবাদসংখ্যম্’ হিসাবে যে লোকায়ত নিশ্চাই সেই লোকায়তের উত্তরাধিকারী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে একাত্মীভূত লোকায়ত গ্রায়মঞ্জরীতে তার বিতণ্ডাস্বক প্রকৃতির জ্ঞাত সমালোচনার বিষয়বস্তু।^{২৬} গ্রায়মঞ্জরীর মতে চার্বাক দর্শনে কর্তব্যের কোন উপদেশ নেই, বিতণ্ডাই এই দর্শনের প্রধান উপজীব্য। বিতণ্ডা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। প্রাচীন লোকায়ত বিতণ্ডার প্রকাশ ‘হেতু’ বা তর্কের মাধ্যমে এবং এই তর্কে অম্লরক্তির পরিচয় পরবর্তী লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের মধ্যেও ভালভাবেই পাওয়া যায়।

তর্কবিদ্যা হিসাবে চার্বাকের উল্লেখ আছে মেধাতিথি এবং কুল্লুক ভট্ট কৃত মনুসংহিতাভাষ্যে।^{২৭} চার্বাক গোষ্ঠীর একমাত্র যে রচনা আমাদের কাছে এসেছে, সেই “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে” প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তর্কই প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত।

২৫। HIP. iii, p. 516

২৬। ‘ন হি লোকায়তে কিঞ্চিৎ কর্তব্যমুপদিষ্টতে, বৈতণ্ডিককথৈবাসৌ ন পুনঃ কশ্চিদাগমঃ’, গ্রাম, ১, পৃ: ২৪৭। সম্মতিতর্কপ্রকরণের ব্যাখ্যাতা অভয়দেব সুরির উদ্ধৃত এক উক্তি অম্লসারে ‘চার্বাক শাস্ত্র-কার বৃহস্পতির সকল উক্তিই পর্যায়যোগপর অর্থাৎ পরমত দুষণের জ্ঞাত প্রত্নাস্বক’ (চার্বাক দর্শন, পৃ: ৩১)

২৭। ‘তর্কপ্রধানা গ্রন্থা লৌকিক প্রমাণধরূপেণ পরা গ্রায়বৈশেষিক-লোকায়তিকা’ মেধাতিথি টীকা, মনু, ১২।১০৬, কুল্লুক ভট্টের টীকা অম্লসারে (মনু, ১২।১০৫) চার্বাকী তর্ক, ‘কুতর্ক’। গ্রায়মঞ্জরীর মতে চার্বাকী তর্ক ‘ক্ষুদ্রতর্ক’। (চার্বাকাস্ত বরাক: প্রতিক্ষেপ্তব্যা এবতি ক: ক্ষুদ্রতর্কশ্চ তদীয়স্তেহ গণনাবসরঃ’, ১, পৃ: ৪)

চার্বাক দর্শনের যে বিতণ্ডাম্বক প্রকৃতি শ্রায়মঞ্জরীতে সমালোচনার বিষয়, সেই বিতণ্ডার স্বস্পষ্ট প্রকাশ চার্বাক দর্শনের এই মৌলিক রচনায়। প্রকৃতপক্ষে তর্কবিদ্যার পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থে দেখা গেলেও চার্বাক দর্শনের নিজস্ব বক্তবোর কোন সূত্র এর মধ্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

নাস্তিকধর্মী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন লোকায়তের মিতালি প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বৈদিক সংস্কৃতির সমুদ্র-মহানে বরাবর অমৃতের অধিকারী, নাস্তিকতা বটনেও তারাই বোধহয় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মনুস্মৃতি নাস্তিক দ্বিজ, রামায়ণের ব্রাহ্মণ জাবালি অথবা মহাভারতের ব্রাহ্মণবেশী চার্বাকের উপাখ্যানের মাধ্যমে তার আভাস পাওয়া যায়। আর দেবগুরু বৃহস্পতিকে নাস্তিকবাদের গুরু বলে বর্ণনা করার মধ্যেও এর কিছু ইঙ্গিত মেলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মী লোকায়তের নাস্তিক মতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সমর্থনেও হয়ত এই সব কাহিনী কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

লোকায়ত এবং চার্বাকের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমরা দু-একটি মতবাদের উল্লেখ করতে পারি। ভারততত্ত্ববিদ Louis de la Vallee Poussin-এর এ বিষয়ে নিজস্ব অভিমত আছে।^{১৮} ভারতের জড়বাদীরা de la Vallee Poussin-এর মতে ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞায় সাধারণভাবে অভিহিত। কারণ ভারতীয় ঐতিহ্য যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ‘ন অস্তি’ বা ‘নেই’ এই বাক্যে এঁরা তার উচ্ছেদে ব্রতী। এই বস্তুবাদী দার্শনিকদের তিনি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : (১) চার্বাকপন্থী (২) লোকায়ত এবং (৩) বারহস্পত্য অথবা বৃহস্পতিশিষ্য। তিনি মনে করেন যে চার্বাক নামে ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত মতবাদের নাম চার্বাক দর্শন এবং এই মতবাদের সমর্থকরাই চার্বাক নামে খ্যাত।

‘নাস্তিক’ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং ভারতীয় বস্তুবাদের ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত চার্বাকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞার বৃহৎ পরিধিতে তিনটি স্বসম্পূর্ণ পৃথক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির পক্ষে de la Vallee Poussin-এর সিদ্ধান্ত উপযুক্ত তথ্যের সমর্থনপুষ্ট নয়। প্রাচীন ভারতে ‘বারহস্পত্য’ মতের উল্লেখ থাকলেও ‘চার্বাক’ এই সংজ্ঞায় বিশেষিত মত সম্বন্ধে এ যুগের সাহিত্যের

নীরবতা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কাজেই প্রাচীন যুগে ‘বাহ্‌স্পত্য’ এবং ‘চাৰ্বাক’ এ দুটিকে পৃথক নাস্তিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করার সমর্থনে উপযুক্ত তথ্যের একান্ত অভাব। লোকায়তের আলোচনাতেও দেখা গেছে যে প্রাচীন লোকায়ত গ্রন্থে ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞা কেবলমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুপ্রাচীন যুগের এই তিনটি শাস্ত্রের স্বনির্ভর নাস্তিকতা সম্বন্ধে আর কিছু বলা চলে না। অপর পক্ষে, পরবর্তী যুগের শাস্ত্রো চাৰ্বাক, বাহ্‌স্পত্য ও লোকায়ত, এই তিনটি নিঃসন্দেহে একই বৃহৎ নাস্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত। চাৰ্বাক মতবাদের জনক হিসাবে চাৰ্বাক নামে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের সমর্থনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সুতরাং আরও কোন নূতন তথ্যের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত বস্তুবাদী নাস্তিক দর্শনের আদিগুরু হিসাবে চাৰ্বাকের কল্পনা সমীচীন নয়।

দক্ষিণারণ্য শাস্ত্রী ‘লোকায়ত’ এবং ‘চাৰ্বাক’কে ভারতীয় বস্তুবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ষায় হিসাবে অভিহিত করেছেন।^{২২} তাঁর মতে ভারতীয় বস্তুবাদী ধারার সূচনা বাহ্‌স্পত্য দর্শনের মধ্যে এবং বৃহস্পতি নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষ এই দর্শনের আদিগুরু। চতুর্থ এবং অষ্টম পর্ষায়ে এই ধারা ‘নাস্তিক’ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং কাপালিকাদি অধঃপতিত কিছু সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদোক্ত ঋষি বৃহস্পতি আদি পর্ষায়ের এই দর্শনের গুরু বলে অভিহিত করে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

চাৰ্বাক দর্শনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের যে রূপের প্রকাশ তার আদি প্রচারক হিসাবে বৃহস্পতিকে সকলেই স্বীকার করে থাকেন। সেই হিসাবে চাৰ্বাক দর্শনের প্রাথমিক পর্ষায়কে বাহ্‌স্পত্য বলা চলে। যদিও এই বাহ্‌স্পত্য পর্ষায়ের ভাবধারার প্রকৃত রূপ খুব স্পষ্ট নয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই পর্ষায়ের বর্ণনা-গ্রন্থে বলেছেন : ‘it was a mere tendency to opposition. It called in question all kinds of knowledge, immediate and mediate, and all evidence, perception as well as inference.’^{১০০} বিরোধিতার যে প্রবণতাকে শাস্ত্রী মহাশয়, প্রথম পর্ষায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য বলে

২২। Shastri, D. R., A Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism, pp. 1-3

১০০। Ibid, p. 1

অভিহিত করেছেন, সামগ্রিক বিচারে সেই প্রবণতার মধ্যে চার্বাকী ধারার সব পর্যায়ের প্রকৃত স্বরূপ নিহিত। প্রত্যক্ষ, অহুমান ইত্যাদি সব স্বল্প প্রমাণ এবং এই প্রমাণগুলির মাধ্যমে লভ্য জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে অস্বীকৃতির প্রচেষ্টাকেও চার্বাক দর্শনের কেবলমাত্র আদি পর্যায়ের রূপ বলে মন্তব্য করা চলে না, কারণ ঠিক এই ধরনের প্রয়াসেরই পরিচয় বহন করে আহুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে লেখা “ভদ্রোপপ্লবসিংহ” নামে চার্বাকী গ্রন্থ। বস্তুবাদী দর্শনের যে পর্যায়ের গুরুরূপে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঋগ্বেদের অন্তর্গত বৃহস্পতির উল্লেখ করেছেন, “ভদ্রোপপ্লবসিংহ”কে কোন ক্রমেই সেই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

বেদবিরোধিতার মাধ্যমে বৈদিক যুগেরই কোন এক পর্যায়ে চার্বাক দর্শনের সূত্রপাত—এটা অনেকেরই ধারণা। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই মতবাদের আদি প্রচারক হিসাবে বৃহস্পতির নামও এই দর্শনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে ভারতীয় মনে এমনভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে যে চার্বাকগুরু বৃহস্পতিকে বৈদিক যুগের অন্তিমভাগে এই মতবাদের সূত্রার সমকালীন হিসাবে গণ্য করার প্রয়াসকে অসঙ্গত বলা চলে না। তবে চার্বাকগুরু বৃহস্পতির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সমর্থনে এখনও উপযুক্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ও এ বিষয়ে তাঁরা মন্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। বেদবিরোধী দলের নেতৃত্বের পুরো ভাগে ঋগ্বেদোক্ত বৃহস্পতিকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারেও অহুরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে। অবশ্য ‘বৃহস্পতি’ শব্দকে চার্বাক মতানুসারীদের উপাধি হিসাবে বর্ণনার মাধ্যমে অগ্রত শাস্ত্রী মহাশয়ের যে ভিন্নমতের প্রকাশ তা থেকে মনে হয় নিজস্ব মতে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজেরই দ্বন্দ্ব আছে এবং সেইজন্য দুটি ভিন্নধর্মী মতের প্রত্যেকটিকেই তিনি সমান গুরুত্ব দিতে চান।

লোকায়তকে চার্বাক দর্শনের পূর্ববর্তী পর্যায় হিসাবে অভিহিত করে শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় যথার্থ ঐতিহাসিক ক্রমের অনুসরণ করেছেন। লোকায়ত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ‘চার্বাক’ এই সংজ্ঞার মাধ্যমে যে চিন্তাধারার প্রকাশ, প্রাচীন লোকায়তের অন্তর্নিহিত ভাবধারার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণ তার মধ্যে সুপরিষ্কৃত। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞা নেতিবাচক অর্থের পরিবর্তে প্রচলিত আচারের বিপরীত সাধারণত বর্জনীয় বিশেষ কিছু আচরণের পরিচায়ক,—যে আচরণের অনুসরণের মাধ্যমে বিশেষ

কয়েকটি গোষ্ঠী চার্বাকী ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিবেচিত হয়েছে। ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞাকে এভাবে ব্যাখ্যা করলে নাস্তিকবাদকে প্রকৃতই চার্বাকী ধারার অন্তিম পর্যায় বলা চলে এবং উত্তর যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে এই পর্যায়ভুক্ত চার্বাকীদের আচরণের নানা বিরূপ সমালোচনা দেখা যায়।

৮। চার্বাক সাহিত্য ও চার্বাক দর্শনে শ্রেণীগত ভেদ

গ্রন্থপরম্পরায় চার্বাক বা লোকায়ত যে বেশ সমৃদ্ধ এবং পরিণত দর্শন হিসাবে পরিগণিত হত সমসাময়িক দার্শনিকদের আলোচনা থেকে তা প্রকাশ পায়। কিন্তু চার্বাক দর্শনের মৌলিক রচনা হিসাবে জয়রাশি ভট্টের ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ ব্যতীত অত্র কোনও গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি। অত্যাশ্রয় গ্রন্থে উদ্ধৃত কিছু লোকায়ত বা চার্বাকসূত্র এবং বৃহস্পতির নামে আরোপিত কয়েকটি শ্লোক সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধীয় একটি সূত্র-গ্রন্থ এবং শ্লোকপুস্তকের অস্তিত্বের সপক্ষে এগুলি সাক্ষ্য দেয়। এ সম্বন্ধে অবশ্য অত্র কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি।

জয়রাশি ভট্টের ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহের’ উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। প্রচলিত যে চার্বাক মতের সঙ্গে আমরা পরিচিত এই গ্রন্থের মতবাদের চেহারা তা থেকে পৃথক। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকের মাধ্যমে তথ্যের ভিত্তিতে এটাই জানা যায় যে তত্ত্ব চতুষ্টয় এবং প্রমাণ হিসাবে একমাত্র প্রত্যক্ষ চার্বাকী সিদ্ধান্তে স্বীকৃতির যোগ্য। উল্লিখিত গ্রন্থে কিন্তু এই তত্ত্বচতুষ্টয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও অগ্রাহ্য। গ্রন্থের সূচনায় জয়রাশি বৃহস্পতিসূত্র উদ্ধৃত করে বৃহস্পতির চারি তত্ত্বের পটভূমিকায় তাঁর ‘তত্ত্বোপপ্লব’ বা সমস্ত তত্ত্বের স্বীকৃতি কিভাবে খাপ খায় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে বৃহস্পতিসূত্রে প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলির উল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত বিচারে এই তত্ত্বগুলিও গ্রহণযোগ্য হয় না, অত্যা তত্ত্বের ত কথাই নেই।^{১০১}

শ্রীহর্ষের ‘খণ্ডনখণ্ডাদ্যম্’ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে চার্বাকরা কোন প্রমাণকে স্বীকার করেন না।^{১০২} প্রচলিত মত অনুযায়ী

১০১। ‘নণু যদুপপ্লবস্তদানং কিম্……পৃথিবাদীনী তদ্বানি লোকে
প্রসিদ্ধানি, তাত্ত্বাপি, বিচারমানানি ন বাবতিষ্ঠন্তে কিং পুন-
রজ্ঞানি?’ পৃঃ ১

১০২। ‘সৌহর্যমপূর্বঃ প্রমাণাদিসত্ত্বানভ্যাপনমাত্মা ……’, খণ্ডনখণ্ডাদ্যম্,
পৃঃ ২৬

চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বীকৃতি আছে এবং এই প্রচলিত ধারণারই পটভূমিতে বিভিন্ন ভাষ্যকার শ্রীহর্ষকৃত গ্রন্থের এই অংশের ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে প্রমাণগুলির মধ্যে প্রধানতম অহুমান 'চার্বাকী' মতবাদে অন্তর্ভুক্তি না পাওয়াতেই এই জাতীয় সাধারণ সিদ্ধান্তের ভিত্তি। কিন্তু শ্রীহর্ষের উক্তিতে চার্বাকের প্রচলিত শাখা ছাড়া অগ্র এক শাখার উল্লেখের সম্ভাবনাও অস্বীকার্য নয়। শ্রীহর্ষের এই গ্রন্থের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যার মধ্যে এই ধরনের এক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রন্থে উল্লিখিত 'চার্বাকঃ' শব্দের অর্থ এই ব্যাখ্যামতে 'চার্বাকৈকদেশী' এবং এই 'চার্বাকৈকদেশী' বলতে বোঝায় চার্বাকের এক বিশেষ শাখা ধারা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ মানেন না। সম্ভবতঃ জয়রাশি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত এক চার্বাক।

“তত্বোপপ্লবসিংহের” মধ্যেই আমরা চার্বাক দর্শনের অপর একটি পুস্তকের উল্লেখ দেখি, নাম “লক্ষণসার”।^{১০০} পুস্তকটি সম্বন্ধে অগ্র কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তত্বোপপ্লবসিংহের বর্ণনা থেকে অহুমান করা সম্ভব নয় যে গ্রন্থটির রচয়িতা জয়রাশি স্বয়ং, অথবা তাঁরই মতের সমর্থক অপর কোন চার্বাক। কারণ গ্রন্থকার তাঁর লেখা “তত্বোপপ্লবসিংহের”ই অহুয়ুত্তি হিসাবে “লক্ষণসারকে” নির্দেশ করে প্রথম পুস্তকে আরও নিজ আলোচনার অংশবিশেষ দ্বিতীয় পুস্তকটিতে দেখাবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন।

চার্বাক দর্শনের অগ্র কোন পুস্তকের নামের উল্লেখ অগ্রত্র না দেখা গেলেও দু'একজন বিশিষ্ট চার্বাকের নাম ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিক শাস্ত্রক্ষিত তাঁর “তত্ত্বসংগ্রহে” কঞ্চলাশ্বতর^{১০১} নামে এক লোকায়তিকের উল্লেখ করেন, যার মতে দেহই প্রাণী-চৈতন্যের উৎপত্তিস্থল। বুদ্ধদেবও প্রায় সমসাময়িক নাস্তিক প্রচারক অজিত কেশকঞ্চলীর সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি। শাস্ত্রক্ষিত বর্ণিত কঞ্চলাশ্বতরের মধ্যে অনেকেই এই অজিতের সন্ধান পান। এ প্রসঙ্গে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের অভিমত আমরা উদ্ধৃত করতে পারি^{১০২} : Mm. Haraprasad Shastri in a very recent article gave vent to his belief that

১০০। ‘অব্যাপদেশপদং চ যথা ন সাধীয়ঃ তথা লক্ষণসারে ব্রটব্যম্’, তত্বোপপ্লবসিংহ, পৃ: ২০

১০১। তত্ত্বসংগ্রহঃ, ১৮৬৪

১০২। Tattvasamgraha, Foreword, pp. liv-lv

Ajitakesakambali was one of the chief expounders of the Lokayata dogmas and we are tempted to identify our Kamalasvatara with this Ajitakesakambali, one of the heretic teachers, who flourished in Buddha's lifetime. The identification is strengthened by the fact that Ajitakesakambali's views were the same as those held by Kamalasvatara and other Lokayatas mentioned in the Tattvasamgraha, including the idea that consciousness is an outcome of the body, and that it disappears with the dissolution of the body..... It is therefore probable that both Ajitakesakambali and Kamalasvatara are names of one and the same person.'

কমলশীলের “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”তে পুরন্দর নামে অপর এক চার্বাকী উল্লেখ আছে।^{১০৬} চার্বাকী সাধারণ ধারণার ব্যতিক্রম হিসাবে এই পুরন্দর লৌকিক অহুমানকে প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যদিও অলৌকিক ধারণাকে এই অহুমানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অসম্মতির পরিচয় পাওয়া যায়। পুরন্দর অথবা পূর্বে উল্লিখিত কমলাস্বতরের সম্বন্ধে অত্র বিবরণ পাওয়া যায় না এবং এঁদের রচিত কোন গ্রন্থের অস্তিত্বের পরিচয়ও আমাদের অবগামান্য নীমানার বহির্দেশে।

চার্বাকী সাহিত্যের বিরাট অবয়ব যে এক ছাঁচে গঠিত ছিল না এবং তা শ্রেণীভেদের প্রচুর অবকাশ ছিল, উপরের সামান্য আলোচনা থেকে তার কি আভাস মেলে। জয়রাশি ভট্ট এবং তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে দার্শনিক কিছু তত্ত্ব এবং বিভিন্ন তত্ত্বের ধারণার মাধ্যম প্রমাণগুলির কোনটিরই অধীন নেই। বস্তুবাদী ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় চার্বাকী চিন্তাকে যে সময়ে দেখা যায় না, চার্বাক গোষ্ঠীর এই শাখার অস্তিত্ব তারই স্বপক্ষে সন্দেহ নেই। বিরোধীপক্ষের সমালোচনায় চার্বাকের এই শাখার স্থান বস্তুবা

দম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণবৃত্ত অর্থেত বেদান্ত ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে। ১০৭

চার্বাকের যে ধারা প্রত্যক্ষের প্রমাণগুলির বিরুদ্ধে যুক্তিভ্রালের অবতারণা করে প্রত্যক্ষকে মৌন সমর্থন জানিয়েছে, তাই বোধ করি চার্বাক দর্শনের বিশেষত্বের ছাপ যুক্ত হতে সাধারণের নিকট প্রধানতঃ পরিচিত। প্রত্যক্ষের সমর্থনে চার্বাকী কোন যুক্তি আমাদের গোচরীভূত হয়নি, যদিও অল্প প্রমাণ-গুলির বিরোধিতার ক্ষেত্রে চার্বাকী তৎপরতার সাক্ষ্য ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সুপরিষ্কৃত। যাই হোক, চার্বাক দর্শনের যে রচনার ভিত্তিতে ১০৮, প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসাবে চার্বাকী চিন্তা সাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বস্তুবাদের সঙ্গে একাত্মভাবে এই দর্শনের প্রচারের মূলে প্রমাণ-দৃষ্টান্তীয় যে ধারণা আছে এটাই দর্শনটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষের প্রবেশপথ দিয়ে একমাত্র বস্তুজগতই রূপান্তরিত হতে পারে এবং প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অল্প প্রমাণে যখন চার্বাকপক্ষের স্বীকৃতি নেই, তখন স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত হয় যে একমাত্র বস্তুজগতেই চার্বাকী চিন্তা কেন্দ্রীভূত এবং চার্বাক দর্শন এই আলোকেই সাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সম্বন্ধে চার্বাকী চিন্তার বিশদ আলোচনা আমরা পরে করব।

জৈন দার্শনিক বিদ্যানন্দী তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক গ্রন্থে বৌদ্ধ শূন্যবাদী এবং ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে একযোগে তত্ত্বোপপ্লববাদীদের উল্লেখ করেছেন (সর্বথা শূন্যবাদিনস্তত্ত্বোপপ্লববাদিনো ব্রহ্মবাদিনো বা জাগ্রদুপলক্ষার্থক্রিয়ায়াং কিং ন বাধকপ্রত্যয়ঃ, পৃ: ১২৫)।

শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডবাদ্য গ্রন্থেও এই তিনটি মতবাদের অল্পরূপ একত্র উল্লেখ দেখা যায়, পৃ: ২৬।

চতুর্ভূতাস্ত্রক স্থল জগতকে একমাত্র স্বীকৃতি দিয়ে এবং চৈতন্যকে এর বিকার হিসাবে ব্যাখ্যা করে যে কয়েকটি বার্ষস্পত্য স্ত্রী বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত, চার্বাকী প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বাদিতার সমর্থনে চার্বাক পক্ষের নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে বোধ হয় একমাত্র সেগুলিকেই উপস্থাপিত করা চলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বপক্ষে এগুলিতে কোন যুক্তি না থাকলেও বোঝা যায় যে এগুলির রচয়িতা প্রত্যক্ষের সাহায্যে লভ্য তত্ত্বের অতিরিক্ত অপর কোন তত্ত্বকে গ্রাহ্য করতে অনস্বত। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমর্থনে সরাসরি কোন যুক্তি যদি চার্বাকী কোন গ্রন্থের প্রকৃতই বিষয়বস্তু হয় তা হলেও বর্তমানে আমাদের কাছে তা লুপ্ত।

পুরন্দর নামে যে চার্বাকের উল্লেখ “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে” পাওয়া যায় অল্পমান প্রমাণে তাঁর সমর্থন থেকে চার্বাকগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর মতাবলম্বী অল্প এক শ্রেণীর অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয়। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যের স্বল্পতা অবশ্য অল্প বিষয়ের মতই এ বিষয়েও আমাদের কোন সঠিক ধারণার পথে প্রধান বাধা।

আম্মা সম্বন্ধীয় মতের ভিত্তিতে চার্বাক মহলে চারটি শ্রেণীর অস্তিত্বের নিদর্শন আছে সদানন্দের “বেদান্তসার” গ্রন্থে।^{১০২} প্রথম শ্রেণী সম্ভবতঃ সাধারণভাবে পরিচিত চার্বাকের বৃহৎ গোষ্ঠী এবং এই শ্রেণীর চার্বাকদের অভিমত অনুযায়ী আম্মা দেহের সঙ্গে অভিন্ন। অপর তিন শ্রেণীর চার্বাকদের মতে আম্মা যথাক্রমে প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সঙ্গে তাদাম্ম্য সম্বন্ধে যুক্ত।^{১১০} এই চার শ্রেণীর মধ্যে দেহানুবাদীদের ধারণা স্পষ্টতঃ স্থূল বস্তুজগতে কেন্দ্রীভূত। অপর তিন শ্রেণীর চার্বাকরা বস্তুজগতের পরিধি ক্রমশঃ অতিক্রম করতে উদ্যোগী যদিও বৈদান্তিক সূক্ষ্ম বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের ধারণা স্থূলতার পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উদ্ধৃত লোকায়ত বা চার্বাক সূত্র সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে” একটি লোকায়তসূত্র দেখা যায়—‘পৃথিব্যাপন্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি তেভ্যশ্চৈতন্যম্’, অর্থাৎ তত্ত্বের সংখ্যা চার—পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু; এবং এই পদার্থচতুষ্টয়কেই চৈতন্যের কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে কমলশীল চার্বাক দর্শনে দু’ শ্রেণীর মতবাদের উল্লেখ করেছেন।^{১১১} মতবাদ দুটির অনুসরণে লোকায়ত সূত্রটি দুটি বিভিন্ন অর্থের ইঙ্গিত বহন করে—ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ দেহ চৈতন্যের উৎপত্তির ক্ষেত্র; অথবা চৈতন্যের উদ্ভব অশ্রুত হলেও ভৌতিক পদার্থ বা দেহের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। “বেদান্তসারে” উল্লিখিত চারটির পরিবর্তে চৈতন্য বা আম্মা সম্বন্ধীয় ধারণার ভিত্তিতে চার্বাক দর্শনে দুটি বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব কমলশীলের রচনার মাধ্যমে আমরা জ্ঞাত হই।

১০২। বেদান্তসার, পৃঃ ৩৪

১১০। বেদান্তসার পৃঃ ৩৪-৬

১১১। ‘তত্র কেচিৎ স্তিকারা ব্যাচক্ষতে .. অগ্নেহি ভিষ্যত ইত্যাহঃ,’ তত্ত্ব-সংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ ৫২০

হুৱেজ্জনাথ দাসগুপ্তেৰ অভিমত এ প্ৰসঙ্গে আমৰা উদ্ধৃত কৰতে পাৰি।
তিনি বলেন : “Kamalasila speaks of two different commentaries
on these sutras on two divergent lines which correspond to
the division of dhurta Carvaka and susiksita Carvaka in the
Nyayamanjari.”^{১১২}

দাসগুপ্ত মহাশয়েৰ উক্তি অহুধাবন কৰতে হলে চাৰ্বাক প্ৰসঙ্গ নিয়ে ত্ৰায়-
মঞ্জৰীৰ বৰ্ণনাৰ আলোচনা প্ৰয়োজন। জয়ন্ত ভট্ট ত্ৰায়দৰ্শনৰ বিভিন্ন খুঁটি-
নাটিৰ বিস্তাৰ প্ৰসঙ্গে চাৰ্বাক মতেৰ সমালোচনা কৰেছেন। চাৰ্বাক গোষ্ঠীৰ
কয়েকটি শ্ৰেণীৰ চিন্তাধাৰাৰ কিছু আলোচনা এইভাবেই তাঁৰ ত্ৰায় নিবন্ধেৰ
অঙ্গীভূত হয়েছে। চাৰ্বাক সম্প্ৰদায় তাঁৰ লেখনীৰ মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই
বিশেষ কোন বিশেষণে চিহ্নিত; কোথাও ‘ধূৰ্ত’ আবার কোথাও বা
‘সুশিক্ষিত’। কাজেই মনে কৰা অস্বাভাবিক নয় যে এ দুটি সংজ্ঞা চাৰ্বাক
সম্প্ৰদায়েৰ মধ্যে বিপৰীতধৰ্মী বিশেষ দুটি বিভাগেৰ অস্তিত্বেৰ দ্যোতক, অৰ্থাৎ
‘ধূৰ্ত’ চাৰ্বাকগোষ্ঠীৰ প্ৰচাৰিত মতবাদ ‘সুশিক্ষিত’ গোষ্ঠীৰ মতেৰ থেকে পৃথক
এবং ত্ৰায়মঞ্জৰীতে ‘ধূৰ্ত’ এবং ‘সুশিক্ষিত’ এই দুটি চাৰ্বাক শাখাৰ উল্লেখ
আছে।

জয়ন্ত ভট্টেৰ আলোচিত বিবৰণেৰ অহুশীলনে কিন্তু আমৰা এ সিদ্ধান্তে
আসতে পাৰি না। ‘ধূৰ্ত’ এই সংজ্ঞায় তিনি যে শ্ৰেণীৰ চাৰ্বাকদেৰ বিশেষিত
কৰেছেন তাঁদেৰ মতে প্ৰমাণ বা প্ৰমেয়েৰ সংখ্যা বা লক্ষণেৰ নিৰূপণ কৰা
অসম্ভব, ^{১১৩} চাৰ্বাকেৰা সাধাৰণতঃ প্ৰত্যক্ষপ্ৰমাণবাদী হিসাবে পৰিচিত এবং
‘ত্ৰায়মঞ্জৰী’ৰই অন্তৰ্গত প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণেৰ সমর্থক হিসাবে চাৰ্বাকদেৰ বৰ্ণনা
আছে, ^{১১৪} বিভিন্ন প্ৰমাণেৰ মধ্য থেকে কেবলমাত্ৰ প্ৰত্যক্ষকে বেছে নিয়ে

১১২। HIP, iii, p. 516; দক্ষিণাৱঞ্জন শাস্ত্ৰী তাঁৰ ‘চাৰ্বাক দৰ্শন’
গ্ৰন্থেৰ বিভিন্ন স্থানে চাৰ্বাক সম্প্ৰদায়েৰ মধ্যে ‘ধূৰ্ত’ এবং ‘সুশিক্ষিত’
এই দুটি গোষ্ঠীৰ অস্তিত্বেৰ উল্লেখ কৰেছেন (পৃ: ২৪, ৩৩, ১৩৪)।
তাঁৰ এই ধাৰণাৰ সপক্ষে অবশ্য তিনি উপযুক্ত কোন প্ৰমাণেৰ
সমর্থন দেখাবাৰ চেষ্টা কৰেন নি।

১১৩। ‘চাৰ্বাক-ধূৰ্ত্ত্ব অথাৎ স্তম্ভত্বম্ ব্যাখ্যাশ্চাম ইতি প্ৰতিজ্ঞায় প্ৰমাণ-
প্ৰমেয়সংখ্যালক্ষণনিয়মশাক্যকৰণীয়ত্বমেব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্’, ত্ৰায়-
মঞ্জৰী, ১ পৃ: ৫২

১১৪। ‘প্ৰত্যক্ষমৈবকং প্ৰমাণমিতি চাৰ্বাকাঃ’, ত্ৰায়, ১, পৃ: ২৬

‘এক’ এই বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা প্রমাণকে চিহ্নিত করেন। জয়ন্ত ভট্ট কর্তৃক ‘ধূর্ত’ এই বিশেষ সংজ্ঞায় বিশেষিত চার্বাকেরা মনে হয় এঁদের থেকে পৃথক কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিংবা হয়ত প্রত্যক্ষবাদীদের মতেরই এঁরা সমর্থক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে স্বীকৃতি দিলেও হৃদয়বিচারের মাপকাঠিতে কোন প্রমাণই শেষ পর্যন্ত এঁদের কাছে গ্রাহ্য নয়। চার্বাক দর্শনে যে এই ধরনের চিন্তা অপ্রচলিত নয় তার নিদর্শন পাওয়া যায় “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থের মাধ্যমে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যক্ষসমেত সমস্ত প্রমাণই এই গ্রন্থে স্বীকৃতির অযোগ্য বলে অগ্রাহ্য।

যাই হোক, ‘স্বশিক্ষিত’ বিশেষণের মাধ্যমে “শ্রায়মঞ্জরী”তে যে ‘ধূর্ত’ চার্বাকদের ভিন্ন অল্প কোন শ্রেণীর চার্বাকদের বিবরণ পাওয়া যায় না, তা স্পষ্ট। কারণ জয়ন্ত ভট্টের এই ‘স্বশিক্ষিত’ চার্বাকদেরও মতে প্রমাণের সংখ্যা সঙ্ক্ষে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা সম্ভব নয়।^{১১৫}

সাধারণ চার্বাক মত থেকে পৃথক অপর একটি মতের সমর্থক হিসাবে চার্বাকদের বর্ণনা করার সময় শ্রায়চার্য জয়ন্ত ‘স্বশিক্ষিত’ এই সংজ্ঞাটির আরও একবার প্রয়োগ করেছেন।^{১১৬} এই শ্রেণীর চার্বাকদের অভিমত অনুসারে আত্মা বা ‘প্রমাতৃত্ব’ মূলদেহ থেকে ভিন্ন এবং সচেতন ব্যবহারের সব কিছু এই ‘প্রমাতৃত্ব’ে আরোপা। কিন্তু এই আত্মার স্থায়িত্ব তাঁদের মতে শরীরের অস্তিত্বের সমকালীন এবং দেহনাশের পর আত্মার বর্তমানতা বা দেহান্তর পরিগ্রহণ ‘স্বশিক্ষিত’ চার্বাকেরা স্বীকার করেন না। দেহান্ধবাদী যে চার্বাকেরা আত্মাকে দেহ থেকে উৎপন্ন মনে করেন তাঁদের অভিমত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। ‘স্বশিক্ষিত’ সংজ্ঞাব মাধ্যমে বিশেষিত যে চার্বাকদের মতে আত্মা দেহ থেকে পৃথক, অথচ দেহের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত, তাঁরা স্পষ্টতই চার্বাক সম্প্রদায়ে আত্মসম্বন্ধীয় ধারণায় শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত দেন। লোকায়ত-সূত্রের বাখ্যাগ্রন্থে কমলশীল যে দুটি বিভিন্ন চার্বাক শ্রেণীর উল্লেখ করেন সম্ভবতঃ “শ্রায়মঞ্জরীর” বর্ণনার মাধ্যমেও সেই শ্রেণীভেদের অস্তিত্বের আভাস

১১৫। ‘অশকা এব প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি স্বশিক্ষিত চার্বাকাঃ’, গ্রাম, ১, পৃ: ৩৩

১১৬। ‘অত্র স্বশিক্ষিতাচার্বাকা আহঃ, বাবচ্ছরীরমধ্যস্থিতমেকং প্রমাতৃত্বম...’ গ্রাম, ২, পৃ: ৩২

পাওয়া যায়। স্বরেজনাথ দাসগুপ্তও তাঁর উক্তিতে বৃহৎ চাবাঁকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ দুটি বিভাগেরই পরিচয় দিয়েছেন।

পরস্পর ভিন্ন এই চাবাঁক শাখা দুটিকে অবশ্য ‘ধূর্ত’ এবং ‘সুশিক্ষিত’ এ দুটি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা চলে না। এ ক্ষেত্রে দাসগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। আত্মসম্বন্ধীয় ধারণা প্রসঙ্গে সুশিক্ষিতদের উল্লেখ “গ্রায়মঞ্জরী”তে থাকলেও বিপরীত মতাবলম্বী ‘ধূর্ত’ কোন চাবাঁকের পরিচয় সেখানে নেই। অপরপক্ষে, প্রমাণেব ক্ষেত্রে ‘ধূর্ত’ এবং ‘সুশিক্ষিত’ এ দুটি বিভিন্ন সংজ্ঞার চাবাঁকদের আমরা একই ধরনের মত পোষণ করতে দেখেছি। কাজেই “গ্রায়মঞ্জরী”তে চাবাঁকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য বিশেষণ দুটি এই শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত বহন করে বলে আমাদের মনে হয় না। সম্ভবতঃ ‘ধূর্ত’ শব্দটি এখানে নিন্দামূলক ভঙ্গীতে ব্যবহৃত। বিরোধী মতগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ অপ্রচলিত নয় এবং বৈদিক পুরোহিত প্রসঙ্গেও চাবাঁকেরা একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।^{১১৭} ‘সুশিক্ষিত’ সংজ্ঞাটি চাবাঁকদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। তর্কবিদ্যায় তাঁদের পাবদর্শিতা এতই সুপরিচিত যে চাবাঁকগোষ্ঠীর সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে এটির ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়।

হয়ত পাণ্ডিত্যের বিচারে অধিকতর পারদর্শী চাবাঁকের অন্য কোন শাখাকে উদ্দেশ্য করে ‘গ্রায়মঞ্জরী’তে ‘সুশিক্ষিততর’ এই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে।^{১১৮} জয়ন্ত ভট্টের বর্ণনা অনুসারে তাকিকের এই গোষ্ঠী অহুমানকে তিনি দু’শ্রেণীতে ভাগ করেন : উৎপন্নপ্রতীতি ও উপাদাপ্রতীতি। প্রথম বিভাগে তাঁরা লৌকিক বিষয়ের অহুমান, যথা ধূম থেকে অগ্নির জ্ঞান ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, পরলোক ইত্যাদির জ্ঞান এঁদের মতে দ্বিতীয় অহুমানের মারকং হয় এবং এই ধরনের অলৌকিক বিষয়ের অহুমানে স্বীকৃতি দিতে এঁরা রাজী নন। এই প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত চাবাঁক পুরন্দরের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। ‘সুশিক্ষিততর’ এই তাকিকগোষ্ঠীর মতের সঙ্গে পুরন্দরের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টের আলোচনায় পুরন্দরের সমর্থক চাবাঁক সম্প্রদায়ের উল্লেখ অহুমান করা অসঙ্গত হবে না।

১১৭। ‘ধূর্তপ্রলাপজরী’, প্রচ. পৃ: ৬৫; ‘ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ’, সমং, পৃ: ১৫

১১৮। সুশিক্ষিততরাঃ প্রাঃ...যদ্বাৎশ্রবসর্বজ্ঞপরলোকাদিগোচরম্।

অহুমানং ন তন্ত্বেষ্টং প্রামাণ্যং তত্ত্বদর্শিতিঃ ॥ জ্যাম, ১, পৃ: ১১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি প্রসঙ্গে

১। ভারতীয় দর্শনের পটভূমি

ভারতীয় বস্তুবাদ সম্বন্ধে Erich Frauwallner বলেছেন :^{১১৯}

“The Indians themselves, as a rule, speak not of Materialism but they characterize its adherents usually as deniers or negativists (nastikah). For the Indian Materialism the essential thing is not the denial of the soul and the exclusive restriction to matter as the cause for the explanation of the world. The decisive thing, on the contrary, is its purely negative interest. Its aim is to dispute and deny the continuance of life after death, the retribution of good and bad work and the moral claims derived out of them. It is interested in philosophical questions only so far as they serve this aim. Concerning the rest, it is indifferent to them. Therefore the Indian characterization of them as deniers or negativists' is appropriate.”

ভারতের দর্শনশাস্ত্র তাই বস্তুবাদের একমাত্র প্রতিনিধি হয়েও চার্বাক সিদ্ধান্ত ‘বস্তুবাদী’ এই আখ্যার পরিবর্তে ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞার মাধ্যমেই অধিকতর পরিচিত। চার্বাকদের নীতি প্রধানতঃ নেতিবাচক। ভারত দর্শননীতির বিধানশাস্ত্র এঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নিয়ে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ‘they have a few doctrines to defend but a lot to assail.’^{১২০} বস্তুবাদী মতকে সাধারণভাবে আশ্রয় করলেও চার্বাকপন্থীরা বস্তুবাদের খুঁটিনাটিকে তাঁদের উপজীব্য করেন নি। ভারতীয় ঐতিহ্যের যে মূল ধারা ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার বিভিন্ন খাতে প্রবহমান, তার অগ্রগতির পথে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াতেই এঁরা নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

১১৯। Erich Frauwallner, History of Indian Philosophy, Vol. ii, p. 215

১২০। Lokayata, p. 4

চার্বাক দর্শনের যে অংশ আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত তার মধ্যে এই প্রচেষ্টার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। “ভদ্রোপপ্লবসিংহে”র মধ্যে এই প্রচেষ্টা চরম আকার ধারণ করে চার্বাক দর্শনের নেতিবাচক রূপকে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে। চার্বাক মত সম্বন্ধে ধারণার প্রস্তুতি হিসাবে সেইজন্তু ভারতের দর্শনচিন্তার মূলগত ভাবধারা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার প্রয়োজন। এই ভাবধারার বিরোধিতার মধ্য দিয়েই চার্বাকীয় চিন্তার অগ্রগতি। যদিও চার্বাকেতর ভারতের অজ্ঞাত দার্শনিকগোষ্ঠী এই সাধারণ ভাবের দ্বারাই অল্পপ্রাণিত।

ভারতের দর্শনচিন্তার মূলগত ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের যেতে হবে এর উৎসস্থে—উপনিষদীয় চিন্তাধারার মধ্যে। জগতের দুঃখবহুলতা উপনিষদের ঋষিকে ব্যাকুল করেছিল। বস্তুজগতের উপকরণের সম্ভারের মাধ্যমে এই দুঃখ দূর করার চেষ্টা তাঁদের অন্তরকে নাড়া দিতে পারেনি। বস্তুতাত্ত্বিক স্থখের স্থায়িত্ব দীর্ঘকালীন নয় বলেই হয়ত দুঃখ থেকে পরিজ্ঞাণ লাভের আশায় মানুষ্য এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। বস্তুমুখী স্থখে অতৃপ্তা মৈত্রেয়ীর মনে প্রশ্ন উঠেছিল, ‘যেনাহং নামৃতা শ্রাং, কিমহং তেন কুর্যাম্?’^{১২১} এই জিজ্ঞাসার স্বত্ব ধরেই উপনিষদের ঋষির অমৃতত্বের সন্ধানে অগ্রগতি এবং এই গতির পথে অঙ্কুরিত হল ভারতের মাটিতে এক নূতন চিন্তার বীজ। জাগতিক নখর স্থখে তৃপ্তি না পেয়ে বস্তুজগতের অতীত অমৃতলোকের সন্ধানে ফিরেছিল উপনিষদীয় ভাবনা, এবং এরই রমধারায় পরিপুষ্টি লাভ করেছে ভারতের দর্শন-কলেবর। মৌলিক তত্ত্বের রূপায়ণে অবশ্য সব দর্শনের আশ্রয় নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতি, কিন্তু উপনিষদের এই মূল সুর সব সময়ে তাদের বিস্তারিত পরিধির কেন্দ্রবিন্দু। Winternitz-এর মতে ‘the pessimism of later Indian philosophy has its roots in the Upanisads’.^{১২২}

চার্বাকেতর ভারতের দর্শনগুলির মধ্যে বড় দর্শন বা বেদ ও উপনিষদসমারী ছ’টি দর্শনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি ছাড়াও ভারতের দর্শনজগতে বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠা আছে। আশ্চিকতার মানদণ্ডে ভারতীয় দর্শনগুলিকে বিচার করার সনাতনী প্রচেষ্টার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এই মানদণ্ডের বিচারে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন আশ্চিকতার পর্যায়ে

১২১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।৪।৩

১২২। HIL, p. 264

উন্নীত হতে পারেনি, এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তকারদের মতে এদের স্থান নাস্তিক চার্বাকদের সঙ্গে একই সাধারণ পংক্তিতে। যদিও সর্বদর্শনসংগ্রহ-কার মাধবাচার্য নাস্তিক চার্বাককে এঁদের মধ্যে অগ্রণীর আসন দিয়েছেন। ১২৩ ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধারণ মূল্যবোধের স্বীকৃতির বিচারে অবশ্য অধ্যাত্মদর্শনের যে ধারা ষড়্‌দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রবহমান, সেই একই ধারা বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনকেও অভিসিদ্ধি করেছেন। আমাদের পরবর্তী আলোচনা চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনসমষ্টির সাধারণ ধর্মগুলিকে কেন্দ্র করে, যেগুলির বিরোধিতার মাধ্যমে ‘নাস্তিক’ পংক্তিতে চার্বাকের আসন অবিসংবাদী।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে উপনিষদসূত্রী দর্শন হিসাবে প্রধানতঃ পাঁচটি দর্শনের নাম করা যেতে পারে—বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ত্রায় এবং বৈশেষিক, যদিও ঔপনিষদিক ভাবধারার অবিকৃত রূপায়ণ একমাত্র প্রথমটিতেই দর্শণীয়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম অংশ হিসাবে উপনিষদ্ ‘বেদান্ত’ পদবাচ্য এবং বেদান্ত দর্শনকেও এই ‘বেদান্তের’ অমুখতি বলা চলে। ভাস্কর্যকারদের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেদান্ত দর্শনও অবশ্যপরস্পর বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। অত্যাগত দর্শনগুলিতে স্বাধীন চিন্তার দ্বারা ঔপনিষদিক ভাবধারার অমুখতি অনেকাংশে ব্যাহত। কিন্তু এই দর্শনগুলির ব্যাখ্যাকারেরা উপনিষদেরই বাণীকে নানা ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করে উপনিষদের বাণীর মধ্যে তাঁদের এই পরিবর্তিত মূল দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। কাজেই বহু ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মী মতবাদকে আশ্রয় করলেও মূলতঃ এঁরা সকলে উপনিষদের সঙ্গে অবিকৃত মতবাদের পোষক এবং এঁদের দ্বারা প্রচারিত মতবাদকে সাধারণভাবে উপনিষদসূত্রী বলা যেতে পারে। জাগতিক ভোগস্বখের একান্ত নিবৃত্তি যেখানে সেই মোক্ষকে লক্ষ্য হিসাবে রেখেই এঁরা সকলে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ একমাত্র এই লক্ষ্যতেই তাঁদের মতে হুঃখেরও চরম নিবৃত্তি।

ভারতের ষড়্‌দর্শনের মধ্যে মীমাংসা উপনিষদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত নয়। উহা বেদেব ব্রাহ্মণভাগের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে স্বর্গলাভ এই দর্শনে চরম চরিতার্থতা—এই দর্শনের আদি পর্ধ্যায়ে অন্ততঃ স্বর্গলাভের অতিরিক্ত অল্প কিছু প্রয়োজনীয়তা অমুভূত হয়নি। সম-সাময়িক অন্যান্য অধ্যাত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মীমাংসার অভীষ্ট লক্ষ্যকে

ভিন্নরূপ দেবার প্রয়াস পরবর্তী ভাষ্যকারদের মধ্যে অবশ্য দেখা যায়। প্রভাকর এবং কুমারিলের রচনায় যে মোক্ষ চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশিত, ১২৪ সংসার বন্ধনের পরিসমাপ্তির রূপ নিয়ে তা এই দর্শনটিকে উপনিষদমুসারী অন্তর্দর্শনগুলির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ষড়্‌দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করলেও ভাবগত ঐক্যের বিচারে এ দর্শন দুটিও উপনিষদীয় দর্শনগুলির সমপরায়ুক্ত। কামনাধর্মী বৈদিক ক্রিয়াবাহুল্যের ভায়ে ক্রিষ্ট যে প্রেরণা উপনিষদীয় দর্শনের সৃষ্টির মূলে, বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদের উদ্ভবের মূলেও সেই প্রেরণার কার্যকরিতা দেখা যায়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণার জন্য বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার অমূল্যস্থানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

২ ॥ বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রায় সমসাময়িক মহাবীর এবং গৌতমবুদ্ধের মাধ্যমে জৈন এবং বৌদ্ধ মতবাদ প্রায় একই সময়ে ভারতের চিন্তাগগনে আত্মপ্রকাশ করে। ১২৫ এই দুই মহাত্মনবের আবির্ভাবের যুগকে ভারতের চিন্তারাজ্যে একটা অস্থিরতার যুগ হিসাবে বর্ণনা করা যায়। বৈদিক যুগের শেষ পর্ধায়ে যাগযজ্ঞাদি যখন তার প্রাণশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, নিম্প্রাণ অমুঠানগুলিকে কেন্দ্র করে বৈদিক প্রভাব তখনও পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী। নানা ধরনের কুসংস্কার-যুক্ত আচার অমুঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোক তখন স্রবের সন্ধানে ব্যস্ত। বুদ্ধির বিচারে উন্নত কিছু লোক গতানুগতিকতার বন্ধন কাটিয়ে উপায়ান্তরের মাধ্যমে স্রবের পরিতৃপ্তির প্রয়াসী ছিল। উপনিষদীয় ভাবনা তখন চিন্তারাজ্যে কিছুটা আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু ঐ ভাবনা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের বাইরে। ভবিষ্যৎ যুগের দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির পরিণত চিন্তাবুদ্ধির বীজ এই যুগেই ভারতীয় জনমানসে জন্মঃ অঙ্কুরিত হতে থাকে। ভারতের বুদ্ধিগগন সেই সময়ে অপরিণত দার্শনিক মতবাদের বিক্ষিপ্ত খণ্ড মেঘে সমাচ্ছন্ন। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন বিভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক চিন্তা-গোষ্ঠীর উল্লেখ দেখা যায়। ১২৬ Radhakrishnan-এর মতে "It was an age

১২৪। IP, ii pp. 122-4

১২৫। IP, i, p. 291

১২৬। Ibid, p. 353, fn. 2

of speculative chaos, full of inconsistent theologies and vague wranglings".^{১২৭} অপরিতৃপ্ত মনের নানা ভাবের জিজ্ঞাসার বহিঃপ্রকাশ এই সব বিভিন্ন ধাঁচের মতের রূপায়ণে। কিন্তু জনজীবনের আচরণের সঙ্গে এগুলির কোন যোগ ছিল না। প্রাত্যহিক আচার অহুষ্ঠানের পরিবর্তে নীতি-সম্মত কোন কর্তব্যের বিধান এগুলি জনগণের কাছে উপস্থাপিত করেনি। এই অস্থিরতার যুগে ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হন দুই মহামানব, মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ। চিন্তাবাজের বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষের নৈতিক জীবনে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই নৈরাজ্যের কবল থেকে এই দুই মহাপুরুষ ভারতের জনগণকে মুক্তির সন্ধান দেন।

বুদ্ধদেব প্রচার করলেন যে মানুষ তার কাক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারে আত্মাহুসন্ধানের মাধ্যমে, পুরোহিত বা ভগবানকে কেন্দ্র করে নয়। বৈদিক বিধানের নির্দেশনায় শুদ্ধ আচার অহুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি যে প্রাণহীন আহুগতা ক্রমশঃ পল্লবিত হয়ে উঠছিল তাকে তিনি অগ্রাহ করে চিত্ত-শুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। বুদ্ধদেবের বাণীতে শুধু যে বৈদিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধরিত হ'ল তা নয়, অস্থির দর্শনচিন্তার অলস প্রবাহ উপযুক্ত কর্তব্যের পথে তার গতিকে প্রসারিত করার প্রয়াস পেল।

বৈদিক অহুষ্ঠানের বিরোধী হলেও দেশ ও কালের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের পূর্ণ সঙ্গতি ছিল এবং বস্তুতঃপক্ষে উপনিষদীয় চিন্তারই এক নূতন প্রকাশ তাঁর বাণীর মধ্যে দেখা গেল। Radhakrishnan-এর মতে 'early Buddhism, we venture to hazard a conjecture, is only a restatement of the thought of the Upanisads from a new standpoint'. প্রকৃতপক্ষে বৈদিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার যে প্রয়াস উপনিষদে কাষকরী বৌদ্ধ দর্শনে তা অদৃশ্য এবং সেইজন্য 'to develop his theory Buddha had only to rid the Upanisads of their inconsistent compromises with Vedic polytheism and religion, set aside the transcendental aspect as being indemonstrable to thought and unnecessary to morals, and emphasise the ethical universalism of the Upanisads'.^{১২৮}

১২৭। IP, i, p. 353

১২৮। Ibid, pp. 360-1

বৌদ্ধ দর্শনের মত জৈন মতবাদও ভারতের প্রাচীনতর চিন্তাধারার আর এক নূতন প্রকাশ। জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরকে জৈন তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চতুর্বিংশ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর মাধ্যমে পূর্ব-সূরীদের মতগুলিই একত্র গ্রথিত হয়ে নূতনভাবে প্রচারিত হয়েছে বলে জৈনদের বিশ্বাস। মাহুঘের দুঃখ অপনোদনের প্রচেষ্টায় জৈন তীর্থঙ্করদের এই ভাবনা যে উপনিষদীয় চিন্তার সমধর্মী নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের মূলগত ঐক্যের বীজের সন্ধান প্রকৃতপক্ষে উপনিষদেই করা চলে এবং ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞায় চিহ্নিত বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন দুটির মধ্যেও একই উপনিষদীয় চিন্তার প্রবাহ দুটি পৃথক ধারায় প্রবহমান। এ সম্বন্ধে আমরা Winternitz-এর মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি।^{১২২} ‘In fact the whole of the later philosophy of the Indians is rooted in the Upanisads. Their doctrines formed the foundation for the Vedanta-Sutras of Badarayana. Moreover, all other philosophical systems and religions which have arisen in the course of the centuries, the heretical Buddhism no less than the orthodox Brahmanical religion of the post Buddhist period, have sprung forth from the soil of the Upanisad doctrines.’

উপনিষদের অম্লগামী সাংখ্যদর্শনের মধ্যে জাগতিক সব রকম দুঃখের কবল থেকে অব্যাহতির জ্ঞান যে তীত্র ব্যাকুলতার প্রকাশ,^{১৩০} তারই ভিন্নরূপে অভিব্যক্তি দেখা যায় বৌদ্ধ দর্শনে। সাংসারিক ভোগের মধ্যে বুদ্ধদেব স্বপ্নের সন্ধান পাননি। তাই ধনীর দুলাল হয়েও তিনি সংসারত্যাগী এবং সেই পথেই অম্ল-সন্ধানে বতী হয়েছিলেন যার অম্লসরণে মাহুঘ এই দুঃখবহুল সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম। দীর্ঘ তপস্যার পর বুদ্ধদেব অতীষ্ট লাভে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর এই সফলতার সাক্ষ্য বহন করে আছে বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে সাংসারিক দুঃখের তীত্র জ্বালার অবসানকে কেন্দ্র করেই চার্বাকের ভারতীয় দর্শনগুলি রূপায়িত। নির্বাণের

১২২। HIL, pp. 264-5

১৩০। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ সাংখ্যপ্রবচনসূত্র,
১।১ ; দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ, সাংখ্য-
কারিকা, ১

মধ্যে বুদ্ধদেব এই দুঃখের অবসান দেখেছিলেন, অন্ত্যান্ত দর্শনগুলির মতে মোক্ষ বা মুক্তিতেই এর পরিসমাপ্তি। মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বর্ণনা আছে। জৈন দার্শনিক চিন্তাতেও মোক্ষের স্বীকৃতি আছে এবং এই মত অনুসারে মুক্ত পুরুষ নিজের পৃথক সত্তা রক্ষা করে অনন্তকাল ধরে অসীম শান্তি ভোগ করেন।^{১৩১} সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্ত মুক্তিকালে চৈতন্য-রূপী আত্মার শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিতিকে স্বীকার করে।^{১৩২} বেদান্ত দর্শনের বহু স্থলে এই স্বরূপের সঙ্গে আনন্দরূপকে একাত্ম করা হয়েছে,^{১৩৩} কিন্তু এ ধরনের কোন উল্লেখ সাংখ্য এবং যোগদর্শনে নেই। দুঃখভোগের পরিসমাপ্তি কামনায় যে মোক্ষকে সাংখ্য ও যোগ লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই মোক্ষের অবস্থাতে কেবল যে দুঃখই অল্পশেষিত তা নয়, বাবহারিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত স্রুতেরও একান্ত অভাব।

যে মুক্তির মধ্যে জাগতিক সব রকম দুঃখের নিবৃত্তি রূপায়িত, সেই মুক্তি বা মোক্ষ ভারতীয় দার্শনিকদের বিচারে পরম পুরুষার্থ বা মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসাবে গণ্য। সাধারণ মানুষ তার কামা বস্তুকে নেতিবাচক রূপে কখনই দেখতে চায় না। দুঃখের উৎপাদন থেকে মুক্তি সে স্বাভাবিকভাবেই কামনা করে, এবং তার পরিবর্তে সে চায় জাগতিক স্রুতের আশ্বাদন। কাজেই সাংখ্য ও যোগ যখন মোক্ষকে স্রুত এবং দুঃখ উভয়েরই অভাবরূপে বর্ণনা করে তখন মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করতে অনেকেরই আপত্তি থাকতে পারে। সাংখ্যচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে এই ধরনের আপত্তির সম্ভাবনাকে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন।^{১৩৪} মানুষের মধ্যে তিনি শ্রেণীভেদ দেখিয়েছেন। জাগতিক স্রুতে একশ্রেণী মগ্ন থাকতে অভিলাষী। আবার অপর শ্রেণীর লোকেদের কাছে দুঃখের চরম নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। মুক্তি লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশিত কেবল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের কাছে। সাধারণ বা প্রথম শ্রেণীর লোকের কাছে এর কোন আকর্ষণ নেই।

নৈম্নায়িকেরাও দুঃখের চরম অবসানকে মুক্তির মধ্যে রূপায়িত করতে চান।

১৩১। ভারতদর্শনসার ; পৃ: ১১৫।

১৩২। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৫ ; যোগ-সূত্র, ৪।৩৪ ; শাভা, ৪।৪।১-৩

১৩৩। ‘অনবচ্ছিন্নানন্দ প্রাপ্তি’, IP, ii, p. 637-তে উদ্ধৃত চিংসুখ্যচার্যের উক্তি অনুসারে।

১৩৪। সাংখ্যর প্রবচনভাষ্য ৩।৯

কিন্তু সাংখ্য, যোগ বা বেদান্ত মতের সঙ্গে এঁদের মতের মূলগত পার্থক্য আছে। মুক্ত অবস্থায় আত্মার যে চৈতন্যময় সত্তা সাংখ্য যোগ বা বেদান্তমতে স্বীকৃত, জ্ঞান মতে মোক্ষের তার অস্তিত্ব নেই, এবং এইজন্যই মুক্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের ধারণাকে খুব স্পষ্ট বলা চলে না। জ্ঞানসূত্র অনুসারে মুক্তি শব্দের অর্থ দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ।^{১৩৫} সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন মোক্ষাবস্থার সূত্রের অনুপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যের অভাবের পটভূমিতে দুঃখ, সূত্র ইত্যাদি সব কিছুই অনুপস্থিতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় মুচ্ছাবস্থার সঙ্গে তার সাদৃশ্য কল্পনীয়। এই অবস্থার অনুরূপ মুক্তি কোন ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না।^{১৩৬} ন্যায়সূত্রানুসারী মুক্তি সম্বন্ধে এ ধরনের আশঙ্কার নিরসন-কল্পে ন্যায়ভাষ্যকার মুক্তিকে পরম শান্তির অবস্থা রূপে বর্ণনা করেছেন। দুঃখের চরম অভাবের মধ্যেই এই শান্তির বীজ নিহিত বলে তাঁর অভিমত।^{১৩৭} কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে অবশ্য মুক্তিতে জীবের আনন্দানুভূতি থাকে। মাধবাচার্যের লেখা ‘শ্রীমচ্ছরদিশিভূষণ’ গ্রন্থে জ্ঞানের মুক্তি সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের অভিমতের বর্ণনা থেকে এটা জানা যায়।^{১৩৮}

যাই হোক, দুঃখের আত্যন্তিক অবসানকে লক্ষ্য করেই যে ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা নির্বাণের রূপায়ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাহ্মম প্রাথমিক পর্যায়ে সূত্রের অভিল্যাবী। এই সূত্রের পথের প্রতিবন্ধক তার কাছে দুঃখ, এবং এই দুঃখের প্রতিকারের সে চেষ্টা করে সর্বজনস্বীকৃত লৌকিক পথকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ দুঃখনিবৃত্তি এবং তার পরিণতিতে পাওয়া সূত্র সাময়িক এবং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহত্তর দুঃখের প্রসূতি হিসাবে

১৩৫। দুঃখ...রাপাদপবর্গঃ ১।১।২ ; বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি। তদত্যন্ত-বিমোক্ষঃ অপবর্গঃ। ১।১।২১-২২ ; স্মৃপ্তস্ত স্পাদর্শনে-ক্লেশা-ভাবাদপবর্গঃ ৪।১।৩০

১৩৬। ‘অপবর্গে ভীষ্মঃ খলয়ং সর্বকার্যোপরমঃ, সর্ববিপ্রয়োগেইপবর্গে বহু ভক্তকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্বস্থোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপ-বর্গং রোচয়েদিতি’, ১।১।২

১৩৭। ‘অপবর্গে শান্তঃ খলয়ং সর্ববিপ্রয়োগঃ সর্বোপরমোইপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্বদুঃখোচ্ছেদং সর্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি’, ৬

১৩৮। ‘.....আনন্দ-সংবিৎ-সহিতা বিমুক্তিঃ’, ১৬।৬২

গণ্য হতে পারে। ১৩৯ ভারতের দার্শনিক তাই ক্ষণস্থায়ী সূত্রের প্রতি উদাসীন থেকে সংসারের দুঃখবহুলতাকেই প্রাধান্য দেন এবং নির্বাণ বা মুক্তির মধ্যে সংসারবন্ধনের সমাপ্তি নির্দেশ করেন।

কিন্তু দুঃখের এই চরম নিবৃত্তি লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুঃখের মূল এবং সেই মূলোচ্ছেদের সঠিক উপায় অবধারণ করা যায়। কাজেই জাগতিক দুঃখের চরম নিবৃত্তির সম্ভাব্যতার ধারণার সঙ্গে আত্মমজিক-ভাবে জড়িত আরও কয়েকটি স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিগুলিই রূপায়িত বুদ্ধবর্ণিত চারটি সত্যের মাধ্যমে—জগৎ দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ এবং এই পরিত্রাণের উপায়ও আছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় নানা ব্যাপার নিয়ে নানারকম বিরোধ দেখা যায়, কিন্তু এই সব বিরোধের অন্তরালবর্তী কাঠামো বুদ্ধস্বীকৃত ‘চত্বারি আর্দ্রসত্যানি’ বা এই সত্যচতুষ্টয়ের ভাবনা দিয়ে গড়া। ১৪০ এই ভাবনার ভিত্তি হিসাবে কতকগুলি সাধারণ ধারণা চার্বাকের ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই অমুমোদন লাভ করেছে।

প্রথম ধারণা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং ভারতের দর্শনচিন্তার মূল এই আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বা অধ্যাত্মবাদে নিহিত। Radhakrishnan-এর মতে^{১৪১} ‘the dominant character of the Indian mind which has coloured all its culture and moulded all its thoughts is the spiritual tendency.’ দুঃখময় সংসারবন্ধনের পরিসমাপ্তি হিসাবে মোক্ষ বা নির্বাণ সম্বন্ধীয় ভারতীয় ধারণার উল্লেখ আমরা করেছি। মরণের পর দেহ-নাশের সঙ্গে জীবের অস্তিত্বের অবসান কল্পনা করলে এই আকাজিক লক্ষ্যে উপনীত হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই দেহসীমার বাইরেও দেহাতীত রূপে জীবের বর্তমানতা স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিবাদের সমর্থকদের অমু-

- ১৩৯। ‘কুত্রাপি কোহপি সূখী। তদপি দুঃখশব্দমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তে বিবেচকাঃ’, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৬।৭-৮, সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্ক-
কার বিজ্ঞানভিক্ষু লৌকিক সূত্রের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দুঃখের অস্তিত্বের সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন—‘যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে। তদেব দুঃখবৃক্ষস্ত বীজত্ব-
মুপগচ্ছতি।’ গ্রন্থভাষ্যকার বাৎস্তায়নের মতে ‘যথা মধুবিষসম্পৃক্তা-
ন্নমনাদেয়মিত্যেবং সূত্রং দুঃখানুশক্ত্যন্নাদেয়মিতি’ ১।১।২; ‘পরি-
ণামতাপসংস্কারদুঃখৈ... দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ’, যোগসূত্র, ২।১৫
- ১৪০। ‘...ইদমপি শাস্ত্রং চতুর্বৃহমেব, তদযথা... মোক্ষোপায় ইতি’ যোগ-
ভাষ্ক, ২।১৫

মোদন লাভ করেছে। ‘আমি’ এই অল্পভূতিই আত্মার অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। মানুষের জীবিতকালে এই আত্মা তার দেহের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় এবং স্থূল বিচারে আত্মাকে সে সময় দেহের অঙ্গীভূত বলে মনে হয়। কিন্তু আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের এটাই অভিমত। ১৪২ এই দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের প্রচলন দেখা যায়।

চার্বাকের ভারতের অত্যাশ্রয় দর্শনের সমধর্মী হয়েও বৌদ্ধ ধারণা এ ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন করে। বৌদ্ধ দর্শনে অবিকারী স্থায়ী আত্মার কোন কল্পনা নেই। ১৪৩ বৌদ্ধ মতে স্থখ দুঃখের অল্পভূতি, জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু ক্ষণিক এবং এই ক্ষণিক অল্পভূতির প্রবাহ তাঁরা জ্ঞাত হই আরোপ করেন। ১৪৪ মানবমনে উদ্ভূত জ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র প্রবাহে আত্মবাদী আচার্যেরা স্থির আত্মস্বরূপের বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ বলে মনে করেন। বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। মানবমনের নিত্য পরিবর্তনশীল বিচিত্র অল্পভূতির বাষ্টিরূপ তাঁদের কাছে ভোক্তৃত্বের মহিমায় মগ্ন। নিত্য চৈতন্যের স্বীকৃতিতে উভয় পক্ষই এখানে সমধর্মী, পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গীতে। বিভিন্ন-ধর্মী পুষ্পের সমবায়ে গ্রথিত মালার অন্তর্গত কুহুমগুলিকে যেখানে বৌদ্ধরা পৃথকভাবে প্রাধান্য দেন, আত্মবাদী দার্শনিকদের কাছে সেখানে মালাটি তার অখণ্ড অস্তিত্বে প্রকাশমান। কাজেই দৃশ্যমান পার্থক্য সত্ত্বেও সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শনকেও আমরা ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের সমধর্মী বলে ধরে নিতে পারি।

১৪২। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬।১-৪

১৪৩। ‘আত্মা’ শব্দটি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শনে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থান লাভ করলেও শব্দটি সেখানে ভিন্ন অর্থের পরিচায়ক। বিজ্ঞানবাদীরা ‘আত্মা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন সংসারদশায় বদ্ধ জীবের বিপর্যস্ত বিজ্ঞানকে বোঝাতে এবং ‘নৈরাশ্র্য’ তাঁদের কাছে এর বিপরীত অর্থের স্ফোটক। (আত্মদর্শন-বিরুদ্ধক নৈরাশ্র্যদর্শনম্... নৈরাশ্র্যদর্শনশাস্ত্রদর্শনেন সহ বিরোধঃ, তত্ত্বসংগ্রহ, পৃ: ৮৭০) বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞ এই নৈরাশ্র্যের সাধনাতে নিজেকে মগ্ন করেন এবং সর্বজ্ঞতা ইত্যাদি আত্মবাদীদের স্বীকৃত বিভিন্ন আত্মার স্বাভাবিক ধর্মে ভূষিত হন। (প্রত্যক্ষীকৃত-নৈরাশ্র্যে ন দোষো লভতে স্থিতিম্...তত্ত্বসংগ্রহ, ৩৩৩৮)

১৪৪। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, ৫।৭৭তে বলা হয়েছে যে বৌদ্ধ ধারণায় ‘ক্ষণিকজ্ঞানমেবাত্মা’

জন্মান্তরবাদ বা এই দেহাতিরিক্ত আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে অল্পমোদিত আর একটি সাধারণ ধারণা। যে মোক্ষ বা নির্বাণ ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশিত, তাকে বিশেষ কোন জন্মমৃত্যুর পরিসরে আবদ্ধ জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রস্তুতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে নির্দিষ্ট কোন জীবনের আগে এবং পরে জীবের আরও বিভিন্ন জন্মের অস্তিত্ব। এই জন্মগুলিতে ভোগের মাধ্যমে প্রারম্ভিক কর্ম ক্ষয় করে জীবকে যেতে হয় মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে এবং জন্ম থেকে জন্মান্তরের এই সুদীর্ঘ পথের অতিক্রমণে যাত্রী জীবের দেহাতীত সত্তা। এই প্রসঙ্গে কর্মফলবাদেরও উল্লেখ করতে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ—এ দুটি ধারণা পরস্পরের পরিপূরক। এই জন্মান্তর আর কর্মফলের স্বীকৃতির ভিত্তির উপর ভারতীয় দর্শনের যে বিশাল সৌধ দণ্ডায়মান, তার সম অংশীদার বেদ ও উপনিষদমুসারী ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। বৌদ্ধ বিশ্বাস অমুখ্যায়ী বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব রূপে বিভিন্ন জন্ম অতিবাহিত করার পর শাক্যবংশীয় অস্তিম জীবনে বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞানের অধিকারী হন।

যে ধারণার পটভূমিতে কর্মফলবাদ রচিত তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় আধুনিক বস্তুকেন্দ্রিক বিজ্ঞানে অল্পমোদিত একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতিতে। এ নীতি অমুসারে জগতের প্রতিটি ক্রিয়া সমযম্যী এবং বিপরীতমুখী অপর একটি ক্রিয়ার জনক। সাধারণ এই ধারণাটি কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের প্রলেপে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক আকার পরিগ্রহ করেছে—কর্মফলবাদের আকারে যা ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার অঙ্গীভূত। ভারতের এই মৌল অধ্যাত্মচিন্তার রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র জন্মান্তরবাদের পটভূমিকায়। কর্মফলবাদীদের মতে মানুষের অল্পস্থিত সব কর্মই সুনির্দিষ্ট পরিণতির অপেক্ষা রাখে এবং এই পরিণতির ভাল মন্দ, তারতম্য ইত্যাদি নির্ভরশীল কৃত কর্মের গুণাগুণের উপর। মানুষ তার স্বকৃত কর্মের ফল নিজে ভোগ করতে বাধ্য। সব কাজের ফল এক জন্মে পাওয়া যায় না। যে জন্মমৃত্যুসীমানার মধ্যে একটি কাজের অল্পষ্ঠান, অনেক সময় সেই সীমানার মধ্যেই কাজটি ফলবাহী হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে সেই কাজের ফল অল্প জন্মে পাওয়া যায়। কৃত কর্মের ছাপ আত্মার মধ্যে সংস্কারের আকারে সঞ্চিত থাকে এবং জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিচালিত হয়। স্নায়ু ও বৈশেষিক দর্শনের মতে এই সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টকে হুঁতুগে ভাগ করা যায়—ধর্ম এবং

অধর্ম।^{১৪৫} এগুলির উৎপত্তি যথাক্রমে শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি থেকে। মানুষের দেহতাগ, জন্মান্তরে নূতন দেহে প্রবেশ ইত্যাদি এই অদৃষ্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। মীমাংসা দর্শন তার নিজস্ব মতে বিশেষ ক্ষেত্রে এই শক্তিকে ‘অপূর্ব’ আখ্যায় অভিহিত করেছে। বৈদিক যাগযজ্ঞে এই দর্শন বিশ্বাসী এবং পরিণামে স্বর্গই তার লক্ষ্য। মীমাংসার মতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া ‘অপূর্ব’ নামে যে শক্তির সঞ্চার করে মৃত্যুর পরেও তা যজ্ঞাদির কর্তা মানুষের আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে ফল প্রসব করে।^{১৪৬}

যোগশাস্ত্রে কর্ম ও তার ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মানুষের কৃত কর্মের যে সংস্কার দেহ থেকে দেহান্তরে যাবার সময়ও আত্মার সঙ্গী হয়, যোগের পরিভাষায় তার নাম ‘কর্মাশয়’। যোগভাস্করের ব্যাখ্যায় এই ‘কর্মাশয়কে’ ‘ধর্ম’ ও ‘অধর্ম’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।^{১৪৭} এই ‘কর্মাশয়’ বা সংস্কারের মাধ্যমেই কৃত কর্ম উপযুক্ত সময়ে ফলাবহী হয়। যোগসূত্র অনুসারে এই কর্মাশয়ের বিপাক বা ফলে পরিণতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত^{১৪৮}—জাতি, আয়ু ও ভোগ। বিশেষ পরিবেশে জন্ম বা জাতি, আয়ু অথবা জীবনের পরিধি এবং ভোগ বা সুখদুঃখময় সংসারজীবনের বিচিত্র অমুভূতি—সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত তার ‘কর্মাশয়’ অথবা পূর্বজন্ম কিংবা সেই জন্মেই অমুষ্ঠিত কর্মের সংস্কারের দ্বারা। মানুষের সঞ্চিত কর্মের সংস্কার যত দিন না ভোগের মাধ্যমে ক্ষীণ হয়, ততদিন মানুষ জন্ম থেকে জন্মান্তরের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে দুঃখময় সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই সংস্কারের সম্পূর্ণ অবসান হলেই মোক্ষ সম্ভব।

সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থায় মানুষের কোন সময়ে থাকা সম্ভব নয়। দৈহিক কর্মে লিপ্ত না হলেও মানসিক চিন্তার মাধ্যমে কাজ তাকে করে যেতেই হয়। যদি প্রত্যেক কাজ তার সংস্কার রেখে যায় এবং এই সংস্কার পরিণতি লাভ করে, তাহলে ত মানুষের পক্ষে জন্ম-জন্মান্তরের আবর্ত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই

১৪৫। ত্রায়ভাঙ্গ মতে পূর্বকৃত কর্মের শুভ এবং অশুভ ফল যথাক্রমে ধর্ম এবং অধর্ম আখ্যায় অভিহিত। (‘পূর্বশরীরে যা প্রবৃত্তিবাগ-বুদ্ধি-শরীরারম্ভলক্ষণা তং পূর্বকৃতং কর্মোক্তম্, তস্মাৎ ফলং তজ্জনির্তো ধর্মাদধর্মৌ’, ৩।২।৬৪)

১৪৬। পূর্বমীমাংসাসূত্র, ২।১।৫

১৪৭। ‘কর্মণামাশয়ো ধর্মাদধর্মৌ’, তত্ত্ববৈশারদীঃ (যোগসূত্রভাষ্য, ২।১২)

১৪৮। ‘সতি মূলে তদ্বিপাকো জাতায়ুর্ভোগাঃ’, যোগসূত্র, ২।১৩

থাকে না এবং মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতের দর্শনে তাহলে মোক্ষকে চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করারও কোন মার্থকতা থাকে না। এই সমস্তার সমাধানের প্রচেষ্টা যোগশাস্ত্রের বর্ণনার অমুসরণেই আবার আমাদের করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত ‘ক্লেশ’ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এই ক্লেশের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেই যোগমতে কৃত কর্মের ফলাফল হওয়া সম্ভব।^{১৪৯} ক্লেশ পাঁচ রকম : অবিজ্ঞা, অশ্রিতা, রাগ, ঘেঘ ও অভিনিবেশ।^{১৫০} রাগ বা আসক্তি এবং ঘেঘ বা হিংসা সকলের কাছে সুপরিচিত এবং উন্নততর জীবন লাভ করার পথে এগুলির উচ্ছেদের বিধান অনেকেরই দিয়ে থাকেন। ন্যায়দর্শনে রাগ ও ঘেঘ ‘দোষ’ সংজ্ঞায় অভিহিত।^{১৫১} রাগ ও ঘেঘের সঙ্গে অপর তিনটি ক্লেশেরও সবিস্তার বর্ণনা যোগশাস্ত্রে আছে। ক্লেশগুলির মধ্যে অবিজ্ঞাকে প্রধানতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। যোগ-ভাস্কর্যমতে অবিজ্ঞার প্রভাবে প্রভাবিত জীব বিভিন্ন ধরনের ক্লেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেইজন্য অবিজ্ঞাকে দূর করতে সমর্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই সে অল্প ক্লেশের কবল থেকেও পরিত্রাণ পায়। কাজেই যোগশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মায়-গুলির ফলাফল হবার কারণ সাধারণভাবে ‘অবিজ্ঞা’।^{১৫২}

ভারতের দার্শনিক দুঃখময় জগতের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই অবিজ্ঞার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছেন।^{১৫৩} ‘বিজ্ঞা’ বা সত্য জ্ঞানের বিপরীত মিথ্যা জ্ঞানের সংস্কারের অর্থে ‘অবিজ্ঞা’ ব্যবহৃত। আমাদের আত্মস্বরূপ নিত্য, মুক্ত ও শুদ্ধ এবং দেহ বা মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সংসারী জীব মিথ্যা জ্ঞানের প্রভাবে নিজেকে বিকারশীল বস্তুজগতের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে এবং এই জ্ঞানেরই সংস্কারবশে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে কৃত কর্মের সুখদুঃখময় ফল

১৪৯। ক্লেশমূলঃ কর্মায়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ, যোগসূত্র ২।১২

১৫০। অবিজ্ঞাশ্রিতাঃ রাগঘেঘাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ, যোগসূত্র, ২।৩

১৫১। ত্য়ায়সূত্র, ৪।২।১-২ ; ১।১।১৮

১৫২। ‘সর্ব এবামৌ ক্লেশা অবিজ্ঞাভেদাঃ, কস্মাৎ, সর্বেষু অবিন্দ্যোবাভিপ্লবতে যদবিজ্ঞা বহ্বাকার্বতে’, যোগভাষ্য ২।৪

১৫৩। ‘তদস্মা মহতো দুঃখসমুদায়স্ত প্রভববীজমবিজ্ঞা’ যোগভাষ্য, ২।১৫ ; তস্ত হেতুরবিজ্ঞা, যোগসূত্র ২।২৪

ভোগ করে চলে। ‘অবিজ্ঞা’ দূরীভূত হয় ‘বিবেকখ্যাতি’^{১৫৪} বা সত্য জ্ঞানের মাধ্যমে এবং এই জ্ঞান লাভ হলেই জীব মুক্তির পথে পদক্ষেপ করে। যোগশাস্ত্রে বর্ণিত এই ‘অবিজ্ঞা’ সাংখ্যে ‘অবিবেক’ বলে নির্দেশিত এবং সত্য জ্ঞানের সাহায্যে এই ‘অবিবেক’ দূর করার বিধান আছে।^{১৫৫} দুঃখময় সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য ভারতের অন্যান্য দর্শনেও একই উপায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রকাশভঙ্গী এবং পরিভাষা যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যেক দর্শনেরই নিজস্ব। এই সত্য জ্ঞানের উন্মেষ এক দিনে হয় না এবং এই জ্ঞান অর্জন করাও সহজ নয়। কিন্তু চরম দুঃখনিবৃত্তির জন্তু অল্প কোন পথ নেই এবং ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষতঃ যোগশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে, এই পথের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

মুক্তি বা ভোগাত্মক সংসারের অবসানের পথ ধরে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের অগ্রগতি, কিন্তু মানুষের সাংসারিক জীবনেও এর আবেদন কম নয়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ হিসাবে বিবেচিত একমাত্র সেই শ্রেণীর লোকেদের কাছে, দুঃখের পরিবর্তে জাগতিক সুখের যারা অভিলাষী নন, অর্থাৎ জাগতিক সুখের নগ্নরতা যারা উপলব্ধি করতে সমর্থ। মানুষের মুক্তি-পথের সূচনা এই ধরনের উপলব্ধি থেকে, যার পূর্ব পর্যন্ত সাংসারিক সুখ তার একমাত্র কাম্য এবং মোক্ষের কোন আবেদনই তার কাছে থাকে না। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মুক্তিপথের নির্দেশক ভারতের অধ্যাত্মদর্শন সাধারণ সংসারী মানুষের জীবনদর্শনে প্রয়োজনীয়তার কোন বার্তা বহন করে আনতে পারে না। প্রকৃত বিচারে কিন্তু দেখা যায় যে মানুষের সংসারী জীবনও এই দর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত কর্মকলবাদ অমুসারে ভাল বা মন্দ কাজ যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের জনক হিসাবে নির্দেশিত। কল সংসারী মানুষ সুখের আশায় সংসারের অহুষ্ঠানে প্রেরণা পায়। এবং অনিষ্টের আশঙ্কা করে স্বার্থেরই অমুরোধে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কাজেই মূলতঃ আধ্যাত্মিক হলেও ভারতের দর্শন সংসারী মানুষের নৈতিক জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। ‘অদৃষ্ট’, ‘দর্ম-অদর্ম’, ‘পাপ-পুণ্য’ ইত্যাদি ধারণা ভারতের জনজীবনে কর্মকলবাদের অবদান। মানুষ নিজের অদৃষ্ট যে নিজেই তৈরী কবে সেটা হয়ত সকলে ভেবে

১৫৪। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ, যোগসূত্র, ২.২৬; ইত্যোষ মোক্ষশ্রু মাগো হানস্তোপায় ইতি, যোগভাষ্য

১৫৫। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১।৫৫; ৬।১৬

দেখে না, কিন্তু অত্যাঁয় করলে তা ধর্মে সয় না এবং তাতে পাপ হয়—এ বিশ্বাস ভারতীয়দের মজ্জাগত। এই বিশ্বাসেরই ফলস্বরূপ ভারতের জনজীবনে নৈতিক এক মানদণ্ড বর্তমান।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখায় তার মূল লক্ষ্য দুঃখের একান্ত অবসানে উপনীত হবার পথের বর্ণনা নানাভাবে দেখা যায়। আর এই লক্ষ্য ও পথের বিস্তারের মধ্য দিয়েই ভারতের বিভিন্ন দর্শন পদ্ধতি শাখায় শাখায় পল্লবিত। অবশ্য ভিতরের খুঁটিনাটি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। কারণ আশ্রয় চরম অধ্যাত্মবাদ, আবার কেউ বা বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের এক।

মোক্ষ লাভ করার জন্ত প্রয়োজন আত্মার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি এবং এই আত্মস্বরূপের নির্ণয়ে সাংখ্য যোগ এবং বেদান্ত সাধারণভাবে একমত। সাংখ্য-যোগ মতে প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ্য ও ভোক্তা, এই দুই এর সংযোগে জগৎ তৈরী। এই পরিবর্তনশীল বা পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিরই বিভিন্ন বিকার এবং এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় পুরুষ বা আত্মা তার অপরিবর্তনীয় শাস্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, সেই অসম্পূর্ণতাকে দূর করার জন্তই যেন সাংখ্যে পুরুষের কল্পনা। আমাদের চিরপরিচয়ের গভীর মধ্যে আবদ্ধ বিকারধর্মী এই জগতের কোন ছাপ পুরুষ বা আত্মার মধ্যে নেই। আত্মার এই রূপ সম্বন্ধে সাংখ্য এবং বেদান্তের মতের সাদৃশ্যের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ত্রায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য দার্শনিক গোষ্ঠীর ধারণা কিছুটা ভিন্ন হলেও এ বিষয়ে সকলেই অভিন্নমত যে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের লক্ষ্যকে একান্তভাবে অসম্পূর্ণ বস্তুজগতের বিপরীতমুখী করা উচিত। বুদ্ধের অজুগামীরা নির্বাণ বা শূন্যতার মধ্যে ভোগের অবসান খোজেন। হিন্দু আত্মস্বরূপ তাঁদের ধারণার গভীর বাইরে। মীমাংসা দর্শন প্রধানতঃ বেদান্তগ হওয়ার ফলে ভারতের অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে মীমাংসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্য আছে। কাজেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এঁদের লক্ষ্য হলেও বৈরাগ্যাত্মক মুক্তির পরিষ্কার চেহারা এঁরা রূপায়িত করতে পারেন নি।

মতভেদ যাই থাক, বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে যে আমাদের লক্ষ্যের পরিসমাপ্তি—সেটা ভারতের অধ্যাত্মবাদীরা সকলেই স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—আমাদের ইচ্ছা বা বুদ্ধির ধারণায় মীমা-

বহির্ভূত এই লক্ষ্যকে ভারতীয় দর্শনের গণ্ডীর মধ্যে আনা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এ প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রমাণের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

‘প্রমাণ’ সংজ্ঞায় জ্ঞানের মাধ্যমকে বোঝায়। মানুষের জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যে যে যে বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, দার্শনিক বিচারের পরিসরে আসার যোগ্যতা একমাত্র সেগুলিরই। যে প্রবেশপথকে আশ্রয় করে মানুষের অন্তর্লোকে জ্ঞানের ভাঙারে বিষয়গুলির ক্রমিক সঞ্চয়, ‘প্রমাণ’ এই বিশেষ শব্দের দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রমাণের বিচার বিষয়ে ভারতের দার্শনিকেরা বিশেষ তৎপর, কারণ তাঁরা মনে করেন যে জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রস্তুতি রচিত হয় জ্ঞানের প্রবেশপথ বা প্রমাণের গুণাগুণ বিচারের মাধ্যমে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় প্রমাণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আবার প্রতিটি শ্রেণীকে বিশিষ্ট লক্ষণের সূনিদিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের দর্শন-গুলির মধ্যে প্রমাণের বিচার সর্বাধিক প্রাধান্যের দাবী রাখে ত্রায়দর্শনে। এ কারণেই ‘প্রমাণশাস্ত্র’ হিসাবে ভারতের দর্শন জগতে ত্রায়ের পরিচিতি।^{১৫৬}

প্রমাণ বা জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে আমরা সাধারণভাবে উল্লেখ করতে পারি দুটি নাম, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। চার্বাক এবং চার্বাকেতর, পরস্পরবিরোধী এই দুটি ভারতীয় দর্শনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে এই প্রমাণ দুটি, বিশেষ করে প্রথমটির সাহায্যে। কারণ দ্বিতীয়টির আংশিক অনুমোদন লক্ষণীয় কেবলমাত্র চার্বাকের বিশেষ এক শাখাগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রথমটির বিরোধিতা চার্বাকের একাংশে দেখা গেলেও চার্বাক নামের সঙ্গে এই প্রমাণের স্বীকৃতির এক অচ্ছেদ্য যোগ সকলের কাছে সুপরিষ্কৃত।

চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সরাসরি যোগের ফলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। মনকে ইন্দ্রিয় হিসাবে গণ্য করে^{১৫৭} মনের বিভিন্ন অনুভূতিকে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত করতে পারি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই ভিত্তিতে উপযুক্ত মানসিক বিচারের সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য আরও প্রসারিত হতে পারে

১৫৬। IP, ii, p. 45

১৫৭। ‘এতৈর্দর্শভিঃ সহাস্তরং মন একাদশকমেবাদশেজ্জিয়মিত্যর্থঃ’, সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, ২।১২; ত্রায়মতে মন ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্ত করণ, ত্রায়ভাষ্য, ১।১।১৬

এবং এক্ষেত্রে অহুমানের ভূমিকা স্বীকার্য। যুক্তি বা তর্ক এই অহুমানের আশ্রয়। আমাদের জ্ঞানের রাজ্যের অধিকাংশ উপাদানেরই সরবরাহের ব্যাপারে ‘প্রত্যক্ষ’ এবং ‘অহুমান’ এই প্রমাণ দুটির উপযোগিতার বিষয়ে সাধারণভাবে সকলের মতৈক্য দেখা যায়।

‘শব্দ’ নামে অতিরিক্ত আর একটি প্রমাণ ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছে। ‘শব্দ’ বৈদিক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হলেও ‘শব্দ’ এই সংজ্ঞার দ্বারা আপ্তবাক্যকে অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য পুরুষের মুখ নিঃসৃত শব্দকে সাধারণভাবে প্রামাণ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য মনে করেন যে^{১৫৮} যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে কোন প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান লাভ করা সম্ভব নয়। যুক্তি বা তর্কের মূল মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ভিতর। ব্যক্তিনিষ্ঠ এই প্রমাণ বিভিন্নমুখী হতে বাধ্য এবং এই বিভিন্নমুখী ভাবনাকে কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ধরা যায় না। সেই কারণেই এর সাহায্যে চিরন্তন বা শাস্তত কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবিশেষ অতিমানস প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন, পরম্পরালব্ধ সেই জ্ঞান আপ্তবাক্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ এই সংজ্ঞাগুলি একই মাধ্যমের পরিচিতি বহন করে। জ্ঞানের এই মাধ্যম বা প্রমাণের প্রবেশপথ দিয়ে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে যে বিশেষ সম্পদের সঞ্চয় হয়, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির দ্বারপথে তা কোনক্রমে সম্ভব নয়।

‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ সাধারণভাবে বেদের অর্থেই প্রযোজ্য। সুতরাং এই দৃষ্টি-কোণের বিচারে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে এই প্রমাণের অন্তর্ভুক্তি না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ বেদবিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই নাস্তিক হিসাবে প্রধানতঃ এদের পরিচিতি। কিন্তু বিশেষভাবে বৈদিক বচনের অহুগামী না হয়েও মহা-মানব বুদ্ধদেবের বা জৈন তীর্থঙ্করদের বচনের অহুসরণ করে বৌদ্ধ এবং জৈনরা আপ্তবচনকে অন্তর্ভাবে তাঁদের প্রমাণের অন্তর্গত করেছেন। জৈনমতে প্রমাণ দু’রকম—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ;^{১৫৯} অহুমান এবং ‘শ্রুত’ শেষোক্ত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার্য। আনুশংগিক দর্শনের ‘শ্রুতি’ বা বেদের মত ‘শ্রুত’ বা অজ্ঞাদি শাস্ত্রকে জৈনরা বিশেষ প্রমাণের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধের বাণী এভাবে ‘শ্রুত’ নামে পরিচিত নয় বটে, কিন্তু কাঁধক্ষেত্রে এই বাণীই বৌদ্ধদের কাছে

১৫৮। ‘পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনান্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ’, শান্তা, ২।১।১২

১৫৯। IP, i, p. 296

৫ম প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাজেই আপ্তবাক্য অধ্যাত্মবাদীর কাছে জ্ঞানের একটি প্রধান মাধ্যম।

নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈনদেব বাদ দিয়ে আস্তিকতার পংক্তিতে যাদের স্থায়ী আসন সাধারণভাবে স্বীকৃত কেবল তাদের বেছে নিলেও ‘শব্দ’ বা বেদকে প্রমাণ হিসাবে প্রাধিকার দানের ব্যাপারে আমরা প্রচুর তারতম্যের সন্ধান পাই। বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা দাবী করতে পারে বোধ হয় মীমাংসাদর্শন। মীমাংসা মনে করে যে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে বেদের প্রামাণ্যই একমাত্র বিচার্য। মীমাংসা দর্শনে অবশ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অপর কয়েকটি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই শাস্ত্র মতে প্রধানতঃ নেতিবাচক—লক্ষ্যাসিদ্ধির ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তার অভাব প্রদর্শন। ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রমাণগুলির উপযোগিতা দেখান হয়েছে; কিন্তু সেটা নেহাতই গোণ, মুখ্য ভূমিকা এ বিষয়ে শব্দ প্রমাণের বা বেদের এবং এই বেদকে আশ্রয় করেই মীমাংসকেরা তাঁদের চিন্তার প্রসারে উঠোয়।^{১৬০}

‘শব্দ’ বা বেদের প্রাধিকার ত্রায় এবং বৈশেষিক দর্শনেও অনুমোদিত। কিন্তু প্রমাণের আসরে বৈদিক বচনের একক ভূমিকা মীমাংসার মত এই দর্শনদ্বয়ের সমর্থন লাভ করেনি। বৈশেষিক দর্শনে শব্দের প্রামাণ্য স্বতন্ত্র রূপে গ্রাহ্য নয়। এটি অনুমানেরই এক অঙ্গ হিসাবে স্বীকার্য। বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর সাংখ্য এবং যোগের বিরাগ নানাতাবেই লক্ষণীয়।^{১৬১} স্থানবিশেষে বেদের মহিমা-কীর্তনের মাধ্যমে^{১৬২} আস্তিক দর্শনগুলির সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগসূত্র রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেও এই দর্শন দুটি প্রধানতঃ যুক্তিবাদী এবং ‘শব্দ’ বা বেদের তুলনায় প্রত্যক্ষ বা অনুমানই^{১৬৩} এখানে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। ‘শ্রুতি’র প্রতি

১৬০। IP, ii, p. 388

১৬১। দৃষ্টবদাত্মশ্রবিকঃ স হবিশুদ্ধিক্স্যাতিশয়যুক্তঃ, সাংখ্যকারিকা, ২; সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১৬; পদ্ম উপপুরাণ থেকে কিছু শ্লোক বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকাতে উদ্ধৃত হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সাংখ্য, যোগ, ত্রায় এবং বৈশেষিক দর্শনের কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরোধী, যদিও আলোচ্য দর্শনগুলিকে আস্তিকতার ছাপ দেবার জন্য এই শ্রুতিবিরোধী অংশগুলিকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৬২। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।৫১ -

১৬৩। ‘অন্ত শাস্ত্রানুমান প্রাধিক্যং...’ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১৬০

সাংখ্য ও যোগের আত্মগত্যা উপনিষদীয় বচনের মারফৎ ; বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে নয়। ‘ঋতি’ বা বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। বৈদিক প্রভাবপুষ্ট মীমাংসাদর্শনের অমুগামী কুমারিল ভট্টের কাছে সাংখ্য এবং যোগ বেদবিরোধিতার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের সমপর্যায়-ভুক্ত। ১৬৪

যাই হোক, ‘শব্দ’, ‘ঋত’ বা ‘আপ্তবাক্য’ যে নামেই অভিহিত হোক না কেন—প্রত্যক্ষ এবং অমুমানের অতিরিক্ত এই বিশেষ প্রমাণটি ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের সীমাবহির্ভূত এক বিশেষ জগতের পরিচয় এনে দিতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় এই আপ্তবাক্যের অন্তর্ভুক্তি থেকে যুক্তিতর্কবিহীন অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি ভাংতের অধ্যাত্মদর্শনের সমর্থনের ইঙ্গিত আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক নয়। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন হয়ত এইভাবে প্রতিপক্ষের সমালোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু ভারতের দার্শনিকেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যেভাবে উপনীত হয়েছেন সেগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে এ ধরনের সমালোচনার প্রতিকূলে আমরা সাক্ষ্য পাব। যুক্তির প্রতি কোন কোন দর্শনের অমুরক্তি আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। আপ্তবচনমাত্রই ভারতীয় দর্শনে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বিভিন্ন আপ্তবচনের মধ্যে কোনগুলি গ্রাহ্য তা বিচার করার ক্ষেত্রে যুক্তি বহুলাংশে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। সাংখ্য-চার্য অনিরুদ্ধ তাঁর সাংখ্যসূত্রবৃত্তিতে বেদ সংক্রান্ত যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করেছেন। ১৬৫

যুক্তি বা অমুমানের সমর্থন ছাড়াও আপ্তবচনের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাক্ষ্য ভারতীয় দর্শনে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। ভাংতের দর্শন প্রধানতঃ ব্যবহারিক দর্শন। ব্যবহারিকতার মাপকাঠির বিচারে ছাড়পত্র যাবা পেয়েছে, একমাত্র সেই মতগুলিরই গ্রহণযোগ্যতা ভারতদর্শনে সুনির্দিষ্ট। আপ্তবাক্য লব্ধ জ্ঞানকে ভারতের দার্শনিক অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকেননি। সাক্ষ্য উপলব্ধির ভিত্তিতে তার উপযুক্ত মান নির্ধারণ

করে তবেই তাকে জ্ঞান সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছেন। ১৬৬ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে এ জ্ঞান প্রকৃতই উপলব্ধিগম্য দৃঢ় প্রত্যয়ে তা ব্যক্ত করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেননি। এই জ্ঞানলাভের পথেরও সঠিক নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ, অহুমান এবং আপ্তবাক্য—এই তিনটির অতিরিক্ত উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদিকে প্রমাণের পর্দায় অনেকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। ১৬৭ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কিন্তু এগুলির মধ্যে অহুমানকে খুঁজে নিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং আমাদের আলোচিত তিনটি প্রমাণই সাধারণভাবে ভারতের দার্শনিকমহলে প্রামাণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩ ॥ ঈশ্বরবাদ ॥

পরিশেষে ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যিক। কারণ আস্তিকতার সঙ্গে শেখরবাদকে অঙ্গাদ্বীভাবে অনেকেই যুক্ত করে দেখেন এবং নাস্তিকদের একাত্ম করেন নিরীশ্বরবাদীদের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে শেখরবাদ ভারতীয় দর্শনে আস্তিকতার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে কোনদিনই গণ্য হয়নি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সনাতনপন্থীদের বিচারে বেদের প্রতি আত্মগতা আস্তিকতা বিচারের প্রধান মান হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক দর্শনের ‘নাস্তিক’ সংজ্ঞা এই মানদণ্ডেরই অহুসরণে। ঈশ্বরের প্রতি ঐদাসীন্ত বা ঈশ্বরবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে নয়। সেইজন্য ভারতের বহু দর্শন আস্তিক হলেও শেখর হতে বাধ্য হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি ঐদাসীন্ত ভারতীয় দর্শনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে কর্মফলবাদের মাধ্যমে ভারতের অধ্যাত্মদর্শন জাগতিক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী। কর্মবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে সব ক্ষেত্রে যুক্ত

১৬৬। ‘...পুরুষশ্চ বদ্ধাদিকং শ্রবণমনমাত্রেন ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনা’, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১।৫২

১৬৭। নৈয়ায়িকেরা উপমানকে এই তিন প্রমাণের অতিরিক্ত অপর একটি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন, শ্রায়সূত্র, ১।১।৩; উপমানের সঙ্গে অর্থাপত্তিকে যুক্ত করে মীমাংসাকাচার্য প্রভাকর প্রমাণের সংখ্যা পাঁচ বলে মন্তব্য করেন। কুমারিলের মতে অল্পপল্লি আরও একটি প্রমাণ।

করা হয়নি।^{১৬৮} বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বেদান্ত হওয়ার ফলে মীমাংসা দর্শন বৈদিক দেবদেবীসমূহকে তার বিষয়বস্তুর পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করেছে বটে কিন্তু ঈশ্বরকে এখানেও প্রবেশাধিকার দেয়নি। জৈমিনির মীমাংসা-সূত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। মীমাংসক আচার্য প্রভাকর এবং কুমারিল ভট্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে প্রদত্ত বিভিন্ন যুক্তির বিরোধিতা করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসার্বকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী মীমাংসকেরা অবশ্য মানবমনের অন্তর্নিহিত ভগবৎ বিশ্বাসের কাছে নতি স্বীকার করেছেন এবং দার্শনিক যুক্তির বন্ধনে মীমাংসা দর্শনকে সেশ্বরবাদের সঙ্গে যুক্ত করার এক বিশেষ প্রয়াস এঁদের মধ্যে সুপরিচুত। এই প্রয়াসের পূর্ণ রূপায়ণের পরিচয় বহন করে বেদান্ত দেশিকের ‘সেশ্বর মীমাংসা’ নামক পুস্তকটি।^{১৬৯}

সাধারণভাবে সেশ্বরবাদ হিসাবে গণ্য হলেও ত্রায় এবং বৈশেষিক দর্শন প্রাথমিক পর্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি একই ধরনের ঔদাসীত্যের পরিচয় দিয়েছে। ত্রায়সূত্রের স্থানবিশেষে ঈশ্বরের এক সাধারণ উল্লেখ থেকে ঈশ্বরবাদের পক্ষে সূত্রকার গোতমের কি জাতীয় সমর্থন ছিল তা বলা কঠিন।^{১৭০} সূত্রাং স্বাভাবিকভাবেই কয়েকজন ব্যাখ্যাকার এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিশেষ মতবাদের সমালোচনা আবিষ্কার করেছেন।^{১৭১} সূত্রকারের এই দ্রুতি অবশ্য ত্রায়ভাষ্যে সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে।^{১৭২} পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা স্পষ্টভাবেই সেশ্বর সংজ্ঞার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছেন।^{১৭৩} বৈশেষিক সূত্রের মধ্যেও ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তী আচার্যদের প্রচেষ্টায় অবশ্য এই শাস্ত্র সেশ্বরবাদের তালিকায় নিজের নামকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^{১৭৪}

১৬৮। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।২ মতে কর্মফলবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণার কোন সঙ্গতি নেই। মীমাংসাকাচার্য কুমারিল ভট্টও কর্ম এবং ঈশ্বরেচ্ছা, উভয়কে জগৎসৃষ্টির মূলে একত্র যুক্ত করতে অনিচ্ছুক, শ্লোকবার্তিক, মধ্বাঙ্কশপরিহার

১৬৯। IP, ii, pp. 424-428

১৭০। ‘ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাকল্যাদর্শনাৎ’, ত্রায়সূত্র, ৪।১।১৯

১৭১। বাচস্পতি, উদয়ন এবং বর্ধমানের মতে সূত্রটিতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সূত্রকারের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত হয়নি, বেদান্ত মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে সূত্রটি এখানে উপস্থাপিত।

১৭২। ‘গুণবিশিষ্টমাত্তান্তরমীশ্বরঃ’, ত্রায়ভাষ্য, ৪।১।২১

১৭৩। ত্রায়কুসুমাজলি, ১।৯-১০ ; ত্রায়বার্তিক, ৪।১।২১

১৭৪। IP, ii, pp. 205-8

আন্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদীদের সভার পুরোভাগে আপন স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যুক্তিবাদের সমর্থক এই দর্শনের আচার্যরা ঈশ্বরীয় শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার বা ঈশ্বরকে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে আদি স্থান দেবার পক্ষে যুক্তির কোন সমর্থন খুঁজে পাননি। সাংখ্য দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিতর্ক ঈশ্বরের প্রসঙ্গে দর্শনটির এই ধরনের মনোভাবেরই সাক্ষ্য দেয়। ১৭৫

যোগদর্শনের পরিচিতি সাধারণের কাছে সেশ্বর সাংখ্য হিসাবে, কারণ বিভিন্ন তত্ত্বের স্বীকৃতিতে উভয় দর্শনের সাম্য থাকলেও ঈশ্বরের স্বীকৃতি প্রসঙ্গ একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ‘পুরুষবিশেষ’ রূপে ঈশ্বরের কল্পনা সাংখ্য বা যোগের দার্শনিক কাঠামোতে নেহাতই খাপছাড়া। কারণ, সাংখ্য-যোগমতে আদি তত্ত্বের অগ্রতম পুরুষ সংখ্যায় বহু হয়েও গুণগত পার্থক্যের কোন অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে অধিকার প্রবেশকারী ঈশ্বরকে স্বমর্ষদায় প্রতিষ্ঠিত করার জ্ঞান ব্যাখ্যাকারেরা নানা ভাবে সচেষ্ট হলেও ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্তি যোগদর্শনের তাত্ত্বিক বিস্তারের সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রাখতে কোনক্রমে সক্ষম হয়নি। ১৭৬

সাংখ্য ও যোগদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের

১৭৫। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১।১২-৪ ; ৫।২।১২ ; সাংখ্যকারিকা, ৫৭ (তত্ত্ব কোমুদী ও যুক্তিদীপিকা ব্যাখ্যা সহ)

১৭৬। ব্যাসভাষ্য ও তত্ত্ববৈশারদীসহ যোগসূত্র, ১।২৪ ; Hiriyanna-র মতে, ‘the very sutras in which it (god) is postulated in Patanjali’s work stand disconnected with the rest of the work . The only argument adduced by Patanjali in support of his theistic position is the existence in our experience of a graded scale of knowledge, wisdom etc., which, he supposes, points to infinite knowledge, wisdom etc., as their limit. He to whom the later belong is God. But it may be asked how these super-excellences can belong to God if he also, being a purusa, is pure spirit and stands aloof from prakriti ?’ (Outlines of Indian Philosophy, pp. 282-3), শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যোগদর্শনের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণায় অসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন (শাভা, ২।২।৩৭)

আরও গভীরে গিয়ে এর মূল অমূল্যকান করতে হবে। তৎসংগত বিচারে উভয় দর্শনের ঐক্য সত্ত্বেও সাংখ্যের উপযোগিতা যেখানে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, যোগ-দর্শনের উপযোগিতা সেখানে প্রধানতঃ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক উপযোগিতার আবশ্যিকতার বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। ভারতের অগ্রাগ্র দর্শন একই সংজ্ঞার মাধ্যমে দর্শনের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এই উভয় দিককে পরিষ্কৃত করতে সচেষ্ট। সাংখ্য-যোগের মধ্যে এই প্রয়াস দুটি সুনির্দিষ্ট দর্শন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে। যে তাত্ত্বিক মতবাদ সাংখ্যদর্শনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় রূপায়িত, সেই মতবাদেরই পটভূমিকায় মোক্ষপথের ষাটীকে তার অভীষ্ট পথের সন্ধান দিয়েছে যোগদর্শন সুসংহত উপায়ের নির্দেশনায়। প্রকৃষ্ট জ্ঞান হিসাবে সাংখ্যের এবং শ্রেষ্ঠ বল হিসাবে যোগের যে প্রশংসা মহাভারতে দেখা যায় উভয় শাস্ত্রের পারস্পরিক ভেদেই ইঙ্গিত তা বহন করে।^{১৭৭}

যোগদর্শনে ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্তি এই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তারই ভিত্তিতে। মোক্ষ বা আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রধানতম উপায় হিসাবে যোগ চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপর প্রাধান্য অর্পণ করেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তিগুলিকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন; জাগতিক স্থূল বিষয়ে অমুরক্ত চিত্তকে সূক্ষ্ম-ভিমুখী করে এবং সূক্ষ্ম থেকে ক্রমে সূক্ষ্মতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে পরিণামে চিত্তকে আত্মতত্ত্বে বিলীন করার মাধ্যমেই জীবের পরমার্থপ্রাপ্তি সম্ভব বলে যোগদর্শনের অভিমত। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঙ্গযুক্ত যে ক্রিয়াপদ্ধতির বিধান যোগে আছে ‘সমাধি’ তার অন্তিম এবং প্রধানতম পর্যায়।^{১৭৮} সমাধির সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে অবাধিত পূর্ববর্তী অপর দুটি যোগাঙ্গ ‘ধ্যান’ এবং ‘ধারণা’ যথার্থ অমূল্যবোধের উপব। ‘ধ্যান’ চিত্তের একাগ্রতা^{১৭৯} এবং ‘ধারণা’ একাগ্র চিত্তের বিশেষ এক বিষয়ে অভিনিবেশের অর্থে ব্যবহৃত। এই ধ্যান এবং ধারণা-যুক্ত চিত্ত পরিণামে সমাধিলাভে সমর্থ হয়; এ অবস্থায় একাগ্র চিত্তের বিশেষ ধারণা অপর সব কিছুকে আত্মসাৎ করে এককভাবে বিরাজ করে।

১৭৭। মহাভারত, ১২।৩০০-৩০১

১৭৮। ‘যোগঃ সমাধিঃ - তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগ পক্ষে বর্ততে। যত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থঃ প্রত্যোতয়তি - স সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ’, যোগসুত্রভাষ্য, ১।১; তদেবমর্থ যাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ, ঐ, ৩।৩

১৭৯। তত্র প্রত্যায়ৈকতানতা ধ্যানম্, ঐ, ৩।২

ধারণার বিষয় হিসাবে ঈশ্বরের বিশেষ কোন রূপের উপযোগিতা অনস্বীকার্য এবং যোগসূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধিপাণ্ডুর এক প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।^{১৮০} প্রকৃষ্ট হলেও ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিপাণ্ডুর যাত্রীদের অবশ্য অমূল্যবোধ হিসাবে নির্দেশিত হয়নি। কারণ যোগের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে ঈশ্বরের আবশ্যিক কোন যোগ নেই। একাগ্র চিত্তের চরম পরিণতি সমাধির লক্ষ্যের সহায়ক হিসাবে ঐশ্বরিক রূপের ভাবনার উপযোগিতা যোগসূত্রের অন্তর্ভুক্ত বর্ণিত হয়েছে।^{১৮১} এবং এই উপযোগিতারই স্বীকরণের প্রকাশ সমাধির প্রস্তুতি হিসাবে উপস্থাপিত বিভিন্ন যোগাঙ্গের অগ্রতম নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানের অন্তর্ভুক্তিতে।^{১৮২} অগ্রতম বিভিন্ন নিয়মের অভ্যাসের মত ঈশ্বরপ্রণিধানের অভ্যাসও যে যোগীকে তার লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে যোগদর্শনের আচার্যরা তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের এই ব্যবহারিক উপযোগিতার পরিপূর্ণ সম্বন্ধেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।

বস্তুতঃপক্ষে তাত্ত্বিক বিচারের দ্বারপথে দার্শনিক মতবাদের রাজ্যে ঈশ্বরের প্রবেশ কষ্টসাধ্য। তৎসত্ত্বেও মাহাত্ম্যের সহজ ধর্মবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তারই ভিত্তিতে ভারতের দর্শন বহুক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছে। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা কোনদিন সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে নিরীশ্বরবাদী হলেও ব্যাখ্যাকারদের ধর্মীয় মতবাদের প্রভাবে পরিণামে সেধ্বনবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ভাষা এবং টীকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভাষাকারদের মধ্যে অনেকেই শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত।^{১৮৩} ফলে উভয় দর্শনেই ঈশ্বর ক্রমশঃ তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

১৮০। সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাং, যোগসূত্র ভাষ্য, ২।৪৫

১৮১। ঈশ্বরপ্রণিধানাং, ঐ, ১।২৩

১৮২। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ, ঐ, ২।১

১৮৩। ‘নৈয়ায়িকঃ সদা শিবভক্তঃ শৈব ইত্যাচ্যন্তে, বৈশেষিকাস্তে পাণ্ডপতা ইতি...তেন নৈয়ায়িকশাসনং শৈবামাখ্যায়তে’ বড়দর্শনসমুচ্চয়, ১৩-এর গুণরত্নরূপ ব্যাখ্যা। শ্রায়বার্তিক গম্বের উপসংহারে উদ্ধৃতকর বলেন, ‘...ইতি পরমর্ষি ভরদ্বাজ পাণ্ডপতাচার্য শ্রীমদ্রদ্যোতকরাচার্য রূর্তো শ্রায়বার্তিকে...’

নিরীশ্বরবাদী হিসাবে স্থপরিচিত সাংখ্যদর্শনও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণে সেখরবাদে রূপান্তর লাভ করেছে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে অভিযুক্ত সাংখ্যমতে অবশ্য এই দর্শনের যুক্তিবাদী রূপ সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে এই মতের বর্ণনা করা যায়। Farquhar এর মতে ১৮৪ “The Samkhya and the Yoga systems (in the Mahabharata) are represented as being essentially the same as the philosophy of Brahman, and all three are taught as philosophic foundations of the Vaisnava religion .” পরবর্তী যুগের ভাষ্যকার সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্সু এই ধর্মবিশ্বাসেরই প্রভাবে সাংখ্যদর্শনকে সেখরবাদ হিসাবে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সাংখ্যের নিজস্ব দার্শনিক কাঠামো যে ঈশ্বরকে স্বীকার করার পথে প্রধান বাধা প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ বিজ্ঞানভিক্সুর রচনায় দৃষ্ট হয়। ১৮৫

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে ভারতের দর্শন কেবলমাত্র থিওরী বা মতবাদের সমষ্টি নয়। ব্যবহারিক উপযোগিতাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় দর্শনের দার্থকতা। ১৮৬ এই উপযোগিতার ক্ষেত্রে সেখরবাদের অবদানের প্রসঙ্গও আমাদের পূর্ববর্তী যোগদর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনার অঙ্গ হয়েছে। যে ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারপথে এই ঈশ্বর ভারত দর্শনে প্রবেশ লাভ করেছেন সেই বিশ্বাস যুক্তি বা অনুমানের সঙ্গে সমান ভাবেই ভারতের দার্শনিক জগতে প্রমাণ হিসাবে গণ্য এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ঋষি এবং সত্যজ্ঞীদের উক্তিতে বিশ্বাসের রূপ নিয়ে ‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ এই প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যুক্তির মাধ্যমে যার বিচার হয় না সেই ধর্মচেতনা ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১৮৪। Farquhar, An Outline of the Religious Literature of India, p. 96.

১৮৫। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ভূমিকা, ‘ঈশ্বরব্যবস্থাপনশ্চ স্বশাস্ত্রেহনুপযোগাৎ’, বিজ্ঞানামৃতভাষ্য, পৃঃ ১২৯

১৮৬। নলিনীকান্ত ব্রহ্মের মতে ‘theory and practice have always been sought to be interwoven, and they were never divorced from each other so long as India maintained her glory’, The Philosophy of Hindu Sadhana, p. 5

বেদান্তদর্শনে এই ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব অপরিণীম এবং সেইজন্য সেখরবাদের সঙ্গে বেদান্তের একাত্মতা খুব সহজ পদ্ধতিতেই দেখা যায়। বেদান্ত দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের উক্তি এ ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি—
 ‘Vedanta is primarily a religion. The self is to be known—accepted in the first instance in faith, which, as confirmed, clarified and formulated by reason, would be inwardized into a vision. This work of reason is philosophy.....’^{১৮৭} ঈশ্বরের সঙ্গে বেদান্তের সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্কের মূল অনুসন্ধান করতে হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে দর্শনটির এই অঙ্গাঙ্গী যোগের মধ্যে।

নিরীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনও ব্যবহারিক পর্দায় সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে একাত্ম করে ভারতের অল্প আন্তিক দর্শনগুলির মতই সেখরবাদের রূপ নিয়ে ধর্মমতে পরিণতি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্করেরা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও পরবর্তী অনুগামীরা ক্রমে নিজ নিজ ধর্মমार्গের প্রবর্তকদের মধ্যেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করতে থাকেন। আর এইভাবে তাঁরা সাধারণ ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিধানের প্রয়াসী হন। বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদ দর্শনের পর্যায় থেকে পরিপূর্ণ ধর্মমতে রূপান্তর লাভ করে এবং বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীদের আপন গণ্ডিতে ক্রমশঃ আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করে।^{১৮৮}

চার্বাকের ভারতীয় দর্শনগুলিকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা। এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তার বিষয় আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, ঈশ্বর, ঋতি এবং অনুমান প্রমাণ ইত্যাদি যে সব বিষয় চার্বাকের ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন ধারণার উৎস, সেগুলিরই প্রতিরোধের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে চার্বাকীয় দর্শনের বিশাল সৌধ। প্রতিরোধাত্মক চার্বাকী মতের বিস্তার আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

৪। চার্বাক সিদ্ধান্ত—মালোচনা ও সমালোচনা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ—তত্ত্বোপপ্লবসিংহ

চার্বাক সিদ্ধান্তের রূপরেখা অঙ্কন আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। এই প্রচেষ্টার সূচনা আমরা প্রমাণ সম্বন্ধীয় চার্বাকীয়-ধারণার ভিত্তিতে করতে চাই।

১৮৭। Studies in Philosophy, i, pp. 118-9

১৮৮। IP, i, p. 331

চার্বাক দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষতঃ দর্শনের সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে চার্বাক নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদিতা অঙ্গাদ্বীভাবে বিজড়িত।^{১৮৯} “শ্রায়মঞ্জরী”তে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসাবে চার্বাকের বর্ণনা আছে।^{১৯০} প্রমাণ সমূহের অগ্রতম হিসাবে ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষের স্বীকৃতির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। লৌকিক মতে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ জ্ঞানের দ্যোতক। কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় এর অর্থ পৃথক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পর্যায়ে সাধারণতঃ পাঁচটি ইন্দ্রিয় অহত্বুক্ত। এগুলির কোনও একটির সাহায্যেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে। চক্ষু এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অগ্রতম হলেও কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই চারটি ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাও প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোন অংশে কম নয়। এই ইন্দ্রিয় পাঁচটির প্রত্যেকটি নিজ নিজ বিভাগে জ্ঞান আহরণের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কোন বস্তু যখন বিশেষ কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন ইন্দ্রিয়টির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের জ্ঞান আমরা লাভ করি। একটি ফুলের উদাহরণ নিলে আমরা দেখব যে ফুল সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে চক্ষু নাসিকা এবং ত্বকেরই কেবল কার্যকারিতা দেখা যায়, অগ্র ইন্দ্রিয়ের নয়। চোখ দিয়ে আমরা ফুলটিকে দেখি; নাকের সাহায্যে গন্ধ উপভোগ করি এবং ত্বক দিয়ে ফুলটিকে স্পর্শ করি। আবার ভালো গান শোনা বা সুখাশ্ব ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে কর্ণ এবং জিহ্বার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে কাজ করে, অগ্র ইন্দ্রিয়ের নয়। মনের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের মাধ্যম হিসাবে, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এক ইন্দ্রিয় রূপে। জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে মন আন্তর প্রত্যক্ষের কারণ হয়, অগ্র ইন্দ্রিয়গুলির বা বাহ্য বস্তুনিচয়ের যেখানে কোন কার্যকারিতা নেই।

প্রমাণগুলির মধ্যে একমাএ প্রত্যক্ষের সঙ্গেই যারা চার্বাকের যোগ স্বীকার করেন তাঁদের মতে চার্বাকের জ্ঞানের রাজ্যে সঞ্চয় এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারপথেই কেবল হওয়া সম্ভব। “ষড়্দর্শনসমুচ্চয়” গ্রন্থে লোকায়ত প্রসঙ্গে উক্তি

১৮৯। ‘লোকায়তমেব শাস্ত্রং যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্’ প্রচ, পৃঃ ৬৪ ;

‘প্রত্যক্ষৈক...’ সমং, পৃঃ ৩ ; ‘মানং ত্বক্ষজমেব হি’, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়,

৮২ ; ‘প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিনো’, সর্বমতসংগ্রহ, পৃঃ ১৫

১৯০। ‘প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্বাকাঃ’, শ্রাম, ১, পৃঃ ২৬

দেখা যায়—‘এতাবানেব লোকোহয়ং যাবানিস্দিয়গোচরঃ’,^{১১১} অর্থাৎ, লোক বা জগতের আয়তন ইন্দিয়গোচরতার মাপকাঠির সাহায্যে চিহ্নিত। ইন্দিয়গোচরতার মাধ্যমে যতটুকু জানা সম্ভব চাৰ্বাকের জগৎ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। “তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা”-তেও অল্পরূপ একটি লোকায়ত বচনের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় ‘এতাবানেব পুরুষো যাবানিস্দিয়গোচরঃ’।^{১১২}

চাৰ্বাক দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ মনোভাব এই ধারণারই অনুগামী। আর বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে চাৰ্বাকের পরিচিতি সেই ধারণারই অনুসরণে। ইন্দিয়গোচরতার দ্বারা মাত্ৰ মানবের জ্ঞানের ভাঙারে সক্ষিতও হয় একমাত্র বস্তুজগতের মাল-মসলা। প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম করার জন্য এই উপাদানের অতিরিক্ত অণু কিছু চাৰ্বাকের জ্ঞানের রাজ্যে তার সঞ্চয় রাখতে পারে না, ফলে স্থূল বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়ে গঠে চাৰ্বাকের সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত।

সাধারণতঃ এই রূপে চাৰ্বাকের পরিচিতি হলেও অগ্রাণু যত্নে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চাৰ্বাকের সামগ্রিক রূপের প্রতিফলন এখানে হয়নি এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসাবেও চাৰ্বাককে সব ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায় না। চাৰ্বাকগোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক মতবাদের প্রচলনের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি এবং চাৰ্বাক সিদ্ধান্তের সামগ্রিক রূপের বিচারের জন্য এগুলির আলোচনা এখানে প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে চাৰ্বাক সম্বন্ধে “তায়মঞ্জরী” গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্টের মন্তব্য উল্লেখ্য। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসাবে চাৰ্বাক গোষ্ঠীকে সাধারণভাবে বিশেষিত করেও “তায়মঞ্জরীরই” অগ্রাণু গ্রন্থকার ভিন্ন ধরনের অপর এক মতবাদকে চাৰ্বাক নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই মতবাদের সমর্থক চাৰ্বাকেরা তাঁর ভাষায় ‘ধূর্ত’ সংজ্ঞায় চিহ্নিত। এই শ্রেণীর চাৰ্বাকদের মতে প্রমাণ এবং প্রমোয়ের সংখ্যা এবং লক্ষণের নিয়ম করা সম্ভব নয়। সংখ্যা এবং লক্ষণ স্বতন্ত্রীয় নিয়মের অনৈক্যই এঁদের পরিভাষায় ‘তত্ত্ব’ আখ্যা পেয়েছে এবং এই অর্থানুসারী তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে এঁরা এমন অনেক প্রমিতির উদাহরণ দিয়েছেন যাদের উদ্ভব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মাধ্যমে হয় না।^{১১৩}

১১১। ষস, ৮১

১১২। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ ৫২০

১১৩। নাম, ১, পৃঃ ৫৯-৬০ (‘চাৰ্বাকধূর্তস্ত...প্রমাণসংখ্যানিয়মাশকাকরণীয়ত্ব-সিদ্ধয়েচ প্রমিতি ভেদান্ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপজ্ঞানীদৃশানুপাদর্শয়ৎ...’)

জয়ন্ত ভট্ট বর্ণিত চার্বাক-গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ চিত্রায়ণ কোন ক্রমেই সম্ভব ন কারণ এ প্রসঙ্গে চার্বাক পক্ষের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে এমন রচ প্রকৃত অভাব। তবে “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” নামে চার্বাকগোষ্ঠীর একমাত্র মৌলিক রচনার উল্লেখ আমরা করেছি তার মধ্যে এই শ্রেণীর ধৃত চার্বাক ছবি আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভব হতে পারে। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমা মর্যদা দান সম্বন্ধে চার্বাক প্রসঙ্গে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে সাক্ষ্য তার পরিপন্থী। এই গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাকেরা অত্র প্রমাণের সঙ্গে প্রাক্ষকেও প্রমাণের আসর থেকে বহিষ্কার করতে আগ্রহী এবং প্রত্যক্ষোপাি বস্তুজগতের বিষয়গুলিও এঁদের কাছে প্রমেয়ের মর্যদা লাভে বঞ্চিত। প্রপক্ষে সাধারণ বিচারে আমরা যাকে ‘তত্ত্ব’ বলি বিভিন্ন প্রমাণগ্রাহ্য সেই ত অস্তিত্বকে এঁরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন।^{১২৪} নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপ সময় যে তত্ত্বকে এঁরা উপজীব্য করেন প্রমাণের সংখ্যা এবং লক্ষণসম্ব নিয়মের অনৈক্যের সঙ্গে তা একার্থক। বাস্তবিকপক্ষে জাগতিক বস্তুনিচ সত্যাসত্য নির্ণয় করার মান, আমরা যেভাবেই ঠিক করি না কেন— সময়ই তা ক্রটিমুক্ত হতে পারে না। এটা প্রদর্শন করাই তত্ত্বোপপ্লববাদী উদ্দেশ্য^{১২৫} এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত এঁরা তর্কের বিভিন্ন কলাকৌ

১২৪। ‘পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি লোকে প্রসিদ্ধানি, তান্যপি বিচার্যমানানি ব্যবতিষ্ঠন্তে, কিং পুনরন্যানি’, তত্ত্বোপপ্লবসিংহ পৃঃ ১

১২৫। তত্ত্বোপপ্লবসিংহের মতে প্রমাণের অস্তিত্ব সং লক্ষণের ঐ নির্ভরশীল, আবার এই প্রমাণের মাধ্যমেই প্রমেয় বস্তুবিব ব্যবস্থাপনা। প্রমাণের লক্ষণে যদি ক্রটি থাকে, তাহলে তাকে কং সং বলা চলে না এবং এই ক্রটিপূর্ণ লক্ষণযুক্ত প্রমাণের অস্তি স্বীকৃত হতে পারে না। প্রমাণ অস্বীকৃত হলে প্রমাণের মাধ্য আমরা প্রমেয় যে বস্তু বা বিষয়ের ধারণা করি সেগুলিকেও অং করতে হয়। (কথং কথং তানি ন সন্তি? তদুচ্যতে সল্লক্ষণনিবা মানব্যবস্থানং, মাননিবন্ধনা চ মেয়স্থিতিঃ, তদভাবে ন তথা স ব্যবহারবিষয়ত্বং কথং, ...পৃঃ ১)। বৌদ্ধমতের সমালোচনা প্রা তত্ত্বোপপ্লবসিংহে মান এবং মেয়ের সংখ্যাগত নির্দেশনার বিরোধি করা হয়েছে। (‘তথা মানমেয়সংখ্যাপি সৌগতমতে নোপপজ্ঞে পৃঃ ৩০)

উদ্ভাবন করে একই সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তে ক্রটি অনু-
সন্ধান প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে প্রমাণের সংখ্যা এবং লক্ষণ স্বস্বকীয় নিয়ম
প্রসঙ্গে যে স্বস্থ মতভেদ, চার্বাকী সমালোচনা তার মূলে আঘাত করেছে। এ
বিষয়ে চার্বাক জয়রাশির সঙ্গে “জায়মঞ্জরী”তে ধৃত সংজ্ঞায় অভিহিত চার্বাকগোষ্ঠীর
সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখা যায়। প্রমাণস্বকীয় নিয়মের বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে চার্বাকদের
প্রগতিবাদী মনোভাবের ঐক্য স্বচক, যা দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও আমাদের
আচরণ বিধির প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মবদ্ধনকে শিথিল করার প্রয়াসে তৎপর।
আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে স্বকঠোর বিধিনিয়মের ভারে ভারাক্রান্ত বৈদিক
আচারের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রচেষ্টার মধ্যে চার্বাকী চিন্তার প্রথম উন্মেষ।
আবির্ভাবের প্রাথমিক মুহূর্তে যে প্রগতিবাদী দৃষ্টি চার্বাকী মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার
করেছিল, উত্তর যুগের চার্বাকী চিন্তাতেও সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব লক্ষণীয়। সংখ্যা
ও লক্ষণের নিয়মে প্রমাণের শ্রেণীবিভাগে ত্রতী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে চার্বাকদের
যে ধরনের প্রতিবাদ “জায়মঞ্জরী”তে দেখা যায় তারই অনুরূপ প্রতিবাদে সোচ্চার
চার্বাক জয়রাশি বৈয়াকরণরূত শব্দের লক্ষণগত নিয়মের বিপক্ষে, তাঁর “তত্বোপপ্লব-
সিংহ” গ্রন্থে। বৈয়াকরণের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দুর্লভ্য বন্ধনে শব্দকে আবদ্ধ
রেখেছেন! ব্যাকরণের সূত্রগুলি তাঁদের মতে লক্ষণের পর্যায়ভুক্ত। এবং এই
লক্ষণাশ্রিত শব্দসমূহকে তাঁরা ‘সাধু’ আখ্যায় ভূষিত করেন। এইভাবে সাধুশব্দের
ছাড়পত্র লাভে যে শব্দগুলি সক্ষম, একমাত্র সেগুলিই তাঁদের নির্দেশে গ্রহণযোগ্য
বলে বিবেচিত।

চার্বাক জয়রাশির স্বস্থ বিচার বিশ্লেষণ প্রসারিত হয়েছে বৈয়াকরণ নির্দেশিত
বিশেষ লক্ষণযুক্ত সাধু শব্দের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ব্যাপারে। বৈয়াকরণদের
মতে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা যেগুলি নির্দেশিত হয় না, সেগুলি অসাধু শব্দ এবং এই
অসাধু শব্দের প্রয়োগকে তাঁরা অনুমোদন করেন না। জয়রাশি অসাধু শব্দের
প্রয়োগের ফলে সম্ভাব্য কয়েকটি দোষের উল্লেখ করে যুক্তির মাধ্যমে সব কটি
দোষেরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করেছেন। আর উপসংহারে সাধু শব্দের সঙ্গে
অসাধু শব্দেরও সমান সার্থকতা সম্বন্ধে নিজস্ব মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।^{১২৬}

জয়রাশি অবলম্বিত প্রতিপক্ষ খণ্ডন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা লাভের ব্যাপারে
‘তত্বোপপ্লবসিংহ’ গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বকীয় প্রারম্ভিক আলোচনা

কিছুটা আলোকপাত করতে পারে এবং এই আলোচনার বিচারেই এখন আমরা প্রবৃত্ত হব।

তায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—‘ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষণ-পন্নঃ জ্ঞানমবাপদেগমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকঃ প্রত্যক্ষম্’^{১৭} অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বলতে সেই ধরনের জ্ঞান বোঝায় যা ইন্দ্রিয় এবং অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধকর্ষণ ফলে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় এবং অর্থ পরস্পর নিকটবর্তী হলেই যে প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব হয় না তা বোঝাবার জন্য সূত্রকার ‘অব্যপদেগম’, ‘অব্যভিচারী’ এবং ‘ব্যবসায়াত্মক’ এই কয়েকটি বিশেষণে এই জ্ঞানকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম বিশেষণের দ্বারা সংজ্ঞা, পরিচয় ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত বস্তুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিধি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। সম্মুখস্থ কোন ব্যক্তির আকৃতি ইত্যাদি সঙ্গন্ধে সাক্ষাৎভাবে যে জ্ঞান আমাদের মনের গোচরীভূত হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলা চলে। লোকটি সঙ্গন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানের সহযোগিতায় নাম ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত তার যে সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা তখন লাভ করি তা প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত। সূত্রে ব্যবহৃত ‘অব্যভিচারী’ পদ মিথ্যা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের পরিসর থেকে অপসারিত করেছে। সূত্রকিরণ জলের বা রজ্জুতে সর্পের বোধ প্রকৃত প্রত্যক্ষ পদবাচ্য নয়। ‘ব্যবসায়াত্মক’ শব্দের দ্বারা প্রকৃত বিচার বা অবধারণাকে জ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যার অভাবে কেবল মাত্র অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকর্ষণ ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। চক্ষুর সম্বন্ধে অসংখ্য বস্তু উপস্থাপিত হলেই যে তাদের সবগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তা বলা চলে না। বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষভাবে যেটি অবধারণায় আসে সেটিই প্রত্যক্ষপদবাচ্য। সেটি যদি ফুল হয় তাহলে জ্ঞাতা ব্যক্তির ধারণা জন্মে ‘এটি একটি ফুল’। ‘ব্যবসায়’ নামে অভিহিত এই বিশেষ ধারণা তায়ের অভিমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপরিহার্য সোপান।

প্রত্যক্ষলক্ষণের বিচার প্রসঙ্গে ‘তত্বোপপ্লবসিংহ’ প্রথমেই তায়সূত্রবর্ণিত এই লক্ষণকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে এর সর্বাঙ্গিক ক্রটি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছে। সূত্রবর্ণিত ‘অব্যভিচারী’ পদ গ্রন্থমতে আরও বিস্তারের অপেক্ষা রাখে।^{১৮} অব্যভিচারিতা নানা ভাবে হতে পারে—যে কারক বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই জ্ঞানের উৎপাদন তার অদৃষ্টতা, জ্ঞানের পথে বাধার অস্তিত্বের অভাব অথবা প্রবৃত্তিসামর্থ্য। প্রথমটিকে অব্যভিচারিতার কারণ হিসাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কারণ চক্ষু

ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কুশলতার বিচার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না, যে জন্ত প্রত্যক্ষ এই বিচারের মাধ্যম হতে পারে না। এ ব্যাপারে অনুমানেরও অসার্বকতা একই সঙ্গে প্রতিপন্ন হয়, কারণ অনুমানের কাৰ্য্যকারিতা প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই ভিত্তিতে। যে হেতু বা লিঙ্গ অনুমানের অপরিহায অঙ্গ, সেই লিঙ্গ এখানে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়োপস্থ জ্ঞানেরই সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের অদৃষ্টতা বিচার করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের অব্যভিচারিতা প্রমাণের চেষ্টা করলে ইতরেতরাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

বাধারহিতস্ব এবং প্রবৃত্তিসামর্থ্য—অব্যভিচারী জ্ঞান উৎপাদনে এ দুটির মধ্যেও কোনটি যে প্রকৃত কারণ হতে পারে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়,—সম্ভাব্য নানা রকম দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটিকে বিচার করার পর এ সম্বন্ধে গৃহ্ণকার তাঁর মন্তব্য ব্যক্ত করেন। মোট কথা, বিশেষ কোন বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানে প্রত্যক্ষজ্ঞ জ্ঞান প্রকৃতই বস্তুটির পরিচয় বহন করে কিনা স্থির করার প্রস্তুতি হিসাবে অব্যভিচারী জ্ঞানের বিভিন্ন কারণ আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন, যেগুলির অনুপস্থিতিতে যথার্থ জ্ঞানের পণায়ে কোন জ্ঞান উন্নীত হতে পারে না। কিন্তু এই কারণগুলি নির্ণয়যোগ্য না হওয়ায় ‘অব্যভিচারী’ বিশেষণও কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

“তত্ত্বোপপ্লবসিংহের” মতে প্রত্যক্ষলক্ষণে ‘ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধ’ পদকে অন্তর্ভুক্ত করে নৈয়ায়িকেরা ‘অব্যভিচারী’ পদকে আরও অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছেন। বাহ্য বস্তুর জ্ঞানে অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তু যদি ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী হয় তাহলে আপনা থেকে জ্ঞানে ব্যভিচারিতা শঙ্কার নিবৃত্তি হয়। নৈয়ায়িকেরা এ ক্ষেত্রে স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন যে ইন্দ্রিয় অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকট হলেও বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তে ভ্রমের উৎপাদন হয়। যেমন সূর্যরশ্মিতে জলের প্রতীতি। এ যুক্তির বিপরীত পক্ষে গৃহ্ণকারের যুক্তি এই যে উল্লিখিত উদাহরণে নয়নেন্দ্রিয়ের যোগ হয় নিকটবর্তী সূর্যরশ্মির সঙ্গে; যে উদক বা জলের প্রতীতি এ ক্ষেত্রে হয়, সেই উদক নয়নের সন্নিকটে একেবারেই আসে না। কাজেই ত্রায়সূত্রবর্তী ‘অব্যভিচারী’ পদ এখানে সম্পূর্ণ নিশ্চয়োজন। এই প্রসঙ্গে গৃহ্ণকার ব্যভিচারী জ্ঞান বা ভ্রম সম্বন্ধে হৃদীৰ্ষ এক আলোচনার অবতারণা করেছেন। সূক্ষ্ম বিচারে কোন জ্ঞানই যে ‘অব্যভিচারী’ সংজ্ঞা লাভ করতে পারে না নানাভাবে তা দেখান হয়েছে। “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থের অভিমতে ন্যায়সূত্রে অন্তর্ভুক্ত ‘অব্যভিচারী’ পদটি সব দিক দিয়েই অসার্বক।^{১২২}

ত্ৰায়সূত্রে প্রত্যক্ষ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত অপর তিনটি পদের অসার্থকতাও গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে অগুরুপভাবেই প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দেখা যায়। পরিশেষে গ্রন্থকার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বা বাহ্য অর্থের যে কোন অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এ প্রসঙ্গে ত্ৰায়সূত্রের অকার্যকরিতার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।^{১০০}

ভারতীয় দর্শনের অগ্রাগ্র শাখাতেও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে নিজস্ব লক্ষণ আছে। ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’র সমালোচনা থেকে এগুলিও বাদ যায় নি। দর্শনের সূক্ষ্ম তর্ককে উপজীব্য করায় এই সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরস এবং সেইজন্য এ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে সূচক হিসাবে একমাত্র ত্ৰায়সূত্রের প্রত্যক্ষলক্ষণ এবং তার সমালোচনার উল্লেখের মধ্য দিয়েই এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য এবং হেতুবাদের পূর্ণ প্রকাশ এই সমালোচনার মধ্যে।

“তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” আলোচনা করলে চার্বাক দর্শনের নেতিবাচক রূপের পূর্ণ পরিচয় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় প্রত্যক্ষনির্ভর বস্তুবাদী এক দর্শন হিসাবে চার্বাকের যে পরিচিতি, তা থেকে স্বভাবতঃই ধারণা হতে পারে যে চার্বাক সিদ্ধান্তে কিছুটা ইতিবাচক বক্তব্য আছে, যার কেন্দ্র হল শুল বস্তুবাদ এবং এই বক্তব্যের বিপরীত সব কিছুই এই দর্শনের সমালোচনার বিষয়ীভূত। অতুমান প্রমাণের বিরোধিতায় চার্বাকপক্ষের তৎপরতার মূল এই ব্যাপারে, এবং একই কারণে চার্বাকেরা বাদ দিতে চান আত্মা, পরলোক ইত্যাদিকে—প্রত্যক্ষের মাপকাঠি দিয়ে যেগুলি বিচার চলে না। কিন্তু “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থে যখন দেখা যায় যে চার্বাকগোষ্ঠী এই প্রত্যক্ষকেও প্রমাণের আসর থেকে বহিষ্কৃত করতে উন্মুখ এবং প্রত্যক্ষোপাজিত বস্তুজগতের বিষয়গুলিকেও প্রমেয়ের মর্ধ্যদা দিতে আপত্তি তখন চার্বাকদের নির্দিষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে। বস্তুতঃক্ষে এই গ্রন্থের রচয়িতার সূক্ষ্ম বিচারে কোন প্রমাণই ত্রুটিবিহীন নয়। এবং এই প্রমাণের দ্বারপথে জ্ঞানের রাজ্যে যে তত্ত্বগুলির প্রবেশ সেগুলির কোনটিই তাঁর কাছে অস্তিত্বের স্বীকৃতি পায়নি।

বিতণ্ডার লক্ষণ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই বিতণ্ডারই পূর্ণ প্রকাশ “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থে। লোকাবৃত্ত বা চার্বাক দর্শনে কর্তব্যের কোন উপদেশ নেই এবং বিতণ্ডাই এর একমাত্র উপজীব্য—এই মর্মে ‘ত্ৰায়মঞ্জরীতে’ যে উক্তি দেখা যায় তার প্রকৃত সার্থকতা এই গ্রন্থপাঠে উপলব্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে

ভাৰতীয় দৰ্শনের সহযোগী সব কটি শাখায় পৰিগৃহীত বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সমালোচনা এই চাৰ্বাকী গ্রন্থের উপপাত্ত বিষয়। প্রমাণের মধ্যে যে প্রত্যক্ষের আবেদন সহজ এবং স্বাভাবিক সেই প্রত্যক্ষকেও চাৰ্বাকরা আক্রমণ করেছে। বিভিন্ন দৰ্শনে বর্ণিত প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলির প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলির অসার্থকতা প্রদৰ্শন করে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যে কিভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, তার কিছু নিদৰ্শন আমরা আগেই সংগ্রহ করেছি। ‘ধূর্ত’ সংজ্ঞায় চাৰ্বাক গোষ্ঠীকে বিশেষিত করার সময় জয়ন্ত ভট্ট কোন্ শ্রেণীর চাৰ্বাকদের নির্দেশ করেছিলেন, সঠিক ভাবে তা বলা শক্ত। তবে এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্ট বর্ণিত চাৰ্বাক মতের সঙ্গে “তত্বোপপ্লবসিংহে” অন্তর্ভুক্ত চাৰ্বাকী ধারণার কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

অপরের বিচারে ক্রটি প্রদৰ্শন করাই যে এই শ্রেণীর চাৰ্বাকদের মুখ্য উদ্দেশ্য, নিজস্ব কোন সিদ্ধান্তে আসা নয়, আলোচ্য গ্রন্থের পবম্পরবিরোধী কয়েকটি সিদ্ধান্ত থেকে তা পরিস্ফুট হয়। ন্যায়দৰ্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে জাতি বা সামান্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি জানিয়ে^{২০১} একই গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট বৌদ্ধদের বিচারে ক্রটি প্রদৰ্শনকালে জাতির বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তি খণ্ডনে তৎপর হয়েছেন^{২০২}। বৌদ্ধ ক্ষণিকসহানবাদীদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় গ্রন্থকারের প্রয়াস দেখে মনে হয় যে তিনি বুঝি আত্মবাদী দার্শনিকদেরই সগোত্র।^{২০৩} কিন্তু পরক্ষণেই অধ্যাত্ম দৰ্শন অমুসৃত অমুমান প্রমাণের সাহায্যে আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করার প্রয়াস থেকে বোঝা যায়^{২০৪} যে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া চাৰ্বাকের লক্ষ্য নয়। তাঁদের লক্ষ্য হল নেতিবাচক পথ। প্রত্যক্ষবাদী হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে চাৰ্বাক দৰ্শনের বর্ণনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে চাৰ্বাকের এক বৃহৎ গোষ্ঠী এই নেতিবাচক প্রবণতায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি ও প্রত্যক্ষকে স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণগ্রাহ্য এই প্রমাণের মাধ্যমে পাওয়া বস্তুজগতকে তার বিষয়বস্তুর পরিসরে এনেছে। এই স্বাভাবিক ধারণারই প্রতিফলন দেখা যায় বস্তুবাদের সঙ্গে চাৰ্বাকী মতবাদের একাত্মীকরণে। কিন্তু চাৰ্বাকের এই বস্তুবাদী প্রকাশকে তার নেতিবাচক প্রবণতারই অঙ্গবিশেষ

২০১। তত্বোপপ্লবসিংহ, পৃষ্ঠা: ৪-৭

২০২। ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৬-৫১

২০৩। ঐ, পৃষ্ঠা: ৫৫

২০৪। ঐ, পৃষ্ঠা: ৭৪-৮৩

হিসাবে দেখাটা বোধ হয় অর্থোক্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে চার্বাক মতকে বস্তুবাদের পরিবর্তে হেতুবাদের সঙ্গেই একাত্ম করা অধিকতর সমীচীন। এই হেতুবাদেরই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রকাশের মধ্যে একটির আশ্রয় বস্তুজগৎ, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যার পরিচিতি। অপরটির প্রকাশ “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ”তে রূপায়িত চার্বাকী ধারায়, বস্তুজগতকে স্বীকৃতি দিতে না পারায় যা বাস্তববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বৌদ্ধ এবং অষ্টমত বেদান্তের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। জৈন দার্শনিক বিজ্ঞানন্দী ‘তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘সর্বথা শূন্যবাদিনস্তত্ত্বোপপ্লববাদিনো ব্রহ্মবাদিনো বা জাগ্রদুপলক্ষ্যক্রিয়ায়াং কিং ন বাধকপ্রত্যয়ঃ’। ‘খণ্ডনখণ্ড-খাত্ত’ গ্রন্থেও এই তিনটি মতবাদ একই শ্রেণীর অন্তর্গত।

হেতুবাদের বিপরীতধর্মী দুটি অভিব্যক্তির মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষ যেখানে প্রামাণ্যের মর্গদায় অভিষিক্ত, প্রচলিত পরিভাষায় ‘চার্বাক’ সংজ্ঞা সেই দর্শনেরই পরিচয় বহন করে। “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ”র বর্ণনায় তত্ত্বের অস্তিত্বে স্বীকৃতির অভাব, প্রচলিত প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক মতে তত্ত্বের বর্তমানতা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে লভ্য বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করে। এই বস্তুজগতের মূলগত উপাদানের সংখ্যা ভারতের অগ্ন্যাত্ম দর্শনের মতে পাঁচ—ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি, অপ্ বা জল, তেজ বা আগুন, মরুৎ বা বাতাস এবং ব্যোম বা আকাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকেই এই মূল তত্ত্বের সংখ্যা চারে সীমিত রাখতে চান।^{২০৫}

২০৫। ‘তত্র পৃথিব্যাদীনী ভূতানি চহরি তত্ত্বানি’, সং পৃ: ২; ‘পৃথ্বী জলং তেজো বায়ুভূত চতুষ্টয়ম্...’ ষস, ৮৩; ‘পৃথিব্যপ্তেজোবায়বস্তত্ত্বানি’, প্রচ, পৃ: ৬৪, ‘লোকায়তিকপক্ষে তু তত্র ভূতচতুষ্টয়ম্, পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাগরম্’, সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ২।১; ‘পৃথিবীবারি-বহিবায়ুলক্ষণানি’, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ‘চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকো’ (৩।১৮) তে চারটি ভূতের উপাদানে দেহ গঠন সম্বন্ধে চার্বাক মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা (১৮৫২) তে উদ্ধৃত ‘পৃথিব্যা-প্তেজোবায়ুরিতি চহরি তত্ত্বানি...’ সূত্রের মাধ্যমে চতুর্ভূত সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণার অভিব্যক্তি দেখা যায়। প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই চারটি তত্ত্ব ছাড়া অণু কিছু অমুদোদন লাভ করেনি (‘ন চৈতদ্ব্যতিরেকণ... সংসিদ্ধিঃস্তাৎ’ তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১৮৬০), গুণরত্নের বর্ণনা অমুদোদে চার্বাকদের এক বিশেষ শ্রেণী পঞ্চ মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, (তর্করহস্যদীপিকা, পৃ: ৩০০)

ব্যোম বা আকাশকে তারা গ্রাহ্য করে না। কারণ, ব্যোম বা মহাশূন্তের জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হয় না।

এই চতুর্ভূতকেই প্রত্যক্ষবাদী চাৰ্বাকেরা তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এবং এই তত্ত্বগুলির অতিরিক্ত অত্যা কিছু তাঁদের অনুমোদন লাভ করেনি। এই চার তত্ত্বের সমবায় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং জাগতিক সব পদার্থের সৃষ্টি। কমল-শীল এ প্রসঙ্গে লোকায়াতসূত্র উদ্ধৃত করেন—‘তৎসমুদায়ে বিষয়েন্দ্রিয়সংজ্ঞা’।^{২০৬} বিভিন্ন প্রাণিদেহের উপাদানরূপেও মৌল এই চারটি তত্ত্বের নির্দেশ চাৰ্বাক দর্শনে আছে।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সামান্য উল্লেখ বোধ হয় এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। বস্তু-জগতের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে অনুমোদিত চাৰ্বাকী তত্ত্বের সংখ্যা ভারতের প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম হলেও প্রাচীন গ্রীক চিন্তায় কিন্তু এর এক অনুলিপি দেখা যায়। দার্শনিক Plato-র মতে^{২০৭} ‘there are four elements out of which the body is composed, earth and fire and water and air...’ Aristotle বলেন, ‘Since the bodies of all animals, and likewise of all plants, are composed from the four elements, in some of them earth predominates, as in plants, in others, water, as in aquatic animals, and in others air or fire, as in pedestrious and winged animals.’

চাৰ্বাক দর্শনের ইতিহাসে এই তথ্য হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি রচনা করতে পারে।

অনুমান প্রমাণ—স্বভাববাদ

প্রত্যক্ষের পরেই প্রাধান্যের বিচারে ভারতীয় দর্শনে যে প্রমাণের অগ্রগামিতা সাধারণভাবে স্বীকার্য সেই অনুমানকেও তীব্রভাবে চাৰ্বাকী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনুমান প্রমাণ হিসাবে যাঁদের দ্বারা অনুমোদিত, প্রতি-আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরাও পশ্চাৎপদ হননি। অনুমান প্রমাণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দার্শনিকদের এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু বিবরণ দেওয়ার আগে দর্শনের পরিভাষায় বর্ণিত অনুমানের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

২০৬। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১৮৬০

২০৭। Plato Dictionary, p. 74

গৌতমের স্মারকসূত্রে প্রত্যক্ষলক্ষণের বর্ণনার পর অনুমানকে ‘তৎপূর্বক’^{২০৮} অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-আশ্রিত বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনুমান প্রত্যক্ষের মত স্বনির্ভর প্রমাণ নয়। ‘অনু’ শব্দের অর্থ ‘পশ্চাৎ’ এবং প্রত্যক্ষলক্ষ জ্ঞানের পর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সংগৃহীত উপকরণগুলির সাহায্যে নূতন জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এই অনুমান প্রমাণ।

স্মারকবর্ণিত অনুমানের গঠন বোঝাতে সাধারণতঃ এই উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া হয় :

পর্বতো বহিমান্ ধূমাং—যত্র যত্র ধূমোহস্তি তত্র তত্র অগ্নিঃ, যথা মহানসাদৌ—পর্বতে ধূম অথবা ধোঁয়ার অস্তিত্ব থেকে বহি বা আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। অনুমানের ভিত্তি এক্ষেত্রে ধোঁয়া এবং আগুনের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের অভিব্যক্তি ‘যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুনও থাকে’ এই ধারণা। এ ধারণার উৎস আবার আমাদের পুরাতন প্রত্যক্ষলক্ষ অভিজ্ঞতা, যথা, রান্নাঘর এবং অগ্ন্যস্ত্র স্থানে ধোঁয়াকে সব সময়ে আগুনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে দেখা গেছে।

ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব আমরা অনুমান করি ; কাজেই ধোঁয়া এখানে আমাদের অনুমানলক্ষ জ্ঞানের ‘হেতু’, ‘সাধন’ বা ‘লিঙ্গ’। হেতুর সাহায্য নিয়ে যা অনুমান করা হয়—এ ক্ষেত্রে আগুন—স্মারকের পরিভাষায় তার নাম ‘সাধা’। যে স্থানে বা অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয় তার নাম ‘পক্ষ’। উপরের উদাহরণে পক্ষের ভূমিকা পর্বতের। সাধনের সঙ্গে সাধ্যের চিরকালীন সম্পর্কে বলা হয় ‘ব্যাপ্তি’, বা অবিনাভাব। অনুমানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ অনুমানের প্রকৃত ভিত্তি হিসাবে এই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই নির্দেশ করা যেতে পারে। ‘যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুনও থাকে’—এই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে ভিত্তি করে আমরা ‘পক্ষ’ বা পর্বতের সঙ্গে ‘সাধা’ বা আগুনের যোগ সাধন করি। ধোঁয়া এখানে ‘সাধ্য’ এবং ‘পক্ষ’, উভয়েরই সাধারণ ধর্ম বা ‘লিঙ্গ’। ‘হেতু’ বা ‘লিঙ্গের’ সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত থাকার জন্য ‘সাধ্যের অপর নাম ‘লিঙ্গী’।

অনুমানকে প্রত্যক্ষ পূর্বক বলা হয়েছে, কারণ অনুমানগত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যক্ষের উপর আমাদের নানাভাবে নির্ভর করতে হয়। উদাহরণে ধোঁয়াকে প্রত্যক্ষ করে তবেই ধোঁয়ার কারণ হিসাবে আগুনের সিদ্ধান্তে আসা

সম্ভব হয়। নিৰ্ভূল অনুমানের ভিত্তি যে লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের মূলেও আছে প্রত্যক্ষের কার্যকরিতা। ২০৯ অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধোঁয়া এবং আগুন বা সাধন এবং সাধ্যের একত্র অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করে তবেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধারণা সম্ভব।

অনুমান প্রমাণে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ চাৰ্বাকেরা অনুমানের প্রামাণ্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন। চাৰ্বাক পক্ষের বিচারে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান অভ্রান্ততার ছাড়পত্র লাভে কোন ক্রমেই সক্ষম হয়নি, অথচ এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তিতেই রচিত অনুমান প্রমাণের বিশাল সৌধ। চাৰ্বাকেরা সম্ভাব্য সব রকম জ্ঞানের মাধ্যম বিচার করে অভ্রান্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের উৎপত্তি কোন মাধ্যমের সাহায্যেই যে সম্ভব নয় তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অনুমান প্রমাণের আরম্ভ এই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এবং এই জ্ঞানের আবির্ভাবের আগে অনুমানের অস্তিত্বই কল্পনীয় নয়। কাজেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের উৎস হিসাবে অনুমানকে কল্পনা করা চলে না।

প্রমাণের অপর একটি মাধ্যম আপ্তবাক্যও যে চাৰ্বাকমতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ নয়, ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’র বিবরণ^{২১০} থেকে তায় পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে চাৰ্বাকপক্ষ থেকে বৈশেষিক মতের উল্লেখ করা হয়েছে, যে মত অনুসারে আপ্তবাক্য অনুমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকারের ক্ষেত্রে আপ্তবাক্যের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। আপ্তবাক্যের সত্যতার ভিত্তি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উক্তি। এ জাতীয় উক্তিতে নির্ভরতা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন বাক্যের সঙ্গে অর্থের সার্বকালীন সঙ্গতি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, অর্থাৎ, বাক্যের সঙ্গে অর্থের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূচক অপর একটি ব্যাপ্তিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। কাজেই আপ্তবাক্যে নির্ভরতার সঙ্গে ব্যাপ্তিজ্ঞানে বিশ্বাস অঙ্গাদ্বীভাবে জড়িত থাকায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে আপ্তবাক্য গণ্য হতে পারে না। অনুমানের আশ্রয় ব্যাপ্তিজ্ঞান আপ্তবাক্যের মাধ্যমে নির্ণয়যোগ্য নয়—চাৰ্বাকদের এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে অনুমানকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলেও প্রমাণ হিসাবে আপ্তবাক্যেরও দুর্বলতার ইঙ্গিত সূচিত করে।

আমরা আগেই দেখেছি যে অনুমানের সমর্থকদের কাছে এই ব্যাপ্তি-

২০৯। তৎপূর্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনঃ সম্বন্ধদর্শনঃ লিঙ্গদর্শনকাভিসম্বধ্যতে, শ্রীভা, ১।১।৫

২১০। সমঃ, পৃ পৃঃ, ১০

জ্ঞানের উৎস প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—অনুমান বা আপ্তবাক্যের ভূমিকা এক্ষেত্রে তাঁদের গ্রাহ্য নয়। কাজেই চার্বাক পক্ষেরও মূল আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উৎপত্তির মাধ্যম হিসাবে এই প্রত্যক্ষের কার্যকরিতার বিরুদ্ধে। জয়রাশি ভট্টের স্বপক্ষীয় বক্তব্যের উল্লেখ করে এখন এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা শুরু করব।

‘ব্যাপ্তি’ বা সাধ্যের সঙ্গে সাধনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞানকে যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে লাভ করতে চাই তাহলে প্রয়োজন সাধ্যের সঙ্গে যুক্ত সাধনকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করা। “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে” বলা হয়েছে যে এভাবে প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অবধারণের পথে প্রধান অন্তরায় হল দেশ, কাল এবং স্বভাবের ব্যবধান।^{২১১} গ্রন্থকারের মতে এই আবশ্যিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির ধারণা প্রতিটি সম্বন্ধীকে আশ্রয় করেই কেবল সম্ভব। সম্বন্ধ গ্রহণের সময় প্রতিটি সম্বন্ধী সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থাকলেও প্রতিভাত হয়—এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। জয়রাশি ভট্টের মতে যে বস্তু সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষের পরিসরে বর্তমান নয় তার প্রতীয়মানতা কল্পনা করলে জিহ্বার মাধ্যমে রসের আশ্বাদনের ক্ষেত্রে রূপের প্রতীয়মানতা কল্পনা করাও অসঙ্গত হয় না।^{২১২}

অনুমানের সমর্থকেরা হয়ত বলতে পারেন যে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধের অবধারণ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই হতে পারে, এর জগৎ প্রত্যেকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করা নিষ্প্রয়োজন। ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ গ্রন্থের অভিমত অনুসারে সে ক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে এই সম্বন্ধের অবধারণ, সেইগুলির ক্ষেত্রেই কেবল এটি প্রযোজ্য হবে, অগ্নিগুলির ক্ষেত্রে নয়। কারণ, অগ্নির সম্বন্ধে অগ্নির গমকল্প কল্পনা করা অপ্রাসঙ্গিক।^{২১৩}

মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পরীক্ষার ভিত্তিতে সাধ্য সাধনের মধ্যে অনতি-

২১১। ‘দেশকালস্বভাববিপ্রকর্ষাচ্চ ন ব্যক্তীনাং সম্বন্ধাবধারণায় অলং প্রত্যক্ষম্,’ পৃঃ ৬৫

২১২। ‘ন চ সম্বন্ধগ্রহণমন্তরেণ...কল্প্যাস্যাৎ,’ ঐ

২১৩। ‘অথ অবিনাভাব সম্বন্ধ গ্রহণ.....অতিপ্রসঙ্গাৎ’ ঐ।

সাংখ্যপ্রবচনশূন্য, ৫।২৮তে ব্যাপ্তিসিদ্ধির বিপক্ষে চার্বাকী মতের উল্লেখ দেখা যায়।

ক্রম্য গুণগত বন্ধনের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অবধারণের পক্ষে অনুমানের সমর্থকদের অভিমতের কথা “সর্বদর্শন সংগ্রহে” চাৰ্বাক মতের বিস্তার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে চাৰ্বাকী উত্তর নিয়েও ঐ গ্রন্থে আলোচনা আছে। চাৰ্বাক মতে কোন দুটি বস্তু মধ্য পরস্পর গুণগত সম্বন্ধের ধারণা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সম্ভব নয়। যদিও সম্ভব হয় তাহলেও এই ধারণা বিশেষ বস্তু দুটিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, অন্য বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে এই ধারণাকে প্রয়োগ করা সমীচীন হতে পারে না।

ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ একটি ধারণায় আনা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র সাধনের ও সাধ্যের পরস্পর যোগের ব্যাপ্তিগত প্রতিটি ঘটনাকে পৰ্ববেক্ষণ করার মাধ্যমে, অন্তভাবে নয়—চাৰ্বাকপক্ষের এই অভিমতের আলোচনা এবং সমালোচনা এই দর্শন সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থেই দেখা যায়। এ ধরনের বিশেষ পৰ্ববেক্ষণ যে মানুষের সাধ্যাতীত চাৰ্বাকী এই মন্তব্যের বিবরণও এই প্রসঙ্গে এই সব গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। “সর্বদর্শন সংগ্রহে” উল্লিখিত চাৰ্বাক মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাধারণভাবে একটি ধারণা অনুমোদন করা মানুষের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। প্রচলিত উদাহরণে ধোঁয়ার অস্তিত্ব আগুনের সম্ভাব সূচনা করে—এই সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষের সাহায্যে উপনীত হবার অন্য প্রয়োজন অতীত এবং বর্তমানের প্রতিটি ধোঁয়া-সংক্রান্ত ঘটনা এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের যে সব ঘটনার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা—যা একেবারেই অসম্ভব। মনের মাধ্যমে উৎপন্ন আন্তর প্রত্যক্ষ থেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞানে উপনীত হবার সম্ভাবনা চাৰ্বাক মতে স্বীকৃত নয়। কারণ চাৰ্বাকেরা এই ধরনের প্রত্যক্ষকে বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন।^{২১৪}

অনুমানের বিরোধিতা প্রসঙ্গে চাৰ্বাক পক্ষের উক্তি নিয়ে জয়ন্ত ভট্ট “জ্ঞান-মঞ্জরীতে” আলোচনা করেছেন।^{২১৫} ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি ভূয়ো-দর্শন, অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষেত্রে সাধনকে সাধ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা। চাৰ্বাকপন্থীরা বলেন যে এই পরিবর্তনশীল জগতে দেশ, কাল ও পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বস্তু-প্রকৃতিও নিয়ত পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় বিশেষ কোন ধর্ম বস্তুবিশেষের সঙ্গে সব অবস্থাতেই যুক্ত থাকতে বাধ্য, এটা আশা করা

২১৪। সমং, পৃঃ ৮-১০

২১৫। জ্ঞান, ১ পৃঃ ১০৮-৯

যায় না। কাজেই ভূয়োদর্শনের মাধ্যমে লব্ধ বিশেষ দ্রব্য এবং ধর্মের পরস্পর অবিনাভাবের সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়া সম্ভব নয়।^{২১৬} অসংখ্য ক্ষেত্রে সাধন এবং সাধ্যের একত্র অবস্থান যদিও দেখা যায়, তাহলেও এর থেকে আমরা চিরকালীন লভ্য কোন ব্যাপ্তিজ্ঞানের আশা করতে পারি না; কারণ অতীতে যে অবিনাভাব দেখা গেছে, ভবিষ্যতে তার ব্যতিক্রম হবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। “শ্রায়মজ্জরী”র উক্তিতে বলা হয়েছে যে বিশ্বের সমস্ত বস্তু যদি কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-গোচরে আনা সম্ভব হত তাহলে সেই ব্যক্তি তাঁর বিশেষ শক্তির সাহায্যে হয়ত বলতে পারতেন সাধন বা ধূম সাধ্য বা অগ্নির সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই প্রকৃতই যুক্ত কিনা। কিন্তু এই ধরনের শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে অনুমান এবং অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান—দুইই নিষ্প্রয়োজন।^{২১৭}

চার্বাকপন্থীরা আরও বলেন যে প্রকৃত ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করতে হলে সাধ্য এবং সাধনের একত্র অবস্থানের প্রত্যেকটি ঘটনার মত উভয়ের একটির অভাবে আর একটির অনবস্থানের প্রতিটি ব্যাপারও পর্দালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি আরও কঠিন। বিভিন্ন স্থানে ধোঁয়া এবং আগুনের একত্র অবস্থানের ঘটনা প্রত্যক্ষগোচরে আনা যদিও সম্ভব হয়, আগুন অবর্তমানে ধোঁয়ার অনুপস্থিতির প্রতিটি ঘটনা লক্ষ্য করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, আগুনের অনুপস্থিতি পর্যবেক্ষণ একমাত্র আগুন ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের মাধ্যমেই হতে পারে। কাজেই অদ্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় দিক থেকেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যে অনুমানের আশ্রয় এই জ্ঞান নেই অনুমানেরও অসার্থকতা এর থেকেই প্রমাণিত হয়।^{২১৮}

“শ্রায়কুসুমাজলি” গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাক মত অনুসারে অনুমান নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।^{২১৯} তবে অনুমানের সূত্র ধরে সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পথ প্রদর্শকের কাজ করে। বিশেষ কোন স্থানে ধোঁয়ার অস্তিত্ব থেকে মানুষের মনে ধারণা হয় যে সেখানে আগুন থাকতে পারে।

২১৬। ‘দেশকালদশাভেদবিচিত্রাশ্রয় বস্তুযু অবিনাভাবনিয়মো ন শক্যা বস্তুমাত্ ৮’

২১৭। ‘ন প্রত্যক্ষ কৃত্য যাৎদৃ.....এবামনুমানপ্রয়োজনম্’

২১৮। ‘নিয়মস্তানুমানাহং গৃহীতঃ প্রাপ্তিপত্ততেনৈব পশাস্ত্য যোগিনঃ’

২১৯। শ্রায়কুসুমাজলি, ৩৬

এই ধারণার বশীভূত হয়ে অনেক সময় সে আগুন সংগ্রহ করতে যায় এবং এই কাজে সফল হলে নিজ ধারণাকে সে প্রামাণ্য জ্ঞানের মৰ্যাদায় উন্নত করে। আমাদের জীবনে অধিকাংশ কাজের প্রেরণার মূল এই ধারণার অন্তর্ধান। কিন্তু চাৰ্বাকমতে এগুলি প্রমাণ নয়, সম্ভাবনার আভাসমাত্র। এই সম্ভাবনাকে পরিণামে সত্য হতে দেখলে নেহাতই কাকতালীয় (accidental) বলে ধরে নিতে হবে।

ব্যাখ্যিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যাপ্যতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ব্যাপ্যতা এবং ব্যাপকতা নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসাবে বস্তু বিশেষের অবস্থানের আয়তনের পরিমাণকে নির্দেশ করা হয়েছে। কোন একটি বস্তু যদি অপর একটি বস্তুর অবস্থানের সম্পূর্ণ অংশ অধিকার করে থাকে তাহলে প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয়টির ‘ব্যাপক’ এবং দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথমটির ‘ব্যাপ্য’। আগুন এবং ধোঁয়ার ক্ষেত্রে ধোঁয়ার অবস্থানের সম্পূর্ণ অংশ আগুনের অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত—ধোঁয়ার উপস্থিতির সঙ্গে আগুনের উপস্থিতিও সব সময়েই বিজড়িত—কাজেই আগুন এখানে ব্যাপক এবং ধোঁয়া ব্যাপ্য।

অন্তমানের নিতুলতার জ্ঞাত প্রয়োজন সাধন বা হেতু সব ক্ষেত্রে ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক হইবে। ধোঁয়া থেকে আগুনের অন্তমানের ব্যাপারে ধোঁয়ার চেয়ে আগুনের ব্যাপকতা সব সময়ে বেশী, অন্ততঃ কম কোন ক্ষেত্রেই নয়। আগুন যখন আত্ম ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই ধোঁয়ার উপস্থিতি দেখা যায়, অতীত সময়ে নয়। এই আত্ম ইন্ধন ছাড়াও অতীত অনেক পদার্থ, যথা লৌহগোন্ধ, ইত্যাদির সঙ্গে আগুন অনেক সময় যুক্ত হয়, কিন্তু ধোঁয়া তখন অন্তর্গত থাকে। যে আত্ম ইন্ধনের সংযোগের সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার সম্বন্ধ সীমিত, সেই আত্ম ইন্ধন এক্ষেত্রে আগুনের ‘উপাধি’ এবং আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার সম্পর্ক এই উপাধির সংযোগের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় উপাধিক বা সর্ভসাপেক্ষ।

সাধন বা হেতুর সঙ্গে সাধ্যের উপাধিমুক্ত সম্পর্ক বা অবিনাশাব্যয়মন্তে ‘ব্যাখ্যি’ সংজ্ঞা লাভের যোগ্য। দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ দুই রকমের, স্বাভাবিক বা সর্ভসাপেক্ষ। লাল রঙ জ্বার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধ হলেও ক্ষুণ্ণিকের সঙ্গে নয়, কারণ ক্ষুণ্ণিকে লাল রঙের উপস্থিতি নির্ভর করে জ্বার সঙ্গে তার যোগের উপর। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং উপাধিমুক্ত—ধোঁয়ার উপস্থিতি থেকে আগুনের উপস্থিতি আমরা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করে নিতে পারি। আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার সম্পর্ক কিন্তু চিরন্তন নয়, কারণ আত্ম ইন্ধন বা তিজা জ্বালানির সঙ্গে যুক্ত আগুনেই কেবল ধোঁয়া থাকে।

অল্পমান প্রক্রিয়ার সাধনের সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্কে উপাধির যোগ থাকলে অল্পমান ক্রটিপূর্ণ হয়। উপাধি সাধ্যব্যাপক কিন্তু সাধন-ব্যাপক নয়। ক্রটিপূর্ণ অল্পমানে সাধ্যের সঙ্গে উপাধির যোগ সব সময়ে থাকে। আগুনের উপস্থিতি থেকে ধোয়ার অস্তিত্ব অল্পমান করতে গেলে সে অল্পমান ক্রটিপূর্ণ হয়, কারণ এক্ষেত্রে সাধন আগুনের সঙ্গে সাধ্য ধোয়ার যোগ আত্ম ইচ্ছন বা ভিজা জ্বালানি—এই উপাধির দ্বারা সীমিত। উপাধি এখানে সাধ্য ধোয়াতে ব্যাপক, সাধন আগুনে নয়।

অল্পমানকে নির্ভুল প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে চার্বাকপক্ষ থেকে এই যুক্তি দেখান হয় যে সাধনের সঙ্গে সাধ্যের উপাধিমুক্ততা সম্বন্ধে স্তনিশ্চিত হওয়া কোনক্রমে সম্ভব নয়। কারণ পরিণামে অল্পমানের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত ব্যাপ্তিজ্ঞানের নির্ভুলতার মূলে সব সময়েই সংশয়ের ছাপ থেকে যায়। আগুনের সঙ্গে ধোয়ার সংযোগ যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতাব পরিসরে তার পক্ষে এই জাতীয় সংযোগকে চিবস্তন বলে স্বীকার করার পথে কোন বাধা নেই। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে আগুনের উপস্থিতি থেকে ধোয়ার অস্তিত্ব অল্পমান করার প্রবণতা তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় অল্পমান যে ক্রটিপূর্ণ নিঃশয় অগ্নির আস্তিত্বের বিভিন্ন ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের সত্যতায় চার্বাকদের সংশয়ের মূল নিহিত কাণকারণ সম্পর্কে তাঁদের অল্পমোদনের অভাবে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের সমর্থকদের মতে ধূমের অগ্নি-ব্যাপ্যতা প্রমাণ করতে হলে ধূমের সঙ্গে অগ্নির সহাবস্থানের প্রতিটি ঘটনা লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন কেবল ‘ধূমত্ব’ এবং ‘অগ্নিত্ব’ এই দুটি সামান্ত্রের মধ্যে কাণকারণভাবে বিশ্বাস। ব্যাপ্তিগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ধূম ও অগ্নিসম্বন্ধীয় এই সামান্ত্রকে কেন্দ্র করে। “ন্যায়ায়মঙ্গরা”তে জয়ন্ত ভট্টের আলোচনার মধ্যে ব্যাপ্তি শব্দের এই ধরনের অর্থ সূচিত হয়।^{২২০} চার্বাকী ধারণায় কিন্তু এই সামান্ত্রের কোন স্বীকৃতি নেই এবং ফলে সামান্ত্রদ্বারক কাণকারণভাবও এই দর্শন মতে অনিশ্চয়তার দোষে ছুটি।^{২২১} সামান্ত্র বা জাতের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে স্থলীর্থ আলোচনা চার্বাকী গ্রন্থ “তত্ত্বোপপন্নবসিংহে” অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।^{২২২} গ্রন্থকারের

২২০। “জলনদ্যাঙ্গি-নামান্ত্রপুং:সরতয়া ব্যাপ্তিগ্রহনাৎ.....গ্রাম, ১, ১০৮

২২১। “সামান্ত্রদ্বারকোহ্যাপ্তি নাবিনাভাবনিশ্চয়ঃ; বাস্তবং হি ন সামান্ত্রঃ নাম কিঞ্চন বিদ্যতে”, ঐ

২২২। পৃ পৃঃ, ৪-৭

মতে সামান্তের অস্তিত্ব স্বীকারে যুক্তি না থাকায় সামান্তের মাধ্যমে সম্বন্ধ অবধারণের ভিত্তিতে সংগৃহীত ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিত্তিহীন।^{২২৩}

দুটি ঘটনার একাধিক ক্ষেত্রে ক্রমিক সংঘটনের ব্যাপার বিশ্লেষণ করলে উভয় ঘটনার আশ্রয় বস্তুগুলির অন্তর্নিহিত সামান্য ধর্মে অধিকাংশ সময়েই কার্যকারণ-ভাবে অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়। অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞানের জনক হিসাবে এই কার্যকারণভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কার্যকারণভাবে সম্পূর্ণ আবশ্যাসী চার্বাকেরা মনে করেন যে দুটি ঘটনার একত্র যোগাযোগ নেহাতই অহেতুক এবং এ থেকে ভবিষ্যতেও অতীতের এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনুমান করা যায় না। কারণ, অতীতে দৃষ্ট হয়নি এবং সেইজন্য আমাদের কল্পনাতেও আসেনি এমন অনেক বিষয়ের উপস্থিতিতে হয়ত ভবিষ্যতে ঘটনাগুলির ক্রমিকতা নষ্ট হতে পারে।

অনেক সময় ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি বা বোগনিবৃত্তির জন্য রত্নধারণ, মন্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। এ সবের মাধ্যমে অভীষ্টসিদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে হলেও চার্বাকদের মতে এগুলির ব্যবহার এবং ফলপ্রাপ্তি, উভয়ের মধ্যে কার্য-ধারণ কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, অনেক সময় মণি, মন্ত্র বা ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার ছাড়াই ঐচ্ছিকসিদ্ধি হয়। মণি, মন্ত্র বা ঔষধের প্রয়োগ এবং সেই প্রয়োগের ফলে মাংশিক ক্ষেত্রে লব্ধ ফল—উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ চার্বাকী পরিভাষায় ‘যাদৃচ্ছিক’ (accidental) আখ্যা পেয়েছে।^{২২৪} চার্বাক মত অনুসারে জগতের অন্ত যে সমস্ত ঘটনাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে কার্যকারণঘটিত বলে মনে হয়, অমুরূপ বিচারে নগুলিও ‘যাদৃচ্ছিক’ প্রতিপন্ন হয়। চার্বাকদের অনুসৃত এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিপ্রেক্ষিতে চার্বাক দর্শনের অপর সংজ্ঞা ‘যাদৃচ্ছিকবাদ’ বা ‘স্বভাববাদ’।^{২২৫} চার্বাক-দের অভিমতে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য ইত্যাদি যেমন স্বাভাবিক এবং এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ বস্তুর বিশেষ কোন গুণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে কোন বস্তু বা ঘটনাকে যেমন কারণ হিসাবে নির্দেশ করা চলে না, সেইরকম

২২৩। ‘তদ্ যদি সামান্তয়োঃ সম্বন্ধাবধারণম্, তদযুক্তম্, সামান্তানুপপত্তেঃ’, পৃঃ

১৫ ‘তদ্ যদি……সামান্তানুভবান্ন তয়োঃ সম্বন্ধঃ পৃঃ ৮৩

২২৪। সমং, পৃঃ, ১২

২২৫। ঐ, পৃঃ ১৩

জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী, মানুষের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ইত্যাদিও স্বাভাবিক-ভাবেই হয়। ‘অদৃষ্ট’ ‘ধর্ম-অধর্ম’ ইত্যাদিকে জগতের বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে স্বীকার করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নেই।^{২২৬}

“সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে” স্বভাববাদী চার্বাকদের অভিমতের এক বিবরণ আছে। এই মত অনুসারে শিখিপুচ্ছে নানা রঙের বৈচিত্র্য বা কোকিলের কণ্ঠে মধুর স্বরের সমাবেশ স্বাভাবিক যে নিয়মে হয়, মানুষের সুখ-দুঃখেও সেই নিয়মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। এসবের কারণ হিসাবে ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদির কল্পনা অসঙ্গত।^{২২৭} ‘অদৃষ্ট’ স্বীকারে চার্বাকদের আপত্তি; কারণ দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষের মাপকাঠিতে ‘অদৃষ্ট’ বিচারযোগ্য নয়। অদৃষ্টবাদীদের দ্বারাও অদৃষ্ট কখনও দৃষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায় না। তাছাড়া, বিশেষ কোন স্থানে বা কোন সময়ে দৃষ্ট হলেও এর অদৃষ্ট নামের সার্থকতা থাকে না। নিত্য অদৃষ্ট কোন বস্তুর সত্যকে যদি আমরা অনুমোদন করি তাহলে ‘শশশৃঙ্গ’ বা অনুরূপ অসম্ভব পদার্থের অস্তিত্বকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হয়।^{২২৮} আমরা আগেই দেখেছি যে ‘অদৃষ্ট’ ‘ধর্ম-অধর্ম’ ইত্যাদি ধারণা ভারতীয় আধ্যাত্ম দর্শনের অনুমোদিত কর্ম-ফলবাদের আবশ্যিক অঙ্গ। কাজেই এই ধারণাগুলির বিরোধিতার মাধ্যমে কর্মফলবাদও যে প্রকারান্তরে অস্বীকৃতি লাভ করে তা বলাই বাহুল্য।

অন্তান্ত চার্বাকী ধারণার মত স্বভাববাদও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় সমালোচনার বিষয়বস্তু। ‘অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈল্ক্যাদিদর্শনাৎ’ এই গ্রন্থস্থ^{২২৯} ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন স্বভাববাদের অনুরূপ যে চিন্তাধারার উল্লেখ পান জাগতিক ঘটনাসমূহের মূলে নিমিত্তের অবদান তাতে স্বীকৃত নয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যথা কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, রঙের বৈচিত্র্য ইত্যাদি যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে কারণের অপেক্ষা রাখে না, সেই রকম বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের দেহ প্রভৃতি বস্তু নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেই স্বরূপে পরিণতি লাভ করে। এই মতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার মন্তব্য করেন যে ভাবোৎপত্তির নিমিত্ত হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে অনিমিত্তকে, ফলে নিমিত্তকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে স্বভাববাদীরা অগ্রসর হয়েছেন

২২৬। ঐ, পৃ পৃ: ১২-৩, ৪৫, ৮০, ৮৫

২২৭। সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, ২।৪-৫

২২৮। ঐ, ২।২-৩

২২৯। ৪।১।২২

নিমিত্তেরই সাহায্য নিয়ে, যদিও এই নিমিত্ত হিসাবে তাঁরা অনিমিত্তকে ব্যবহার করেছেন।^{২৩০} স্বভাববাদীরা এক্ষেত্রে যে ধারণাকে অস্বীকার করতে প্রবৃত্ত সেই বিশেষ ধারণাই এখানে তাঁদের অবলম্বন। তাঁদের এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জায়বাতিকে উত্তোষক স্বভাববাদের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন—নিমিত্তের অভাব কণ্টকাদি বিশেষ কয়েকটি বস্তুর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য, না প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এর প্রয়োগ স্বাভাবিক? যদি কয়েকটি মাত্র বস্তুকে অনিমিত্ত মনে করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সব দ্রব্যের নিমিত্তমূলকতা প্রমাণিত হয়। অপর পক্ষে, প্রত্যেক বস্তু অনিমিত্ত—এ ধরনের স্বীকৃতিতে স্ববিরোধ দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ, স্বভাববাদের প্রচারকের এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অপরের মনে একটি বিশেষ ধারণা উৎপাদন করা। স্বভাববাদের সমর্থনে উৎপন্ন ধারণা নিমিত্তকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত। ফলে স্বভাববাদ এখানে ব্যাহত এবং কার্যের নিমিত্ত-মূলকতা শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য। কয়েকটি অংশের সমবায়ে গঠিত হবার ফলে কণ্টক প্রভৃতি দ্রব্য স্বরূপে পরিণতির জন্ত কারণের অপেক্ষা রাখে—চাৰ্বাক মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে জায়বাতিককার এই সিদ্ধান্তের অন্তর্কূলে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, কাণের উৎপত্তি বা ঘটনার সংঘটনেঃ মূলে কাণের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলে বিশেষ এক সময়ে কোন কাণ বা ঘটনা কেন উৎপন্ন বা সংঘটিত হয়, সব সময়ে হয় না—এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। স্বভাববাদের এই মূলগত ত্রুটি স্বভাববাদ বিরোধীদের অন্তঃ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মতবাদের আলোচনার সময় উদয়ন^{২৩১} বলেন যে কাণের উৎপাদন কারণের উপর নির্ভরশীল হলে তবেই তার বিশেষ কোন সময়ে আবির্ভাবের যৌক্তিকতা থাকে এবং এই জগৎ কাণের উৎপত্তির মূলে কারণকে অস্বীকার করার উপায় নেই। “জায়কুসুমাজ্জলি” ও তার টীকাকে অন্তর্গত করে এ সম্বন্ধে আরও বলা যায়—স্বভাব শব্দের অর্থ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য কাণের কিংবা কারণের। প্রথম সম্ভাবনায় উৎপত্তির পূর্বে কাণের এবং সেই সঙ্গে তার

২৩০। যতশোৎপত্ততে তন্নিমিত্তম। অনিমিত্তস্ত নিমিত্তত্বাননিমিত্তো
ভাবোৎপত্তিহিত্তি, জাভা, ৪।১।২৩

২৩১। জায়কুসুমাজ্জলি, ১।৫

বৈশিষ্ট্যেরও অস্তিত্ব না থাকায় স্বভাবের মাধ্যমে কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। স্বভাবকে যদি কারণের অস্তিত্ব বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্বভাববাদের সমর্থকেরা প্রকারান্তরে কারণবাদকেই স্বীকৃতি দেন এবং স্বভাববাদের কোন স্বাধীন সত্তা থাকে না।^{২৩২}

কার্যকারণবাদের বিরুদ্ধে চার্বাকদের অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট না হলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিবোধিতাপ্রসঙ্গে চার্বাকপ্রদর্শিত যুক্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। দুটি ঘটনার ক্রমিক সংঘটন একাধিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা গেলেই ঘটনা দুটির কার্যকারণভাবে সম্বন্ধের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অর্থোক্তিক। তবে এ জাতীয় ব্যাপার কার্যকারণ সম্বন্ধীয় ধারণার সূচনা করতে পারে এবং ঘটনা দুটি ভাল-ভাবে বিশ্লেষণ করার পর প্রথমটির মধ্যে দ্বিতীয়টির যদি বীজ দেখা যায় তবেই সেই ধারণা নিশ্চিত হতে পারে। কেবলমাত্র এভাবে উৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানই নিতুল অল্পমানের মাধ্যম হতে পারে। এই নিতুলতা সব অল্পমানে সম্ভব নয় এবং সেইজন্য অল্পমানের প্রামাণ্য চার্বাকদের অল্পমোদন লাভে বিধিত।

২৩২। স্বভাববাদ সম্ভবতঃ আদিতে স্বতন্ত্র মত হিসাবে ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিল। চার্বাক মতের সঙ্গে এই মতের একীকরণ পরবর্তী পর্বায়ে বলে অনেকের ধারণা (দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, পৃ: ১১৫)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১২ ; ৬।১) বিশ্বের আদি কারণ হিসাবে স্বভাব, যদৃচ্ছা, কাল, নিয়তি, পুরুষ ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। যদৃচ্ছাকে এখানে স্বভাব থেকে পৃথক করা হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী স্বভাববাদীদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, (১) যারা স্বভাবকে কারণের স্বীকৃতি দেন এবং (২) যারা কার্যকারণবাদের বিবোধী এবং মনে করেন যে জগতের সবকিছু ঘটনাই অহেতুক। দ্বিতীয় দলের স্বভাববাদীদের যাদৃচ্ছিক বলা হয়। (পৃ: ১১৪) কার্যকারণবাদের অস্বীকৃতির মাধ্যমে চার্বাকদের যে পরিচিতি তাতে এই দ্বিতীয় দলের স্বভাববাদীদের সঙ্গেই তাঁদের একাত্ম করা চলে। শাস্ত্রীমহাশয় অবশ্য স্বভাববাদীদের মতদ্বৈধ অল্পমায়ী চার্বাকগোষ্ঠীর মধ্যেও দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। (পৃ: ১১৬), যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি কোন তথ্য সরবরাহ করেন না।

অনুমানকে নিৰ্ভুল প্রমাণের যথাদা চাৰ্বাকবিরোধী শঙ্করাচাৰ্যও দেন নি। অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধানে অনুমানের পরিবর্তে ‘শব্দ’ বা আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর-
নৈল হবারই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য—জ্ঞানের
মধ্যম হিসাবে তিনটিই তাঁর কাছে স্বীকৃত হলেও সর্বশেষ প্রমাণটির উপর তিনি
সর্বাধিক প্রাধান্য দানের পক্ষপাতী। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণের অধিকারী
চাৰ্বাকেই আপ্তবাক্যকে প্রমাণের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত নন। কাজেই
অনুমানকে বর্জন করার ফলে তাঁদের জগৎ প্রত্যক্ষের গভীর মধ্যে সীমিত।

তাত্ত্বিক বিচারের দিক দিয়ে হয়ত অনুমান ক্রটিমুক্ত নয়, কিন্তু মানুষের
প্রাতীহিক জীবনে অনুমানের ব্যবহারিক উপযোগিতাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা
করা চলে না। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ অনুমানের সঙ্গে আপ্তবাক্যেরও এই ধরনের
ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৩৩} গ্রন্থকারের মতে
ধোঁয়ার উপস্থিতি থেকে আগুনের ধারণা করা বা ‘সপনের কাছ থেকে পাওয়া
বিবরণ অনুযায়ী ফলাধী ব্যক্তির ফলের অনুসন্ধানে বিশেষ কোন জ্ঞানাভিমুখী হওয়া
—এই জাতীয় প্রতিদিনের সাধারণ ব্যবহারের যৌক্তিকতা কেবল প্রত্যক্ষের
দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। “গায়কুশ্মাঞ্জলি” গ্রন্থে উদয়ন বলেন যে চাৰ্বাকী
যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত মানুষ যদি প্রত্যক্ষ বহির্ভূত সব বস্তুকে অস্বীকৃতি দেয়
তাহলে ব্যবহারিক জীবনে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।^{১৩৪}
“গায়মঞ্জরা”—কার জয়ন্ত ভট্টও এ প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেন।^{১৩৫} চাৰ্বাক
মতবাদের খণ্ডনে প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক উক্তি অনুসারে স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতি-
কালে চাৰ্বাক পত্নী বিধবা হন, কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের মাধ্যমে গৃহবহির্ভূত
চাৰ্বাকের বর্তমানতাকে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। উক্তিটি নিছক
পরিহাসধর্মী হলেও ব্যবহারিক জীবনের গতিপথে বিস্তৃত চাৰ্বাক-পন্থীর যে ধরনের
বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, এর মধ্যে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক জীবনের এই অনুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধহয় চাৰ্বাকদের
এক গোষ্ঠী অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে
এই প্রমাণের প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কমলশীল কর্তৃক আলোচিত

১৩৩। সঙ্গ, পৃ: ৭

১৩৪। গায়কুশ্মাঞ্জলি, ৩।৫, ৬

১৩৫। ‘অনুমানাপলাপ তু প্রত্যক্ষাদপি দুর্লভা। লোকযাত্রেতি লোকাঃ
স্থানিখিতা ইব নিশ্চলাঃ’ ত্যাম, ১ পৃ: ১১০।

এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত চার্বাক পুরন্দরের মতের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। জয়ন্ত ভট্ট তাঁর “শ্রায়মঞ্জরী”তে ‘শুশিক্ষিততর’ সংজ্ঞার মাধ্যমে সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের চার্বাকদের নির্দেশ করেছেন। এঁরা অহুমানকে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর মধ্যে একটিকে অহুমোদন করলেও অপরটি অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতিরিক্ত পদার্থগুলির অহুমানের ক্ষেত্রে এঁরা নিজস্ব চার্বাকী দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল।

অহুমানের বিরোধিতা করার সময় উপায় হিসাবে চার্বাকেরা অহুমান বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এর ফলে যে স্ববিরোধের উৎপত্তি হয়েছে বিতর্কধী পক্ষের সমালোচনায় অনেক ক্ষেত্রে তার উল্লেখ দেখা যায়। “শ্রায়পরিভুক্তি” গ্রন্থে^{২৩৬} চার্বাকী বিচারের এই ক্রটি প্রদর্শিত হয়েছে। চার্বাক সিদ্ধান্ত অহুসায়ে অহুমানের প্রামাণ্য নির্ণয় প্রত্যক্ষ মাধ্যমে সম্ভব নয়, নিতুল অহুমানের সাহায্যে নয়। যে অহুমানের আশ্রয় নিয়ে চার্বাকেরা অহুমান প্রমাণকে খণ্ডন করেছেন তা এইরকম—ব্যাপ্তি অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে সাধনের সঙ্গে সাধ্যের অবিনাভাবের ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়; কাজেই কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাধনের সঙ্গে সাধ্যের যোগে প্রামাণ্য হতে পারে না। অহুমানকে এইভাবে অবলম্বন করার ফলে তাঁর স্ববিরোধকে এড়াতে পারেননি।

“শ্রায়কুশুমাজলি” গ্রন্থে^{২৩৭} চার্বাকপক্ষের এই ক্রটি অত্যাধিকার আশ্রিত হয়েছে। চার্বাক মতে উপাধি-নিরাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কোন ক্রমে সম্ভব নয় কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে সাধ্যে উপাধির অভাব দৃষ্ট হলেও আশঙ্কা থেবে যায় যে অনাগত কালে অপর কোন স্থানে উপাধির অবস্থিতি সম্ভব হতে পারে চার্বাক পক্ষের এই জাতীয় ধারণার মূল ক্রটির উল্লেখ প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন যে ভবিষ্যৎ কালে বা দূর স্থানের অবস্থিতি প্রত্যক্ষসীমাবিহীন হওয়ায় অহুমানের সাহায্য ব্যতীত এগুলির জ্ঞান সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রমাণের রাজ্যে অহুমান বা মানসিক বিচারণাকে বর্জন কর চলে না। জ্ঞানের ভাঙারে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য বস্তুজগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতেই হয় এবং বস্তুকেন্দ্রিক এই উপকরণের সংব্রাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আশ্রয় করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে বিচার

২৩৬। শ্রায়পরিভুক্তি, পৃ পৃঃ, ২৪-৬

২৩৭। শ্রায়কুশুমাজলি, ৩৭

বিতৰ্কের সঙ্গে সম্পৰ্কবিহীন এই বাস্তব উপকরণ কতটা কাৰ্যকর তা বলা শক্ত। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বহির্জগতের যে ছাপ মনের উপরে পড়ে তাকে জ্ঞানের পৰ্যায়ে উন্নীত করতে মানসিক বিচারের যথেষ্ট অবদান আছে। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের রূপ নিয়ে যা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তা যে সব সময়ে বিস্তৃত প্রত্যক্ষ নয় এবং গোঁগভাবে হলেও অহুমান তার সঙ্গে কিছুটা মেশান—সেটা অগ্রাহ করার উপায় নেই। প্রমাণের ক্ষেত্রে অহুমানের আসন তাই চিরদিনই অবিচল, এ ব্যাপারে চাৰ্বাকী ধারণা বিপরীতধর্মী হওয়া সম্ভব।

নাস্তিক চাৰ্বাক দর্শনের মধ্যে হেতুবাদের পূর্ণ বিকাশের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। হেতুবাদের প্রধান উপজীব্য তর্ক। তর্ককে আমরা অনেক সময় অহুমানের রূপান্তর বলে মনে করি। ত্রায়ের পরিভাষায় কিন্তু তর্ক স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়, অত্র প্রমাণগুলির সঙ্গে অভিন্নও নয়। ত্রায়ভাণ্ডে তর্ককে প্রমাণসমূহের, প্রধানত : অহুমানেরই, অগ্রগ্রাহক বলা হয়েছে।^{২০৮} হেতুবাদ-মূলক যে তর্কশাস্ত্র অপরের বিচারে ক্রটি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত, অহুমান সেখানে নিঃসন্দেহভাবে প্রাধান্যের দাবী করতে পারে। চাৰ্বাক আচাশরা যখন অহুমানের বিরোধিতায় অবতীর্ণ তখনও অহুমানই যে অনেক সময় তাঁদের প্রধান মাধ্যম, তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কাজেই অহুমান খণ্ডনে চাৰ্বাকী প্রয়াস স্পষ্টতঃ স্ববিরোধাত্মক ভূমিকায় প্রকাশিত। হেতুবাদ তার চরম রূপে কতদূর অগ্রসর হতে পারে চাৰ্বাক পক্ষের এই প্রচেষ্টা তার সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য এই চাৰ্বাকী হেতুবাদের বোধ হয় তীব্রতম প্রকাশ “তদ্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও খণ্ডনের মাধ্যমে।

দেহাত্মবাদ

যে বৈশিষ্ট্য চাৰ্বাক দর্শনকে ভারতের অন্যান্য দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে তাকে দেহাত্মবাদ বা ভূত-চৈতন্যবাদ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যেতে পারে। চাৰ্বাক-অহুমোদিত বস্তুজগতের উপাদান চার তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং এই মৌল উপাদানের সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের স্বীকৃতির সঙ্গে চাৰ্বাকী ধারণার পার্থক্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই তত্ত্বগুলি চাৰ্বাকেতর ভারতীয় দর্শনে মহাভূত সংজ্ঞায় পরিচিত এবং অন্যান্য

২০৮। ‘তর্কো ন প্রমাণ সংগৃহীতো, ন প্রমাণান্তরম্, প্রমাণানামগ্রাহকস্তত্ত্ব-জ্ঞানায় কল্প্যতে’, শ্রাবা, ১।১।১

বহু তত্ত্ব বা বিষয়ের মধ্যে স্থূলতম হিসাবে পরিগণিত। ভারতের অন্ত্যন্ত দর্শনে অল্পমোদিত তত্ত্বগুলির পরিচয় এবং সংখ্যা দর্শন ভেদে বিভিন্ন। চার্বাক দর্শনের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেগুলির খুঁটিনাটি বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। যাই হোক, এই স্থূল বস্তুজগৎ ভারতীয় মতে মহাভূতের সমবায় গঠিত এবং এ বিষয়ে চার্বাক মতও ভারতের সাধারণ ধারণার সমধর্মী। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—চার্বাক-স্বীকৃত এই চার মহাভূতের উপাদানে যে বস্তুজগতের সৃষ্টি, সেই জগতের জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সাক্ষাৎভাবে হওয়া সম্ভব এবং সেইজন্মই চার্বাক দর্শনে এই ভৌতিক জগতের অন্তমোদন আছে।

অন্ত্যন্ত বস্তুর মত প্রাণীদেহও ভৌতিক উপাদানে গঠিত এবং সহজেই প্রত্যক্ষ-যোগ্য। কিন্তু প্রাণী সংজ্ঞায় ভৌতিক প্রাণীদেহ ছাড়া আরও কিছু অভিযুক্ত হয়, যা প্রাণীজগতের অন্ততম মানুষ হিসাবে ‘আমি’ এই অল্পভূতির মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করি। ‘আমি’ এই অল্পভূতির বিকাশ সচেতনতা বা চৈতন্যের পটভূমিতে এবং এই সচেতন ‘আমি’-কে কেন্দ্র করেই মানুষ বা যে কোন জীবের বৈশিষ্ট্য। এই সচেতন ‘আমি’র নানাভাবে বিচিত্র প্রকাশ দেহের মাধ্যমে, যার ফলে ভৌতিক উপাদানে গঠিত হয়েও জীবদেহ স্বকীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত এবং অল্প নানা ভৌতিক বস্তুর সঙ্গে এর প্রভেদ সহজেই বোঝা যায়। এই সচেতন ‘আমি’র নিজস্ব রূপ হিসাবে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে ভৌতিক জীবদেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অপর একটি তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবদেহে নিবদ্ধ এই তত্ত্বের নাম ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা, যা শুদ্ধ আত্মরূপের এক বিশেষ বা সংসারদশায় আবদ্ধ রূপ। এই জীবাত্মা প্রাক্তন কর্মের ভোগ ক্ষয় করার জন্ত বিশেষ এক ভৌতিক দেহের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই বিশেষ দেহে যে ভোগ সম্ভব তা সম্পূর্ণ করার পর দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। জীবাত্মার এই দেহত্যাগকে আমরা মৃত্যু সংজ্ঞায় অভিহিত করি। প্রাক্তন কর্মের সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই জীবাত্মাকে নূতন নূতন পরিবেশে ভিন্নজাতীয় ভোগের জন্ত নূতন নূতন দেহ ধারণ করতে হয় এবং এইভাবে চলতে থাকে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতের অধ্যাত্মদর্শন অহুসারে মৃত্যুর অর্থ জীবদেহের বিনাশ মাত্র, কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে জীবদেহে অধিষ্ঠিত এই আত্মা বিনষ্ট হয় না। স্থূল দেহের একটি থেকে অপরটির উদ্দেশ্যে তার যাত্রার দীর্ঘ গতিপথে এক বিশেষ অধ্যায়ের পরি-সমাপ্তি হয় মাত্র। স্থূল শরীর থেকে বহির্গত এই আত্মার আশ্রয় তখন সূক্ষ্ম-

শরীর। এই সূক্ষ্মশরীরের গঠন সম্পর্কে মতভেদ আছে। পঞ্চ তন্মাত্র নামে অভিহিত পঞ্চ ভূতের সূক্ষ্ম ভাগ সাংখ্যমতে এই শরীরে অন্তর্ভুক্ত।^{২৬৯} কিন্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যা ধরা পড়ে সেই পাঁচ বা চার স্থূল মহাভূতের যে এক্ষেত্রে কোনই অবদান নেই সে সম্বন্ধে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীরা সকলে একমত। স্থূল শরীরের বন্ধন ছিন্ন হলেই জীবাত্মার মুক্তি হয় না; প্রাক্তন কর্মের সংস্কারের বশে সূক্ষ্ম দেহে সে আবদ্ধ থাকে তার নিজস্ব মন, বুদ্ধি এবং পূর্বজন্মাজিত কর্মের সঞ্চয় ইত্যাদির সঙ্গে। এই সূক্ষ্মদেহধারী জীব আবার নূতন পরিবেশে নূতন স্থূল দেহে তার আবাস রচনা করে। জীবাত্মার এই পথ-পরিক্রমের অবসান হয় মুক্তির মাধ্যমে যখন ছিন্নবন্ধন এই আত্মা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপে বিলীন হয়।

দেহাতিরিক্ত এই আত্মার অহ্মোদন চাৰ্বাক দর্শনে নেই। চাৰ্বাক মতে মাহুষের মৃত্যু তাই ‘দেহত্যাগ’ নয়, দেহাবসানের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সত্তার অবসান।^{২৭০} চাৰ্বাকেরা প্রত্যেকগ্রাহ্য মহাভূতের উপাদানে গঠিত দেহকেই আত্মা বলেন। যে সচেতন ‘আমি’কে কেন্দ্র করে আত্মস্বরূপের প্রকাশ, সেই ‘আমি’ চাৰ্বাক মতে দেহের সঙ্গে অভিন্ন।^{২৭১} চাৰ্বাকদের বর্ণনায় এই ‘আমি’ তার প্রকৃত অর্থে প্রকাশমান ‘আমি গৌরবর্ণ’ ‘আমি স্থূল’ ইত্যাদি বাক্যে, যেখানে দেহের বিভিন্ন গুণ ‘আমি’ সংজ্ঞায় অভিহিত আত্মাতে আরোপ করা হয়। ‘আমি’ শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত ‘আমার দেহ’ ইত্যাদি বাক্যাংশে, যেখানে ‘আমি’ দেহ

২৬৯। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য, ৩।২, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৩।২২

২৭০। ‘তেষু বিনষ্টেষু সংসু স্বয়ং বিনশ্যতি,’ সদং, পৃ: ৩; ‘ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ’ ঐ পৃ: ১৪

২৭১। ‘তচ্চৈতত্ত্বাবিশিষ্টদেহ এব আত্মা,’ সদং পৃ: ৩, ‘ভূতচতুষ্টয়ং চৈতত্ত্বভূমিঃ,’ ষস, ৮৩; ‘দেহমাত্রং চৈতত্ত্বাবিশিষ্টমাত্ম্যেতি প্রাকৃত্য জনা লোকায়তিকাস্য প্রতিপন্ন।’ শাভা, ১।১।১; ‘দেহশ্চৈব চৈতত্ত্বমপীতি লোকায়তিকা: প্রতিপন্ন,’ ঐ ২।১।২; ‘চৈতত্ত্বাবিশিষ্টকায়: পুরুষ:,’ ঐ ৩।৩।৫৩; ‘ভূতানামেব চৈতত্ত্বমিতি প্রাহ বৃহস্পতি:,’ শ্রাস, ২, পৃ: ১০

থেকে পৃথক। চার্বাক মত অনুসারে এই বাক্যাংশগুলি ঔপচারিক, অর্থাৎ ‘আমি’ এ সব ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অর্থ প্রযুক্ত হয় না।^{২৪২}

যে সচেতন ক্রিয়াকলাপ আত্মগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক চার্বাকেরা তার উৎপত্তির ক্ষেত্র হিসাবে দেহকে নির্দেশ করে থাকেন। আত্মাকে দেহের গভীর মধ্যে সীমিত রাখার মূলে কার্যকর প্রত্যক্ষারিহিত প্রমাণে চার্বাকদের স্বীকৃতি নেই; কারণ, যে আত্মা দেহতে আশ্রিত নয়, সেই বিদেহ চৈতন্য প্রত্যক্ষের মাপকাঠিতে ধরা পড়ে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল থাকার জন্য স্বপক্ষ সমর্থনে অবশ্য যুক্তির সহায়তায় আসরে তাঁদের অবতীর্ণ হতে হয়েছে—কারণ, জড় মহাভূতের উপাদানে গঠিত দেহে অগ্র জড়বস্তুতে অবর্তমান চৈতন্যের অভিব্যক্তিতে কিছুটা অসঙ্গতি আছে, চার্বাকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে যার সুযোগ বিরোধীপক্ষের দার্শনিকেরা নিতে দ্বিধা করেননি—এবং যুক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে চার্বাক পক্ষ থেকে এর সমাধানের প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। কাজেই চার্বাকী নীতি অনুমানের বিরোধী হলেও এবং হুল দেহের অতিরিক্ত আত্মাকে অস্বীকার করার মূল এই নীতিতে নিহিত থাকলেও^{২৪৩} চার্বাক পক্ষের আশ্রয় এক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক অনুমান।

অপরপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখাও তাঁদের আত্ম-সম্বন্ধীয় ধারণার সমর্থনে যুক্তিকে বহুক্ষেত্রে টেনে এনেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাঁদের এ বিষয়ে স্পর্শনির্দিষ্ট ধারণার মূল আপত্তিক। কাজেই অনুমানকে যখন তাঁরা প্রমাণের আসনে বসান, তখন তা সব সময়ে সহজগ্রাহ্য হয় না, এবং কষ্টকল্পিত তাঁদের এই যুক্তিগুলিতে প্রচুর ত্রুটিও থেকে যায়। তর্কের আসরে নেমে বিরোধী-পক্ষকে পরাভূত করার ক্ষেত্রে এই ত্রুটির সুযোগ নিতে চার্বাকেরা মোটেই ইতস্ততঃ করেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রমাণের জগৎ থেকে অনুমানকে বহিস্কৃত করার মূলে যে ভাবনা সব শ্রেণীর চার্বাকদের মধ্যেই সাধারণভাবে কার্যকরী তা

২৪২। ‘মল্লক্যোহং হুলোহং কুলোহমিতি প্রত্যক্ষদ্বৈতচৈতন্য-
গুণাশ্রয়ো দেহ এব প্রমাতা,’ সর্বমতসংগ্রহ, পৃ: ১৫, ‘অহং হুলঃ...
সংভবেদৌপচারিকী,’ সমং পৃ: ৭, ‘দেহাত্মবাদে...সমানাধিকরণো-
পপত্তিঃ, ত্রৈ, পৃ: ৬; ‘হুলোহং তরুণো বুদ্ধো যুবেত্যাদিবিশেষণে :
বিশিষ্টো দেহ এবাত্মা ন ততোহন্তো বিলক্ষণঃ’, সর্বাসিদ্ধাস্তসংগ্রহ, ২।৬

২৪৩। ‘দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ, প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদি-
ত্যাগুমানাদেনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ’, সমং পৃ: ৩

হল এই যে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদির ধারণার ক্ষেত্রে অসম্মানের কোন উপযোগিতা নেই। ২৪৪

যাই হোক, এইভাবে আত্মপ্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের আসরে এক বিরাট তর্কযুদ্ধের সূচনা হয়, যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষই অবতীর্ণ হয়েছেন উপযুক্ত অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার অভিপ্রায় নিয়ে। চার্বাকী দেহাত্মবাদের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এই তর্কযুদ্ধেরই আলোচনা এবং বহুক্ষেত্রে নীরস হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

এই তর্কযুদ্ধে চার্বাকের প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম, স্থায়ী আত্মায় বিশ্বাসী অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখা ; দ্বিতীয়, বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়, যাদের ধারণায় স্থায়ী আত্মার স্থান অধিকার করেছে সচেতন অহুভূতির পরস্পরাবদ্ধ প্রবাহ। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য বা বিজ্ঞানকে দেহাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন আত্মবাদী দর্শনগুলির সঙ্গে একইভাবে চার্বাকী দেহাত্মবাদের বিরোধিতা করেছে এবং জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ের ধারণাতে এই দর্শন আত্মবাদী দর্শনগুলিরই সমগোত্রীয়। আত্মবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে চার্বাকী তর্কযুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় সাংখ্য, ন্যায়, জৈন, বেদান্ত ইত্যাদি চর্চনের আচার্য-দের রচিত পুস্তকে। বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে চার্বাকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ সংগ্রহীত হয় প্রধানতঃ শাস্ত্ররক্ষিত এবং কমলশীল প্রণীত “তত্ত্বসংগ্রহ” এবং “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা” গ্রন্থে। বস্তুতঃ উক্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধ আচার্যদ্বয় চার্বাক দর্শন প্রসঙ্গে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন, দেহাত্মবাদ সম্বন্ধীয় চার্বাকী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে তা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ। আমাদের বর্তমান আলোচনাতেও সেইজন্য এই বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি বহুক্ষেত্রেই আমরা সংগ্রহ করেছি।

অচেতন জড় মহাভূতের উপাদানে গঠিত দেহকে চৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকার করার সময় চার্বাকের স্থায়ী ধারণার সম্ভাব্য অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছেন একটি দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিয়ে। সূরা বা মদের উপাদান হিসাবে যে বিশেষ ধরণের বৃক্ষনির্গাসের ব্যবহার, তা মূলতঃ মাদকতাবিহীন হলেও পরে তাতে মাদকশক্তির উদ্ভব হয় এবং মেটা সূরা বা মদে পরিণতি লাভ করে ; অনুরূপভাবে

স্থূল মহাভূত যদিও প্রকৃতিগতভাবে চৈতন্যবজ্জিত, তাহলেও দেহরূপে পরিণত হবার পর এই স্থূল ভূতে চৈতন্যের বিকাশ দেখা যায়।^{২৪৫} “সর্বসিদ্ধাস্তসংগ্রহে” এ প্রসঙ্গে লোকায়ত বর্ণিত অপর একটি উপমার উল্লেখ আছে।^{২৪৬} নানা রকম উপকরণ মিশ্রিত তাহূল বা পানে যেমন উপকরণগুলির প্রত্যেকটির রঙ খেবে সম্পূর্ণ পৃথক রক্তবর্ণের উৎপত্তি, জড় মহাভূত থেকেও সেইভাবে ভিন্নধর্মী চৈতন্যের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে চার্বাকী সাহিত্যে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটির প্রচলন বোধ হয় ব্যাপকতর, কারণ চার্বাক সিদ্ধান্তের আলোচনা বা সমালোচনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এর প্রচুর উল্লেখ আছে। চার্বাকী সাহিত্যে এই উপমার ব্যবহারের ইঙ্গিত শাস্ত্রবিক্ষিপ্তের “তত্ত্বসংগ্রহ” গ্রন্থে পাওয়া যায়।^{২৪৭} “শ্রায়মঞ্জরী”-তে চার্বাক ব্যবহৃত এই দৃষ্টান্তের বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে—
 গুড়, পিষ্ট ইত্যাদি পদার্থ প্রাথমিক অবস্থায় মদশক্তিবহীন হলেও সুরার আকারে পরিণত এই বস্তুগুলিতে বিশেষ এই মদশক্তির যে ভাবে প্রকাশ, ঠিক সেইভাবে আদিতে চৈতন্যবজ্জিত মুক্তিকাদি চতুভূত শরীরাকারে রূপান্তরিত অবস্থায় চৈতন্য রূপ বিশেষ শক্তির দ্বারা যুক্ত হয়। এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ ভূতাত্ত্বিক দেহে কিছুকাল থাকে, যে সময়ে স্মৃতি, অনুসন্ধান ইত্যাদি সচেতন ব্যবহারের অভিযাত্রা এই দেহে দেখা যায়। কালাবসানে ব্যাধি ইত্যাদির দ্বারা এই শক্তি বিনষ্ট হতে দেহ পুনরায় অচেতন রূপ পরিগ্রহ করে।^{২৪৮}

২৪৫। ‘.....কিণাদিত্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যোভ্যো মদশক্তিবৎ’, সমং, পৃ: ৭; ‘মদশক্তিঃ সুরাঙ্গোভ্যো যদ্বৎ তদ্বৎ স্থিতমাত্মতা; বস, ৮৪, ‘অত্রৈকে দেহমাত্রাঽদশিনো লোকায়তিকা.....তেভ্যৈচৈতন্যং মদশক্তিবদ্ধিজ্ঞানং’, শাভা, ৩।৩।৫৩, ‘উক্তং চ, মদশক্তিবদ্ধিজ্ঞানমিতি’, শ্রায়, ২, পৃ: ১০

২৪৬। ‘জড়ভূতবিকারেষু চৈতন্যং যন্তু দৃশ্যতে, তাহূলপুগচূর্ণানাং যোগাঙ্গাণি ইবোথিকম’, ২।৭

২৪৭। ‘তস্মাদ্ভূতবিশেষেভ্যো যথা শুক্লসুরাদিকম, তেভ্য এব তথা জ্ঞানং জায়তে ব্যজ্যতেহথবা’, তত্ত্বসংগ্রহ, ১৮৫৮

২৪৮। ‘জ্ঞানাদি যোগস্ত ভূতানামেব পরিণাম বিশেষোপপাদিতশক্ত্যতিশয়-জুবাং.....ভবিষ্যন্তীতি’, ব্যাস, ২, ৩

সাংখ্যাচাৰ্য বিজ্ঞানভিক্ষু চাৰ্বাকপক্ষের এই দৃষ্টান্তে ক্রটি প্রদৰ্শনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বাইরে প্রকাশ না পেলেও সূক্ষ্ম মাদকশক্তি সূত্রের উপাদান হিসাবে বর্ণিত দ্রব্যগুলির মধ্যে বৰ্ত্তমান থাকে এবং এই শক্তি সমষ্টিগতভাবে পরে মাদকতা উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে। বিজ্ঞানভিক্ষুর সমালোচনা অবশ্য এক্ষেত্রে চাৰ্বাকী দৃষ্টান্তকে আঘাত করে না, কারণ চাৰ্বাকপক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর আসতে পারে যে সূত্রের উপাদানে বৰ্ত্তমান অদৃশ্য মাদকশক্তির মত জীবদেহের উপাদানেও আমরা প্রচ্ছন্ন চৈতন্যশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি। এ ধরনের চাৰ্বাকী প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানভিক্ষুও পরিহার করতে পারেন নি। কিন্তু যে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি একে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন, তাকে প্রকৃত যুক্তির পরিবর্তে পূৰ্ব স্বীকৃত ধারণার অলুপ্তকণই বলা চলে। যুক্তি এখানে আবরণমাত্র। তিনি বলেন যে জীবদেহ সমষ্টিগতভাবে যে ভৌতিক উপাদানে গঠিত সেই উপাদানের সমষ্টির প্রত্যেক অবয়বে সূক্ষ্মভাবে চৈতন্যের উপস্থিতি অল্পমান করলে বহুসংখ্যক চৈতন্যশক্তির অবস্থিতি স্বীকার করতে হয় এবং এতে যে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, সাংখ্য এবং সহযোগী অপর ভারতীয় দৰ্শনগুলির অমুমোদিত নিত্য এবং অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের কল্পনায় তা দূর হওয়া সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জীবদেহের উপাদানে ব্যষ্টিগতভাবে অদৃশ্য চৈতন্যশক্তির কল্পনা সমীচীন হয় না।

চৈতন্যকে যাঁরা দেহের গুণ বলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁরা এক্ষেত্রে ঘটের দৃষ্টান্তের অবতারণা করে দেখান যে জল আহরণ করা ইত্যাদি ঘটধর্ম ঘটের উপাদান মৃত্তিকাতে থাকে না। কিন্তু জীবদেহে সচেতনতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ দৃষ্টান্ত একান্তই দুর্বল এবং এটা গ্রহণ করার বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে ভৌতিক পদার্থে বিশেষ কোন গুণের সৃষ্টি সব সময়ে স্বজাতীয় কারণ গুণের সাহায্যে হয়। কাজেই উপাদান কারণে চৈতন্য না থাকলে দেহে চৈতন্যের উপস্থিতি অকল্পনীয়।^{২৪৯}

চৈতন্য এবং দেহের মধ্যে কার্যকারণভাবের বিद्यমানতা স্বীকার করার সময় বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলও অলুরূপ যুক্তির অবতারণা করেছেন। বিশেষ কোন গুণের কোন বস্তুতে সত্ত্বাবের পক্ষে কারণ না থাকলে বস্তুটিকে ঐ বিশেষ গুণের সঙ্গে কার্যকারণসম্বন্ধে আবদ্ধ করা যেতে পারে না, যে জন্ত আশ্রমে আমরা

শৈত্য আরোপ করতে পারি না। জ্ঞান এবং দেহের কার্যকারণতাব দিহির পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকায় চার্বাক-অভিপ্রের্ত এই কার্যকারণতাবের পক্ষে কোন যুক্তি নেই।^{২৫০}

এই প্রসঙ্গে “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”তে সাধারণভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিচারিত হয়েছে। কোন একটি বস্তুর বর্তমানতায় উপলব্ধি লক্ষণযুক্ত অথচ পূর্বে অদৃশ্যপদক অপর একটি পদার্থ যদি উপলব্ধিগোচরে আসে, তাহলে প্রথম বস্তুটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা যেতে পারে।^{২৫১} এই কার্যকারণতার বিচার অন্তর্ভাবেও করা চলে। দুটি বস্তু বা ঘটনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় যদি দেখা যায় যে প্রথমটির ভিতর দ্বিতীয়টির উৎপাদনের উপযোগী বিভিন্ন উপাদানের বর্তমানতা সম্বন্ধে বিশেষ একটি উপাদানের অভাবে দ্বিতীয়টির আবির্ভাব সম্ভব হয় না, সম্ভাবে হয়, তাহলে যে বিশেষ উপাদানের সম্ভাবে দ্বিতীয়টি উৎপন্ন হয় তাকেই দ্বিতীয়টির কারণ হিসাবে নির্দেশ করা উচিত, অপরগুলিকে নয়।^{২৫২} যে কোন দুটি পদার্থের পারস্পরিক কার্যকারণতাবের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা এই সম্ভাব এবং অভাবগত উভয়বিধ মানেই প্রথমে বিচার করা প্রয়োজন। একমাত্র এই উপায়ের মাধ্যমেই কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে সেই উপাদানকে যার বিশেষ উপস্থিতি আলোচ্য কার্যগুলিকে উৎপন্ন করেছে।

কমলশীলের মতে দেহকে মনোগত বিজ্ঞানের কারণ হিসাবে নির্দেশ করার ব্যাপারে এই উভয় প্রকার মানের প্রয়োগ সম্ভব নয়। সম্ভাবগত মানে বিচারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভ্রূণ অবস্থায় দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধের বিষয়ে কিছু বলা অসম্ভব, কারণ ভ্রূণের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় না। যে কোন বস্তু পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে এই বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অপর প্রাণীর মন কেউ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম নয়, কাজেই সে ক্ষেত্রেও দেহ এবং মনের কার্যকারণ সম্বন্ধের বিচার করা চলে না। অভাবগত মানের সম্ভাব্যতার বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে শরীরের বিনাশের সঙ্গে একযোগে মনেরও বিলোপ

২৫০। ‘যদ্ব যদ্যবসিদ্ধৌ ন কিংচিৎ প্রমাণমস্তি ন তত্র তদ্যাবহারঃ প্রেক্ষাবতা কাঃ, যথা বক্তা শীতব্যবহারঃ। নাস্ত চ বুদ্ধির্দেহয়োঃ কাযকাবণ-ভাবসিদ্ধৌ কিংচিৎ প্রমাণম্,’ তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃ: ৫২৫

২৫১। ‘যেহামূলন্তে সতি উপলব্ধি লক্ষণ প্রাপ্তম্ পূর্বমদৃশ্যপদকম্ সদ্ উপলভ্যতে তেহোমম্ অশ্বনৈয়ম্,’ তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃ: ৫২৫

২৫২। ‘সৎস্ব তদন্তোয় সমর্থেষু তদ্বৈতু যস্মৈকাত্মতাবে ন ভবতীত্যেবং আশ্রয়নায়ম্,’ তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃ: ৫২৬

হয় কিনা কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, সে শরীর নিজেই হোক বা অপরেরই হোক। মৃতদেহে গতিশীলতার অভাব থেকে মৃত ব্যক্তির মনোগত বিজ্ঞানের বিনাশ কল্পনা করা অসঙ্গত। কারণ, অপর কোন হেতুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে পরিহার করা চলে না, যা মৃত্যুর পরেও বর্তমান এই ধ্যানসিক বিজ্ঞানকে মৃতদেহে সচলতা সৃষ্টির পথে বাধা দেয়। কমলশীল এ ব্যাপারে বৌদ্ধ মত ঘোষণা করে বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে প্রাণীদেহে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বর্তমানতা প্রাণীটির মৃত্যুর পরেও অনশ্বীকার্য। কিন্তু এই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব দেখেও মৃত প্রাণীর দেহে সচলতার অভাবের কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে ঐ বিশেষ দেহটিকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানগত বাসনা ও অবিচার রূপায়ণের যে প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনবোধ তখন লুপ্ত এবং সেইজগৎই দেহটিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বিজ্ঞানটির তখন আর থাকে না।

প্রসঙ্গক্রমে ‘জ্ঞান’ শব্দটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ব্যবহারিক জগতে কোন বিষয় বা বস্তুকে জানার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। বহির্জগতের কোন বস্তুর বিশেষ রূপ যখন আমাদের অস্ত্রলোকে প্রতিভাত হয়, তখন আমরা সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। ভারতের অধ্যাত্মদর্শন অনুসারে জ্ঞানের এই সব ব্যক্তিগত প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মচৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি; বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে কণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ এই ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয়। কিন্তু এ বিষয়ে উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই একমত যে মনের এই সচেতন অভিব্যক্তিকে জড় দেহের সঙ্গে একাত্ম করা চলে না এবং এদের উৎপত্তির কেন্দ্র হিসাবে বাহ্যবস্তুনির্দেশক চৈতন্যের বৃহত্তর প্রবাহকে নির্দেশ করা উচিত।

বৌদ্ধ দার্শনিক শাস্ত্ররক্ষিত এবং কমলশীল তাঁদের “তত্ত্বসংগ্রহ” এবং “ভব্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা”-তে যখন লোকায়ত মত নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত তখন বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে ‘জ্ঞান’ ‘মনোধী’ ‘মনোবুদ্ধি’ ইত্যাদি শব্দেরই তাঁরা ব্যবহার করেছেন চৈতন্য, ‘আত্মা’ ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা চার্বাক মতের বিবরণ দিয়েছেন কথলাখতর নামে এক লোকায়তিকের মত উদ্ধৃত করে। এই মত অনুসারে প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর দ্বারা অধিষ্ঠিত দেহ জ্ঞানের আশ্রয়।^{১৫৩}

২৫৩। ‘কারাদেব ভতো জ্ঞানং প্রাপ্যাপানাত্তধিষ্ঠিতাং, যুস্মং জায়ন্ত ইত্যেভ্যং কথলাখতরোদিভুস,’ তত্ত্বসংগ্রহ, ১৮৬৪

কিন্তু চার্বাক মতে জ্ঞানের একমাত্র প্রকাশ অর্থাবগতির মধ্যে।^{২৫৪} ‘অর্থ’ এখানে বাহ্য বিষয়ের দ্ব্যাতক এবং ‘অর্থাবগতি’ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্য বস্তুর প্রকাশনাকে বোঝায়। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর রূপ আমাদের অবগতিতে আসে এবং সেই রূপ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। অন্তরূপভাবে কর্ণ ইত্যাদি অগ্র ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা বাহ্য বিষয়ের শব্দ ইত্যাদি জ্ঞাত হই। চার্বাক মতে এই অর্থাবগতি যেখানে নেই জ্ঞানেরও সেখানে অভাব। সেইজন্য স্থপ্তি বা মুচ্ছা অবস্থাতে জ্ঞানের অস্তিত্ব লোকায়তরা স্বীকার করেন না। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশনার মধ্যেই চার্বাকে জ্ঞানের সীমানা নির্দিষ্ট রাখেন।^{২৫৫}

এই মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে কমলশীল বলেন যে আমাদের স্বপ্নাবস্থার জ্ঞানের উপযুক্ত কারণ চার্বাকী বিবরণে নিগূত হয়নি। স্বপ্নে আমরা যা দেখি ইন্দ্রিয় বা বাহ্য অর্থের উপস্থিতি ব্যতীতই তা আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থার এই জ্ঞানকে মনোবিজ্ঞান বলা চলে। এই মনোবিজ্ঞান স্বনির্ভর এবং ইন্দ্রিয় অথবা বাহ্য বস্তুর কোন অপেক্ষা রাখে না। স্বপ্নে বা অগ্র অবস্থায় এই স্বনির্ভর বিজ্ঞানের সুপরিষ্কৃত অস্তিত্ব থেকে বিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থাবগতির মাধ্যমে প্রতিভাত—লোকায়তদের এই উক্তি নিরর্থক প্রমাণিত হয়।

কমলশীলের বিবরণী পাঠে বোঝা যায় যে স্থপ্তি, মুচ্ছা ইত্যাদি অবস্থাতে চিন্তের স্ববেদনানুপলব্ধ বা অনুপলব্ধিই চেতনার তৎকালীন অবর্তমানতার সিদ্ধান্তে চার্বাকদের উপনীত হতে সাহায্য করেছে। স্বসংবেদনের অনুপলব্ধির মূলে আছে উদাহৃত অবস্থান্তরিতে সংবেদনার আন্তর্ভে নিশ্চয়তাবোধের অভাব। কমলশীলের মতে চিন্তের স্বসংবেদন সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তাবোধের অভাব চার্বাকদের এই ধারণার ভিত্তি, সেই অভাবই প্রকৃতপক্ষে স্থপ্তি, মুচ্ছা ইত্যাদি অবস্থায় চিন্ত বা মনের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে।

শাস্ত্ররক্ষিত এবং কমলশীলের রচনায় এ প্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ আলোচনা আছে যেখানে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য উত্তর এবং সেই উত্তরগুলিরও প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ হয়েছে। চার্বাক পক্ষ থেকে বৌদ্ধমতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে আপত্তি দেখান হয় যে, জাগরিত অবস্থায় আমরা নিদ্রা বা মুচ্ছাকালীন বিজ্ঞানকে যে স্মরণ করতে পারি না তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে নিদ্রাগত বা মুচ্ছিত অবস্থায় বৌদ্ধস্বীকৃত

২৫৪। ‘ন চার্বাকবগতেরন্যত্রুপং জ্ঞানস্ত যুজ্যতে,’ তত্ত্বসংগ্রহ, ১৮৬৬

২৫৫। ‘ইন্দ্রিয়ার্থবলোদ্ধৃতং সর্বং বিজ্ঞানম্,’ তত্ত্বসংগ্রহপত্রিকা, ১২২১

বিজ্ঞানের সম্ভাব্য ধারণা শ্রান্ত। শাস্ত্রয়ুক্ত উত্তরে বলেন যে অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অস্পষ্টতা এই অস্বরণের প্রকৃত কারণ। কমলশীল এ প্রশ্নকে স্বপক্ষের বক্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেন। নিদ্রা বা মূচ্ছাভাঙ্গণ পর মাহুঘের যে প্রথম বোধ হয় তার জনক বাহুবন্তনিস্বপ্নে এই কারণ বিজ্ঞান, 'নিদ্রা বা মূচ্ছা' অবস্থাতেও যাব অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। পূর্ব অভিজ্ঞতাব স্মরণকালে পুষ্টিতর উদ্ভবের সময়েও এই কারণ বিজ্ঞানেরই কাষকাৰিতা দেখা যায়। কমলশীল আরও বলেন যে স্থপ্তি, মূচ্ছা ইত্যাদি অবস্থায় এ ধরনের কোন বিজ্ঞানের যদি অস্তিত্ব না থাকত তাহলে এ অবস্থাগুলি মৃত্যুর সমপৰ্যায় হুত হত।

হিন্দু লোকায়তবাদীরা এ প্রশ্নকে বলতে চান যে উদাহৃত 'বাস্তবশক্তি' বিজ্ঞানের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মৃত্যু হয় না, কাশ্য জাগরণকালে আবার সম্পূর্ণ নূতন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। উত্তরে 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে' বলা হয়েছে যে, এভাবে নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকাৰ করলে মাহুঘের মৃত্যু কোন রকমেই ব্যাখ্যা করা চলে না। কারণ নূতন বিজ্ঞানের উদ্বেকে যেভাবে মাহুঘের নিদ্রা বা মূচ্ছা ভঙ্গ হয়, সেইভাবে তার মৃত অবস্থারও অবসান হতে পারে এবং এভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় জীবিত হবার পথে কোন বাধা থাকে না।^{১৫৬}

মোট কথা, সম্পূর্ণ স্বল্প মানসী বুদ্ধি বা মনোগত বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় অথবা বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা না রেখেই স্বীয় অস্তিত্বে বিভাজমান^{১৫৭} —চাৰ্বাক মতের বিরোধিতা প্রশ্নকে বৌদ্ধ দার্শনিকদ্বয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁরা বাস্তবে অসম্ভব অংকাশ-কুসুম ইত্যাদি ধারণার উদাহরণ দেন। এই জাতীয় জ্ঞানের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর যোগগুলিকে কখনই নিদেশ করা চলে না এবং চিত্তস্থিত পূর্ববর্তী এক ধারণার কাষকাৰিতা সব সময়ে এই জ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করে। সে ধারণার অল্পপস্থিতিতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সংযোগে কোনক্রমেই এ জ্ঞান সম্ভব হয় না।^{১৫৮}

দেহ যদি এই মনোবুদ্ধির উৎস হত তাহলে দেহগত বৈকল্যের বলে মানসিক

২৫৬। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১২২৮-৩০

২৫৭। 'স্বতন্ত্রা মানসী বুদ্ধিচক্ষুরাত্তনপেক্ষণাৎ, যোগাদানবলেনৈব স্পষ্টাদাবিব বর্ততে', তত্ত্বসংগ্রহ, ১২২৯

২৫৮। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১২৩১-২

বিজ্ঞানেরও বিকলতা দেখা যেত। এ ছাড়াও হস্তী ইত্যাদি বৃহৎ শরীরধারী জীবের মানসিক ক্ষমতার কাছে ক্ষুদ্রতর অবয়ব বিশিষ্ট মানুষের মনের শক্তি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হত। কমলশীল এ প্রসঙ্গে যুক্তি দেখান যে একটির পরিবর্তন বা তার তত্ত্বের উপর অপরটির পরিবর্তন বা তার তত্ত্ব নির্ভরশীল না হলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা চলে না। স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের স্ফুটনের বিরোধী চার্বাকেরা যদি ইন্ড্রিয়সমষ্টি যুক্ত দেহভেদেই কেবল মনের কারণতা আরোপ করেন, তাহলেও তাঁদের মত গ্রহণ যোগ্য হয় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে যে কোন ইন্ড্রিয়ের হানি হলেই মানসিক শক্তির বৈলক্ষণ্য দেখা দিত। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এর বিপবীত সাক্ষ্যই বহন করে। পক্ষাঘাত ইত্যাদি ব্যাধিতে কর্মক্ষমতাগুলির সব রকম কাঙ্ক্ষমতা বিনষ্ট হলেও মন তার পূর্ণ শক্তিতে সজীব থাকে।^{২৫৯} আবার অনেক সময় শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও মানসিক প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক অবস্থা মানসিক ভাবে কিছুটা প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে মনের বিনাশ শরীরের বিলোপের উপর নির্ভরশীল।

চার্বাকেরা হয়ত বলতে পারেন যে দেহ এবং মনোবিজ্ঞানের সহস্থিতি দেহকে এই বিজ্ঞানের কারণ হিসাবে চিন্তা করার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যেমন দেহের সঙ্গে সব সময়ে একত্র অবস্থান করে, দেহও সেইরকম মানসিক জ্ঞানের সঙ্গে সর্বদা একত্রবর্তী, কাজেই যে যুক্তিব বলে দেহ মনের কারণ হিসাবে নির্দেশিত, সেই একই যুক্তির প্রভাবে মনোবিজ্ঞানও দেহের কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কমলশীলের মতে কেবলমাত্র সহ-স্থিতি থেকেই কাঙ্ক্ষারণতার বিচার অযৌক্তিক, কারণ, দুটি পদার্থের সহস্থিতিভাবের মূলে তৃতীয় অপর একটি পদার্থের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা চলে না। কাজেই বিজ্ঞানের দেহমূলকতা সন্দেহ চার্বাকী ধারণা বোদ্ধ মতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেহ বিনষ্ট হলেও এই বিজ্ঞানের লুপ্ত হবার কোন আশঙ্কা নেই বলে বোদ্ধ দার্শনিকেরা মনে করেন।^{২৬০}

২৫৯। ‘প্রস্থাপ্তব্যায়োগাদিনা কার্যেন্দিয়াদীনামূপঘাতোঃপি মনোধীর বিকৃত্তে কাবিকলাং স্বসত্ত্বামমুভবতী,’ ভদ্রসংগ্রহপঞ্জিকা, ১৯৩৪, পৃঃ ৫২৭

২৬০। ভদ্রসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ ৫২৭-৮

ভাৰতের অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা চাৰ্বাকী অভিমতকে প্রতিহত করার জন্যই এক্ষেত্রে ‘বিজ্ঞান’ বা ‘মনোবুদ্ধি’ পদের পরিবর্তে ‘চৈতন্ত’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। জীবদেহ যে জীবচৈতন্তের উৎস ভাব সম্বন্ধে চাৰ্বাকদের যুক্তি এঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পরে অপক্ষীয় যুক্তির সাহায্যে এই চাৰ্বাকী যুক্তি প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রধানতঃ বৈদান্তিক শঙ্করাচাৰ্য এবং নৈয়ায়িক আচাৰ্যদের বিবরণীকে কেন্দ্র করে এ ব্যাপারে আমরা আলোচনায় আগ্রহের হব।

শঙ্করাচাৰ্যের “ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে” এ প্রদত্ত চাৰ্বাকপক্ষের যে যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি যুক্তি অল্পদূরে চৈতন্ত থেকে ইচ্ছা, ধ্বেষ ইত্যাদি যে মনো-বৃত্তিগুলির উদ্ভব, সেগুলি আমাদের শরীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি সব কাজে প্রেরণার উৎস হওয়ায়, চৈতন্তকে শরীরের ধর্ম বলে স্বীকার করা উচিত। এ ব্যাপারে চাৰ্বাকী অন্য একটি যুক্তির বিবরণ শঙ্করাচাৰ্যের গ্রন্থে আছে। যুক্তিটি এই রকম—কোন বস্তু বর্তমান থাকলে যা দৃশ্য, কিন্তু বস্তুটি অবর্তমানে যা অদৃশ্য, তাকে ঐ বস্তুর ধর্ম বা গুণ বলে ধরে নিতে হয়। উষ্ণতা, দীপ্তি ইত্যাদিকে অগ্নিধর্ম বলা চলে এই যুক্তিই অনুসরণে, কারণ, আগুনের উপস্থিতিতেই এদের বর্তমানতা, আগুন না থাকলে নয়। প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্ত, স্মৃতি ইত্যাদি সচেতনতার যে সব প্রকাশকে আত্মবাদী দার্শনিকেরা আত্মার ধর্ম বলে মনে করেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে দেহতেই বর্তমান এবং দেহের অনুপস্থিতিতে এদের কোন আন্তর্য থাকে না, কাজেই এগুলি দেহেরই ধর্ম, দেহব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নয়।^{২৬১}

কোন একটি বস্তুর বর্তমানতার সঙ্গে আর একটির উপস্থিতি জড়িত থাকতে দেখা গেলেই প্রথম বস্তুটিকে দ্বিতীয়টির কারণ হিসাবে নির্দেশ করা চলে না। কাজেই উপরের যুক্তির অনুসরণে সেই গুণগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী গুণান্তর অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতে দেখা যায়। শ্যামবর্ণ ও রক্তবর্ণ এইভাবে দ্রব্যবত্তী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গুণ। প্রতিদ্বন্দ্বী এই উভয় গুণেব এক দ্রব্যে একই সময় অবস্থান সম্ভব নয়। সেইজন্য কোন একটি গুণ দ্রব্য থেকে বিলীন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর গুণের দ্রব্যে আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দেয়—অগ্নিপাককে উপলক্ষ্য করে ঘটগত শ্যামবর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী রক্তবর্ণে রূপান্তর লাভ করে। চৈতন্তকে কিন্তু দ্রব্যগত এই ধরনের গুণগুলির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ, চৈতন্তের প্রতিদ্বন্দ্বী এমন কোন গুণ দেখা যায় না যার সঙ্গে চৈতন্তের সহাবস্থান

সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে চৈতন্য শরীরের গুণ হলে বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত শরীর অবশ্যই চৈতন্যযুক্ত থাকত, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের সঙ্গে এ ধারণার সঙ্গতি থাকে না। কাঙ্ক্ষেই চৈতন্যকে দেহের ধর্ম বলে স্বীকার করা চলে না।

ভাস্কর্যকার আরও বলেন যে প্রাণী অঙ্গের সর্বত্রই চৈতন্যের ব্যাপ্তি দেখা যায়—হস্ত, পদ ইত্যাদি প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গবই সচেতন। শরীর চৈতন্যের উৎপত্তিস্থল হলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গবই স্বস্থানবর্তী চৈতন্যের জনক হত এবং এর ফলে একই শরীরে বহু চৈতন্য সৃষ্টির প্রসঙ্গকে পরিহার করা সম্ভব হত না। প্রতিদেহবর্তী প্রাণীর বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কিন্তু চেতনার এক একা প্রকাশ পায় যার ফলে মানুষের এক বিশেষ অবয়ব, হস্ত, যে প্রেরণার বশবর্তী হয়ে খাচ্চ-দ্রব্য স্পর্শ করে, তার রসনা সেই প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণী দেহের প্রতিটি অঙ্গের এ ধরনের এক্যবদ্ধ সঙ্গতিপূর্ণ কাজের ব্যাখ্যা এক দেহে বহু চৈতন্যের স্বীকৃতিতে সম্ভব নয়।

বাৎসায়ন এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে বস্তুবিশেষের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক গুণকেই বস্তুটির স্বধর্ম বলে নির্দেশ করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উষ্ণ কোন আধার-স্থিত জলের সঙ্গে যুক্ত তরলতা এবং উষ্ণতা, এই গুণ দুটির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জলের স্বধর্ম প্রথমটি, দ্বিতীয়টি নয়, কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে জলে উষ্ণতা দেখা গেলেও ভিন্ন আধারস্থিত জলে তা অদৃশ্য। জলের সঙ্গে এইভাবে বহু-ক্ষেত্রে যুক্ত হলেও উষ্ণতা প্রকৃতপক্ষে আগুনের স্বধর্ম। অল্পরূপভাবে দেহের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে যুক্ত থাকার নির্দশন থেকেই চৈতন্যের দেহধর্মতার অন্তর্কূলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন হয় না। দৃষ্টান্তস্থিত উষ্ণতা যেমন জল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আগুনের ধর্ম, চৈতন্যকেও সেইরকম দেহ থেকে পৃথক আত্মার স্বভাব বলা চলে। শরীরের স্বধর্ম হিসাবে বাৎসায়ন কৃষ্ণ, গৌর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দেহবর্ণের উল্লেখ করেন, যার অস্তিত্ব প্রাণীদেহে সব সময়েই থাকে, এমন কি মৃত প্রাণীর শরীরেও। আগুনের সঙ্গে উষ্ণতার একত্র বর্তমানতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে চার্বাকেরা যখন দেহকে চৈতন্যের কারণ হিসাবে নির্দেশ করেন, তখন তাঁদের উপস্থাপিত দৃষ্টান্ত স্পষ্টতঃই ত্রুটিমুক্ত হয় না। উষ্ণতা এবং দীপ্তির সঙ্গে আগুনের যোগ সব সময়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে এগুলি আগুনের স্বধর্ম বা স্বভাব, কারণ স্বভাব তার আশ্রয়কে কখনও পরিত্যাগ করে না। চৈতন্যের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কিন্তু অল্পরূপ নয়। চৈতন্য সব সময়ে দেহকে কেন্দ্র করেই বিকশিত এবং দেহ অবর্তমানে চৈতন্য ও অদৃশ্য—চার্বাকপন্থের এ বক্তব্য অস্বীকার্য নয় বটে, কিন্তু মৃত্যু বা সংজ্ঞাহীনতার

কবলিত অচতেন দেহের অস্তিত্বও সকলের কাছে সুপরিচিত। কাজেই উচ্ছৃঙ্খলতায় সঙ্কে আগুনের আভাবিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত চৈতন্যের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

চাৰ্বাকদের সমালোচনা করার সময় চাৰ্বাকী যুক্তির এই ক্রটির উল্লেখ অনেকেই করেছেন। সাংখ্যাচাৰ্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে মৃত্যুর পরে এবং অগ্নি নানা অবস্থায় দেহের মধ্যে চৈতন্যের যে অভাব দেখা যায় তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে চৈতন্য দেহের আভাবিক ধর্ম নয়।^{২৬২} ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়নও চৈতন্যবঞ্চিত মরণোত্তর দেহের সাক্ষ্য থেকে চৈতন্যের দেহধর্মতার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করেন। এই মতের বিরোধিতাপ্রসঙ্গে দেহাত্মবাদীদের পক্ষ থেকে যে ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে সে সম্বন্ধেও ন্যায়ভাষ্যে আলোচনা আছে। তাঁরা হয়ত বলতে পারেন যে প্রাণীদেহে চৈতন্যের মত ঘটে যে জ্ঞান রূপের প্রকাশ, সেই রূপও ঘটদেহে চিরকাল থাকে না। অগ্নিদগ্ধ ঘট এই রূপ সম্পূর্ণ রূপে অস্তিত্বহীন হয়। কিন্তু তা সঙ্কেও এই রূপকে ঘটের উপাদানের ধর্ম বলতে কারও দ্বিধা নেই। অল্পরূপভাবে চৈতন্যকেও ভৌতিক উপাদানে গঠিত জীবদেহের ধর্ম বলে স্বীকার করতে অসম্মত হওয়া উচিত নয়।

আপত্তির উত্তরদান প্রসঙ্গে বাৎসায়ন^{২৬৩} বলেন যে উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি এ ক্ষেত্রে সঠিক প্রযোজ্য নয়। ঘটের জ্ঞানতার যে বিলুপ্তি দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে অবস্থার রূপান্তর মাত্র। অগ্নিদগ্ধ ঘট বর্ণের পরিবর্তন হয়—জ্ঞানবর্ণ রক্তবর্ণে পরিণতি লাভ করে। মৃত প্রাণীদেহে চৈতন্যের যেভাবে সম্পূর্ণ অবলোপ হয়, অগ্নিদগ্ধ ঘটদেহে জ্ঞানতার অবসান সেভাবে হয় না। এ ক্ষেত্রে বাৎসায়ন শরীরস্থিত চৈতন্যের সঙ্গে প্রব্যগত জ্ঞানতা ইত্যাদি গুণের প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করেন।

অজ্ঞানদের মত অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শঙ্করাচাৰ্যও মরণোত্তর প্রাণীদেহে সচেতন অভিব্যক্তির অল্পস্থিতির সাক্ষ্য থেকে চৈতন্যের দেহধর্মতার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন।^{২৬৪} সেই সঙ্গে দেহ অবর্তমানে চৈতন্যের অভাব সম্বন্ধে চাৰ্বাকী সিদ্ধান্তকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে রঙ, আকার ইত্যাদি

২৬২। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৩।২১

২৬৩। ন্যায়ভাষ্য, ৩।২।৪৬-৫৫

২৬৪। শান্তা, ৩।৩।৫৪

দেহধর্মগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সকলের প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি সকলের অতুভবগ্রাহ্য নয়। তা সত্ত্বেও প্রাণীর জীবিতকালে প্রাণীদেহে ঐগুলির উপস্থিতি সাধারণভাবে সকলের স্বীকৃত। দেহ ধ্বংস পাবার সঙ্গেই চৈতন্য ইত্যাদিও বিনষ্ট হয়—চার্বাকদের এ ধারণার মূলেও শঙ্করাচার্য প্রমাণের কোন সমর্থন পান না। চার্বাকী সিদ্ধান্তের অমূল্য প্রমাণের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে শঙ্করাচার্য ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের অমূল্যাদি ঐ ঐতিহ্যমানের ভিত্তিতে আত্মা স্ব.ক স্বীয় অভিমতকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে দেহস্থিত এই চৈতন্যের বিনাশ নেই এবং এই চৈতন্যই আত্মা সংজ্ঞায় অভিধেয়। সাধারণতঃ দেহের সঙ্গে যুক্ত অবস্থাতেই কেবল আত্মা আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত, কিন্তু এ থেকে দেহের বাইরে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

চার্বাকী ভূতচৈতন্যবাদের নিরসন প্রসঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের দার্শনিকেরা স্বসমর্থিত আত্মসম্বন্ধীয় মতবাদের অবতারণা করেছেন—দেহধারী জীবের মধ্যে সচেতনতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার ব্যাপারে স্বপক্ষীয় মতের উপ-যোগিতাই যে একমাত্র স্বাকার্য, তা ব্যক্ত করা এ ক্ষেত্রে তাঁদের অভিপ্রায়। জয়ন্তভট্টের “শ্রায়মঞ্জরী”-তেও এইভাবে চার্বাকী ধারণার বিপরীত অধ্যাত্মবাদী ধারণা উপস্থাপিত করা হয়েছে।^{২৬৫}

চার্বাকপক্ষের মতকে প্রতিহত করে স্বপক্ষীয় অভিমতকে এইভাবে উপস্থাপিত করার সময় জয়ন্তভট্ট ভূতচৈতন্যবাদের সমর্থনে চার্বাকী যুক্তির এক বিবরণ দিয়েছেন।^{২৬৬} চার্বাকদের মত হলো বুদ্ধি বা চৈতন্যের বিকাশ শরীরের সম্যক পরিপুষ্টির উপর নির্ভরশীল। ভোজন, পান ইত্যাদির দ্বারা দেহ পুষ্ট থাকলেই চৈতন্যের নতেন্দ্র স্মৃতি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মীয়ত অথবা অন্য ঐশ্বর্যাদি দেবনের ফলে বালকের মধ্যেও যথেষ্ট প্রজ্ঞার সঞ্চার হতে দেখা যায়। অপর পক্ষে অপুষ্ট শরীরে বুদ্ধি বা চৈতন্য সম্যক বিকশিত হতে পারে না। আবার দধি, আদ্র পরিবেশ ইত্যাদি ভৌতিক দ্রব্যের বিবিধ সংস্থান নানাবিধ কৃষি পতঙ্গাদির

২৬৫। ‘ব্যাপকত্বাদাত্মনঃ সর্বত্র ভাবে.....যৎক্ষিৎদেতৎ’, শ্রায়, ২, পৃ: ১৩

২৬৬। ‘ভূতেশ্বর্যপানাদ্যপযোগপুষ্টেষ্ণু পাট, চৈতন্য ভবতি তদ্বিপর্ক্যে বিপর্যয়ঃ, ব্রাহ্মীযত্বাদ্যপযোগসংস্কৃতে চ কুমার শরীরে পটুপ্রজ্ঞতা জায়তে’, শ্রায়, ২, পৃ: ১৩

উৎপত্তির কারণ হয়। চার্বাকদের মতে ভৌতিক দ্রব্য থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি সমর্থনে এই কারণগুলিকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলে না।

ভৌতিক দেহকে চৈতন্তের উৎপত্তিস্থল হিসাবে গণ্য করার কারণ হিসাবে চার্বাকেরা শরীরের মাধ্যমে চৈতন্তলক্ষণযুক্ত ইচ্ছা, ঘেব ইত্যাদির আরম্ভ এবং নিবৃত্তির উল্লেখ করেন। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চার্বাকী এই যুক্তির বিবরণ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। গ্রায়সূত্র এবং তার ভাষ্যে^{২৬৭} ভূত-চৈতন্তবাদীদের এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্তি আছে। জয়ন্তভট্ট শরীরের সঙ্গে চৈতন্তকে একাত্ম করার চার্বাকী এই প্রয়াসের বিরোধিতা করার সময় শরীরের নিত্য পরিবর্তনশীলতার বিষয় উল্লেখ করেছেন।^{২৬৮} জীবদেহ প্রতি পদে রূপান্তরিত হয়, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি দশাভেদে। একের দৃষ্ট বিষয় যেমন অপরকে স্মরণ করতে দেখা যায় না এবং একের স্মৃতি বা অনুভবকে অপরের ইচ্ছার কারণ বলা চলে না সেই রকম ভূতচৈতন্তবাদকে স্ব কৃতি দিলে জীবদেহের কোন অবস্থায় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের স্মরণ সেই একই জীবের অন্ত অবস্থায় ব্যাখ্যা করা যায় না এবং স্মৃত কোন বিষয় থেকেও পরবর্তী অবস্থার দেহে অভিব্যক্ত ইচ্ছাদিকে উৎপন্ন বলা চলে না। কাজেই প্রাণী চৈতন্তের যে ঐক্য পরম্পরাবদ্ধ অর্থবিজ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিভাত, শরীরের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যেও যা অভিন্ন এক জীবের পরিচিতি বহন করে, ভূত-চৈতন্তবাদের সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই।

স্বতন্ত্র আত্মার ধারণায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের প্রতিপক্ষ হিসাবে যে চার্বাকপক্ষ এতক্ষণ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, চৈতন্তধর্মী আত্মা সেই চার্বাকদের মতে দেহের সঙ্গে অভিন্ন। এই শ্রেণীর চার্বাকেরা ছাড়া আত্মগত ধারণার ভিত্তিতে আরও তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত চার্বাকদের বর্ণনা সদানন্দের “বেদান্তসার” গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ আগেই করেছি। “বেদান্তসারের” অভিমতে দৃষ্টিভঙ্গীর ভারতময় অনুযায়ী চার্বাকী বৃহৎ গোষ্ঠির মধ্যে

২৬৭। ন্যায়সূত্র, ৩।২।৩৮ ; ‘পাণ্ডিবাণ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীর-পামারন্তনিবৃত্তি দর্শনাদিচ্ছাদেবজ্ঞানৈর্যোগ ইতি চৈতন্তম্’, গ্রায়ভাষ্য।

২৬৮। গ্রাম, ২, পৃ: ১০ (‘শরীরং চ বাল্যাণ্ডবস্থাভেদেন ভিন্নমতন্তস্ত নাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি সন্তানান্তরবদ্ যথা হি দেবদত্ত দৃষ্টেইর্ষে যজ্ঞদত্তস্ত ন-স্মরণমেবং বাল শরীরান্তহৃত্তে যুবশরীন্ত তন্ন স্মৃত্যং’)

বিভিন্ন স্তর বিজ্ঞান আছে এবং এই স্তরের প্রকারভেদ অনুসারে চার্বাকেরা স্থূলতম বিষয় থেকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে ধারণায় সমর্থ, যদিও বেদান্ত-অভিপ্রের্ত নুষ্টিদানন্দরূপী শুদ্ধ আত্মস্বরূপ এঁদের প্রত্যেকেরই অবগতির বহির্ভূত। এই বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত চার্বাকদের মধ্যে দেহাত্মবাদীরাই স্থূলতম ধারণার অংশীদার এবং বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় এই দেহাত্মবাদী বা ভূতচৈতন্যবাদীরাই উল্লিখিত হয়েছেন। জয়স্তুভট্ট তাঁর গ্রন্থে আত্মসম্বন্ধায় আলোচনার প্রসঙ্গে ভূতচৈতন্যবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয় চৈতন্যবাদ এবং মনশ্চৈতন্যবাদ এই দু'ধরনের মতের উল্লেখ করেছেন।^{২৬৯} সদানন্দের বর্ণনায় ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিব সঙ্গে যারা আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করেন সেই চার্বাকদের ধারণা চিত্রিত হয়েছে। এই মতবাদগুলির কোনটাই অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের আত্মসম্বন্ধীয় ধারণার সমগোষ্ঠীয় নয় এবং “ন্যায়মঞ্জরী” গ্রন্থেও এই মতবাদগুলির বিরোধিতা করা হয়েছে।^{২৭০}

জয়স্তুভট্ট তাঁর আলোচনার ‘হুশিক্ষিত’ এই বিশেষণের মাধ্যমে আর এক শ্রেণীর চার্বাকদের পরিচিতি দিয়েছেন যাদের মতে আত্মা ‘প্রমাতৃতত্ত্ব’, স্থূল দেহ থেকে ভিন্ন। সন্তোজন ব্যবহারের সব কিছু এই আত্মা বা ‘প্রমাতৃতত্ত্ব’ এই শ্রেণীর চার্বাকেরা আরোপ করেন, কিন্তু এই আত্মার স্থায়িত্ব তাঁদের অভিমত অনুযায়ী শরীরের স্থায়িত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারে না এবং দেহনাশের পর এই আত্মার বর্তমানতা এবং দেহান্তর পরিগ্রহ হুশিক্ষিত চার্বাকেরা স্বীকার করেন না।

এই চার্বাকগোষ্ঠী সম্বন্ধে আর কোন বিস্তারিত বিবরণ অপর কারও রচনায় পাওয়া যায় না। দেহকে চৈতন্যের উৎস যে শ্রেণীর চার্বাকেরা বলেন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী। হসাবে দেহকে চৈতন্যের অভিব্যক্তির মাধ্যমরূপে বর্ণনাকারী অপর এক শ্রেণীর চার্বাকের উল্লেখ কমলশীলের “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”-তে আছে এবং সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চার্বাকেরা জয়স্তুভট্ট বর্ণিত ‘হুশিক্ষিত’ চার্বাকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম। সদানন্দের “বেদান্তসার” উল্লিখিত প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন আত্মার ধারণায় বিশ্বাসী চার্বাকদের মধ্যে এই চার্বাকগোষ্ঠীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত আছে কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না।

২৬৯। ন্যায় ২, পৃ: ১৩-৪

২৭০। ‘ভেনেচ্ছাস্থত্বকৃতিহুঃখবেদনামাধারো ন থলু মনো ন চেন্দ্রিয়ানি, দেহোহপি ব্রহ্মতি ন তৎসমাত্ময়ত্বং ভেনান্য পুরুষমতঃ প্রকল্প্যামঃ’,
ন্যায়, পৃ: ১৪।

জয়ন্তভট্ট বৰ্ণিত এই ‘সুশিক্ষিত’ চাৰ্বাকেরা আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমণের বিরোধিতা করেছেন। এঁরা বলেন যে এ জাতীয় পরিক্রমণ সম্ভব হলে শৈশবে অল্পভূত পদার্থের মত জন্মান্তরে অল্পভূত পদার্থেরও স্মরণে কোন বাধা থাকত না এবং আমরা বিগত জন্মের ঘটনাগুলির স্মৃতিও অনায়াসেই বহন করতে সমর্থ হতাম। কিন্তু জন্মান্তরের ঘটনা স্মরণ করতে মাত্ৰষকে দেখা যায় না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে শরীর নাশের পর শরীরস্থিত প্রমাতারও অস্তিত্বের লোপ হয়।^{২৭১}

‘সুশিক্ষিত’ বিশেষণে ভূষিত চাৰ্বাকেরা আত্মাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার না করায় ভারতের অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের বিচারে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী দেহাত্মবাদী বৃহৎ গোষ্ঠীর তুলনায় নিঃসন্দেহে উন্নততর। কিন্তু তাহলেও ভারতীয় অধ্যাত্মধারণার এঁরা সম অংশীদার নন কারণ এঁদের অহুমোদিত প্রমাতৃত্ব দেহ থেকে পৃথক হয়েও দেহেরই সমকালীন বিনাশের কবলে পতিত হয়। জয়ন্তভট্টের বিবরণীতে এই চাৰ্বাকদের মতবাদে কটি দেখান হয়েছে। নৈয়ায়িদের কাষকাঃপভাবে বিশ্বাসী এবং জয়ন্তভট্টের মতে যে কোন সং বস্তুর বিনাশ কল্পনা করতে হলে বিনাশের মূলে নির্দিষ্ট কোন হেতু বা আগে স্বীকৃতি হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবে যাকে সং বা বর্তমান বলে স্বীকার করা যায়, কারণ না থাকলে তাকে বিনষ্ট বলে ঘোষণা করা খযৌক্তিক।^{২৭২} নৈয়ায়িক আচার্য নানাভাবে বিচার করে দেখাতে চান যে আত্মার বিনাশের কোন কারণ আবিষ্কার করা সূকঠিন।

অহুমানের মাধ্যমে এই আত্মার বিনাশের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ‘সুশিক্ষিত’ সংজ্ঞায় বিশেষিত চাৰ্বাকদের অভিমত হলো আত্মা জড দেহ থেকে পৃথক। কাজেই জড় বস্তুর ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে আত্মার ক্ষঃসের কারণ অহুসজ্ঞান করা যেতে পারে না। জড বস্তু নচয় প্রধানতঃ অবয়বী, অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়ব বা অংশের সংযোগে এদের উৎপত্তি এবং এই অবয়বের বিনাশই এদের

২৭১। ‘যদি হ্যেবং ভবেত্তদ্বিহ শরীরে শৈশবদশাগুভূতপদার্থস্মরণবদভৌত-
জন্মাগুভূতপদার্থস্মরণমপি তস্ম ভবেন্ন হি তস্ম.....তস্মাদ্ধ্বঃ
দেহান্নাস্ত্যেব প্রমাতা’, ন্যায়, পৃঃ ৩২

২৭২। ‘ন চাস্তিষ্যাবিনাশাবী ভাবানাং বিনাশঃ স্বাভাবিকঃ কিন্তু হ্যেবন্তর-
নিমিত্তকঃ’, ন্যায়

বিনাশের হেতু। এ ধরনের অবয়বের বিভাগ ছড় বস্তু থেকে ভিন্ন আত্মাতে সম্ভব নয়। দ্রব্যাদির গুণ যেমন আশ্রয়দ্রব্যের বিনাশের সঙ্গে লুপ্ত হয়, আত্মার সেই ধরনের বিনাশও অসম্ভব নয়, কারণ আত্মাকে দ্রব্যবিশেষের গুণ বলা চলে না। কাজেই স্থল দেহের ধ্বংসের সঙ্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার বিলোপের কোন যোগ নেই এবং অন্য হেতু অবর্তমানে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সমকালীন এই আত্মার বিনাশের কল্পনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।^{২৭৩}

জয়ন্তভট্টের মতে দেহাতিরিক্ত এই আত্মার বিনাশ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও বিবোধী। আত্মার ধ্বংস কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষের গোচরে কখনও আসেনি, যদিও মৃত দেহটির ক্ষেত্রে এ জাতীয় অভিজ্ঞতা খুব সাধারণ, কারণ অগ্নিদাহ বা হিংস্র পশুর আক্রমণের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে মৃতদেহকে প্রায়ই দেখা যায়।

জয়ন্তভট্ট পরিশেষে মন্তব্য করেন যে প্রত্যক্ষ এবং যত্নমান, এই উভয়বিধ প্রমাণের যে কোনটিই মাধ্যমে দেহনাশের সমকালীন আত্মার বিলোপের সপক্ষে ‘সুশিক্ষিত’ চার্বাকদের অভিমত গ্রাহ্য হতে পারে না। কাজেই ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে অমুমোদিত নিত্য প্রমাতা বা আত্মার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।^{২৭৪}

প্রকৃত পক্ষে চার্বাক দর্শনে যে কোন গোষ্ঠীব সঙ্গে ভাবতীয় অধ্যাত্মদর্শনেব মৌল বিভেদ আত্মার অমরত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। আত্মার অমরত্বের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত চার্বাকেতব ভাবতীয় দর্শনগুলির অমুমোদিত জন্মান্তরবাদ ও পরলোকতত্ত্ব। দেহাতীত যে আত্মা দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় না একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব পুনরায় নূতন জন্মে এবং নূতন পরিবেশে ভিন্ন দেহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা। আত্মার অমরত্বে চার্বাকদের কোন সম্মতি নেই। জীবদেহে অব্যক্ত চৈতন্যে তাঁরা যে নশ্বরতার ছাপ দেন তা জন্মান্তরবাদের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।^{২৭৫}

এ ব্যাপারে চার্বাকদের সমালোচনায় তৎপা দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই আত্মার

২৭৩। ‘ন চ বিনাশহেতুঃ প্রমাতরি চিরমপি, বিচারমাণঃ কশ্চিংকুভাশ্চিদ বাপ্যতে.....’

২৭৪। ‘তন্মাদজি নিত্যঃ পরলোকে প্রমাতেতি’, গ্রাম পৃ পৃ: ৩২-৪০

২৭৫। ‘সবলোকাইনোভাবাৎ পরলোকাভাবঃ’, তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা (১৮৫৮) তে উদ্ধৃত লোকাযত সূত্র, চার্বাক মতে দেশান্তর, অবস্থান্তর বা কালান্তরকে পরলোক বলা যায়, ঐ পৃ: ৫২৩

কণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণার বিরোধিতা করেছেন আত্মার অমরত্ব এক অবিদ্যমানত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণার বিবরণী দিয়ে।

চার্বাকের ভারতীয় দর্শনের অন্ত গোষ্ঠীর মত বৌদ্ধদর্শনও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদের এই বৌদ্ধ ধারণা চার্বাকদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে এই দুই গোষ্ঠীর পারস্পরিক তর্কযুদ্ধের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় শাস্ত্ররক্ষিতের “তত্ত্বসংগ্রহ” গ্রন্থে এবং কমলশীলকৃত ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে। বৌদ্ধরা আত্মার পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানসম্মতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেন এবং এই বিজ্ঞান তাঁদের মতে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়—এগুলির কোনটার মাধ্যমেই উৎপন্ন হয় না। এই বিজ্ঞান সম্মতির অন্তর্গত যে কোন বিজ্ঞানের জনক ঠিক তার পূর্ববর্তী অপর একটি বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের কারণরূপে নির্দেশ করা চলে অল্পরূপ আর একটি বিজ্ঞানকে। এইভাবে প্রতিটি বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে পূর্ববর্তী অপর বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে শিশুমনের আদি বিজ্ঞানের কারণরূপেও কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্বের ধারণা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের ভিত্তি এই ধারণাতে। বৌদ্ধরা শিশুমনের আদি চেতনার কারণ হিসাবে পূর্ববর্তী জন্মের অস্তিম বিজ্ঞানকে নির্দেশ করেন। এই উভয় বিজ্ঞান অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ থেকে বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখে। এইভাবেই গড়ে ওঠে প্রতিটি জন্মের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অপর জন্মগুলির অস্তিত্বের ধারণা।

পূর্ববর্তী জন্মের অস্তিম বিজ্ঞান একমাত্র তখনই পরবর্তী জীবনের বিজ্ঞানের উৎস হয় যখন তা রাগ, ঘেব ইত্যাদি ধর্মের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। সম্পূর্ণভাবে বীতরাগ ব্যক্তি পুরাতন দেহের বন্ধন ছিন্ন হবার পর নূতন দেহের বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হন না। অল্প মাহুঘের ক্ষেত্রে পূর্বতন জীবনের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত রাগ, ঘেব ইত্যাদি মানসিক ধর্ম পরবর্তী জীবনে শিশুমনে সংক্রামিত হয়।

চার্বাক মতে দেহই জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় এবং দেহনাশের সঙ্গে দেহাশ্রিত এই জ্ঞানেরও সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। বৌদ্ধরা যখন পূর্বজন্মের মরণকালীন চিন্তা বা বিজ্ঞানকে পরবর্তী জন্মের প্রারম্ভিক বিজ্ঞানের কারণ বলেন—অথবা বর্তমান দৃশ্যমান দেহে যে সচেতনতার অভিব্যক্তি তার সঙ্গে অতীত কোন দেহের বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করেন, তখন চার্বাকেরা তার মধো যুক্তির কোন সমর্থন পান না। প্রথমতঃ, পূর্বজন্মবর্তী যে দেহের অবসানকালে জ্ঞাত বিজ্ঞানকে বৌদ্ধরা বর্তমান দেহের বিজ্ঞানের সঙ্গে কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করতে

অভিলাষী, সেই দেহের অস্তিত্বই চার্বাক মতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বার
অসমর্থিত।^{২৭৬} দুটি বিভিন্ন দেহবর্তী বিজ্ঞানকে একই বিজ্ঞান প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত
করার বৌদ্ধ প্রচেষ্টাতেও চার্বাকেরা ত্রুটি খুঁজে পান। তাঁরা বলেন যে
ভিন্নদেহবর্তী গজ ও অশ্ব অথবা বরাহ ও মহিষের চিত্তকে আমরা কখনও
একই বিজ্ঞানসত্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না, কারণ এক প্রবাহবর্তী চেতনার
ভিন্নদেহ আশ্রয় করার ধারণা অযৌক্তিক। অমূরুপভাবে ইহলোকবর্তী এবং
পরলোকগত দেহ পরস্পর ভিন্ন হওয়ার ফলে সেই দেহান্তর্গত বিজ্ঞানগুলিকেও
এক অভিন্ন প্রবাহভুক্ত করা চলে না।^{২৭৭}

চার্বাকী গ্রন্থ “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে”^{২৭৮} বৌদ্ধ ক্ষণিকসন্তানবাদের যে আলোচনা
এবং সমালোচনা লিপিবদ্ধ আছে, এ প্রসঙ্গে চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে তা কিছু
আলোকপাত করতে পারে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ মতের যে বর্ণনা আছে, সেই মত
অনুসারে মানবমনে আবিলুপ্ত যে কোন জ্ঞানের জনক অব্যবহিত পূর্ববর্তী অপর
একটি জ্ঞান, যে জ্ঞানের অপেক্ষায় পরবর্তী জ্ঞানকে দ্বিতীয় জ্ঞান বলা চলে।
বিজ্ঞানবাদিত এই নিয়মকে অনুসরণ করে জন্মের পবমুহূর্তে উৎপন্ন মানুষ্যেব আদি
বিজ্ঞান বা প্রারম্ভিক চেতনাকে তাঁরা দ্বিতীয় জ্ঞান বলেন এবং এই দ্বিতীয় জ্ঞানের
কারণ হিসাবে তাঁরা নির্দেশ করেন পূর্বজন্মের মরণকালীন চেতনাকে। পূর্ব-
জন্মের অস্তিম্ব বিজ্ঞানকে বর্তমান জন্মের আদি বিজ্ঞানের সঙ্গে এক সন্তানে আবদ্ধ
করলে তবেই মানুষ্যের প্রাথমিক চৈতন্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় বলে তাঁরা
মনে করেন, অন্যভাবে নয়।

চার্বাক মতে জ্ঞানমাত্রই জ্ঞানপূর্বক—বৌদ্ধদের ঐ যুক্তি অনুসরণ করলে যে

২৭৬। ‘কার্ষকারণতা নাস্তি বিবাদপদ্যচেতসো’ শুদ্ধসংগ্রহ, ১৮৬০ ‘ন
হি মরণানন্তরবপয়ো দেহ উৎপাদ্যমানো দৃষ্টে। ন চাদৃষ্টাস্তিত্ত্ব
নিশ্চয়ঃ যুক্তঃ। তত্ত্বাসদ্যবহার বিষয়ত্বাৎ,’ ঐ ১৮৬২ পঙ্খিকা।

২৭৭। ‘ন চৈকসন্তান বতিনোক্ষেতসো দেহান্তর সমাশ্রয়ণং যুক্তম্, গজবাজ্যা-
দিচিহ্নবদেকসন্তান-সম্বন্ধিত্বহানি প্রসঙ্গাৎ’ ঐ, ১৮৭০, অত্র যদুস্তং
চার্বাকেন—ইহলোক পরলোক—শরীরয়োভিন্নত্বাত্তদগতয়োরাপি চিত্ত-
য়োর্নৈকঃ সন্তান ইত্যাদি।…………মহিববরাহাদি—বিজ্ঞানবাদিত্তি,
ঐ, ১৯৩২, পৃঃ ৫৮৮

২৭৮। তত্ত্বোপপ্লবসিংহে, পৃঃ ৫৭

কোন বোধাত্মক কার্যের মূলে অববোধাত্মক কারণের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু বোধাত্মক কারণ ছাড়াই, কেবলমাত্র রূপবান বস্তু, আলোক এবং নয়নের একত্র সংযোগে দর্শন ইত্যাদি বোধাত্মক কাণ্ডের আবির্ভাব দেখা যায়। মানব-মনের আদি বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি অস্বরূপভাবে ভৌতিক দ্রব্যের সংঘাতের ফল বলে কল্পনা করা উচিত। এর জন্য পূর্ববর্তী অপর বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রসঙ্গে ‘তত্ত্বোপপ্লবঃসংগ্ৰহে’ বলা হয়েছে যে কারণ হিসাবে একমাত্র তাকেই নির্দেশ করা চলে যার সঙ্গে কাণ্ডের অব্যবহিত পরস্পরাসংগ্ৰহে যোগ থাকে। যে বস্তুর উপস্থিতি সাক্ষাৎভাবে অপরিদৃষ্ট তা কারণ হতে পারে না।

বৌদ্ধরা হয়ত বলতে পারেন যে সদৃশ বস্তু থেকেই কেবল অপর সদৃশ বস্তুর আবির্ভাব সম্ভব, অসদৃশ বস্তু থেকে নয় এবং এইজন্যই আদি বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে হলে পূর্ববর্তী অপর বিজ্ঞানের অস্তিত্বের বহুলা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কিন্তু চার্বাকেরা বলেন যে এই যুক্তির অনুসরণে ধোঁয়ার কারণ হবার যোগ্যতা কেবল ধোঁয়ারই থাকে, আগুনের নয়। যদি বলা হয়, ধোঁয়া এবং আগুন উভয় বস্তুই ‘রূপরূপতা’ এই ধর্মে সদৃশ, অর্থাৎ দুটি বস্তুই রূপ আছে, যা একটিকে অপরটির কারণ হবার যোগ্যতা দিচ্ছে, তাহলে চার্বাক পক্ষ থেকেও ভূত এবং বিজ্ঞান উভয়ই সদৃশ ধর্ম হিসাবে ‘স্বলক্ষণরূপতাকে’ নির্দেশ করা চলে, অর্থাৎ দুটি বস্তু নিজস্ব লক্ষণযুক্ত রূপে প্রকাশমান এবং এই সদৃশ ধর্মের ভিত্তিতেই একটি অপরটির কারণ হিসাবে নির্দেশিত হতে পারে। বৌদ্ধরা আপত্তি প্রসঙ্গে বলতে পারেন যে ভৌতিক পদার্থ বিজ্ঞানের মতই স্বালক্ষণ্যে অবিচল থাকলেও ভৌতিক বস্তুতে বিজ্ঞানরূপতা নেই, যে কারণে বিজ্ঞানের উপাদান কারণ হবার যোগ্যতা ভৌতিক পদার্থে থাকতে পারে না। এর উত্তরে চার্বাকেরা বলেন যে এ যুক্তি গ্রহণ করলে আগুনও ধূমের উপাদান কারণ হতে পারে না, কারণ আগুনের মধ্যে ধূমরূপতার অভাব। কাজেই আগুনকে ধোঁয়া ধোঁয়ার কারণ রূপে নির্দেশ করেন, ভূতসংঘাতকে বিজ্ঞানের জনক বলতে তাঁদের কোন বাধা থাকতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের তর্কযুক্তির কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমারেখা টানা যায় না এবং ভূতচৈতন্যবাদীদের সঙ্গে জ্ঞানান্তরবাদের সমর্থকদের যে সংঘর্ষ তারতীয়া দর্শনের ক্ষেত্রে হৃদয়কাল ধরে প্রসারিত তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের যোদ্ধারা বিজয়ী সম্মান দাবী করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষের

তর্কবাদের আক্রমণে তাঁরা পরাভূত। প্রকৃত কথা হলো অজ্ঞাত বহু-বিষয়ের মত জন্মান্তরবাদও ভারতীয় দর্শনে যুক্তির পথ দিয়ে প্রবেশ করেনি।

জন্মান্তরবাদ ছাড়াও জন্মান্তরবাদের সঙ্গেই অজ্ঞেয় বন্ধনযুক্ত আবহ চার্গেও ভাবতীয় দর্শনজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি অপর একটি ধারণার বিষয় আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কর্মফলবাদ নামে পরিচিত এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মজীবনের স্তম্ভ স্বরূপ। জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে মাধ্যমে জীবের যে ভোগবৈচিত্র্য তার কারণ হিসাবে ভারতের দর্শনে কর্ম-বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবের প্রাক্তন কর্মের ক্ষয় একমাত্র ভোগের মাধ্যমেই হতে পারে, এবং এই ভোগের বিভিন্নতা ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পূর্বকৃত কর্মের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। দেহধারী জীবের পক্ষেই কেবল এই বিচিত্র ভোগ সম্ভব এবং সেইজন্য ভোগের মাধ্যমে প্রাক্তন কর্মের সংস্কার ক্ষয় করার জন্য বিশেষ পরিবেশে বিশেষ শরীরে মানুষকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভারতের অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা তাই শরীর স্থিতির উপাদান হিসাবে পঞ্চমহাভূতকে স্বীকৃতি দিলেও এ ব্যাপারে মহাভূতের স্বতন্ত্র কারণতা অন্তর্মোদন করেন না। তাঁদের মতে পঞ্চভূত থেকে জীবদেহের উৎপত্তি মূলে কাঙ্ক্ষণী বীবেদ পু কৃত বন্দন সংস্কারের প্রেরণা। ২১৯

জন্মান্তরবাদে অবিস্মৃতি চা করে আভাবিক কারণেই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে সমন্বয়ে গাথা কর্মফলবাদকে স্বীকৃতি দিতেও অসম্মত। অধ্যাত্মবাদীরা যেখানে পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত বস্তুনিচয়কে তাত্ত্বিকক্রমে গোণ মধ্যাদা দেন নাতিব চারাবদেব বিবেচনায় সেখানে ভৌতিক স্থল পদার্থের মুখ্য ভূমিক জাগতিকক্রমে এবং এই জড় ভূতের উপাদানে গঠিত দেহ থেকেই উৎপন্ন জাগতিক অপরাপার তত্ত্ব, মন, বুদ্ধি চৈতন্য ইত্যাদি। ন্যায়সূত্রভাষ্যে ন্যাস্তক মতের এবং

২১০ পূর্বসূত্র ১৩ ৪-২২পর্ব, আবেশ, ৩২ ৩, আবেশদর্শন মতে
 ৩১১। এখানে ভোগবৈচিত্র্যের ২১ বস্তুনিচয় নিম্ন
 (‘দৃষ্টা চ জন্মান্তরানি: -উচ্চাভিধনো নিকৃষ্টাভিধন ইতি, প্রসক্ত
 নিম্ন ভাবিত, ব্যাধিবহনমরোগমিতি ... সুশ্রুত জন্মভেদোৎপত্তি
 মেঘ:। সৌন্দর্য জন্মভেদ: প্রত্যাক্ষানিষতাৎ কর্মভেদাৎপপত্ততে’
 জাভা, ৩, ২১৭১)

বিবরণীতে ভাণ্ড্যকার নাস্তিকদের এই মনোভাবের উল্লেখ করেছেন।^{২৮০} নাস্তিকেরা জীবদেহস্থিতিতে জীবের অস্থিতিত প্রাক্তন কর্মের নিমিত্ততা স্বীকার করেন না। শর্করা, পাষণ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে যেভাবে নানা ধরনের মূর্তির নির্মাণ, প্রাণীদেহও তাঁদের মতে ঠিক সেই ভাবেই বিভিন্ন ভৌতিক উপাদানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে কর্মফলবাদের অন্তর্ভুক্তির মূল যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণায় সে দৃষ্টিভঙ্গী চাৰ্বাক দর্শনে অল্পপস্থিত। এ কারণেই আজ্ঞা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদির মত এই ধারণাও চাৰ্বাক দার্শনিকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। কর্মফলের মত মোক্ষও স্বাভাবিকভাবেই ভূতচৈতন্যবাদী চাৰ্বাকদের ধারণায় প্রবেশ লাভ করেনি। চাৰ্বাক মতে মৃত্যুর পরে দেহের বিনাশকে মোক্ষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।^{২৮১}

ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি সম্বন্ধীয় অপর কয়েকটি ধারণা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ধারণার আবৃত্তিক অঙ্গ না হয়েও ভারতের জনমানসে বহুদিন থেকে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে। কিন্তু চাৰ্বাকী নীতিতে এগুলিরও স্বীকৃতি নেই। চাৰ্বাক মতে স্বর্গ, নরক ইত্যাদির ভোগ ইহজন্মেই হয়।^{২৮২} পরমেশ্বর আখ্যায় চাৰ্বাকেরা দেশের রাজাকে সংজ্ঞিত করেছেন।^{২৮৩} কারণ, প্রাচীন ভারতীয় রাজ-নীতিতে রাজা বহু ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পদবাচ্য।^{২৮৪}

চাৰ্বাকী বস্তুবাদ

চাৰ্বাক সিদ্ধান্তের আলোচনার সময় চাৰ্বাককে দেখা উচিত ভারতেরই একটি

- ২৮০। ভূতেভ্যো মৃত্যুপাদানবস্তুপাদানম্, ন্যায়সূত্র, ৩/২৬/১। ন্যায়ভাষ্যমতে সূত্রে নাস্তিক মত উপস্থাপিত করা হয়েছে।
- ২৮১। 'মৃত্যুরেবাপবর্ণঃ', প্রচ, পৃঃ ৬৭, 'দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ', সমঃ, পৃঃ ৬, 'দেহস্ত নাশো মূর্তিঃ', ৭, পৃঃ ৭, 'মরণমেব চ মোক্ষঃ', সর্বমতসংগ্রহ, পৃঃ ১৫; 'মোক্ষস্ত মরণং', সমঃ পৃঃ ৭/১২, ২১০
- ২৮২। 'ইহলোকাৎ পতো নাশঃ', অঃ, ২/১০, 'নরকঃ', সর্বমতসংগ্রহ, ২১৮, 'স্বর্গনিরতাবদি ন ৩ঃ', ২১১, 'সংগ্রহঃ', পৃঃ ১৫
- ২৮৩। 'লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজাঃ', প্রঃ, ১/১০, 'স্বর্গঃ', সমঃ পৃঃ ৭, 'ন পরমেশ্বরোহপি কশ্চিৎ', সর্বমতসংগ্রহ, পৃঃ ১৫
- ২৮৪। মনুসংহিতা, ৭১৮; U. N. Ghosal, A History of Indian Political Ideas, pp. 540ff.

দর্শন হিসাবে। এই চার্বাক দর্শনের সামগ্রিক চিত্রায়ণ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ধারার পরিপ্রেক্ষিতেই করা উচিত। আমরা আগে দেখেছি যে কেবল খিওরি বা মতবাদে মध्ये ভারতের কোন দর্শনই সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দর্শনটি যে আকারে প্রতিভাত, দর্শনের সম্পূর্ণ রূপরেখার বিচারে তার আলোচনাও আবশ্যিক। মতবাদে ক্ষেত্রে চার্বাক নাস্তিক, অর্থাৎ ভারতের অধ্যাত্মদর্শনকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় ঐতিহ্যে বহুকাল ধরে সঞ্চিত, তার সমালোচনার ভিত্তিতে নেতিবাচক রূপে চার্বাকের প্রতিষ্ঠা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নাস্তিকতার রূপায়ণ কি সম্ভব? ভারতীয় দার্শনিক গোষ্ঠীতে এহ চার্বাকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ইতিবাচক বিশেষ কোন আচরণবিধি পটভূমিতেই কেবল ব্যাখ্যা করা চলে, এই আচরণবিধি ভারতের সনাতন ধারার পরিপন্থী হলেও। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ‘নাস্তিক’ শব্দ যদিও নেতিবাচক রূপই প্রকাশ করে, তবুও চার্বাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে এই সংজ্ঞা ইতিবাচক কিছু অর্থের স্ফোতক এবং নাস্তিকদের এই ইতিবাচক রূপের প্রকাশ সনাতনগোষ্ঠীর বিরোধ বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে।

প্রকৃতপক্ষে চার্বাক দর্শনের যে রূপ চার্বাকের নিজস্ব গ্রন্থ “তত্ত্বোপপ্লবাসংগে” প্রতিভাত, তার বাস্তব চিত্রায়ণ কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এমন নীতিগতভাবে যাঁরা কেবল অহুমানের বিবোধিতা কবেছেন প্রত্যক্ষের প্রতি তাঁদের সমর্থন স্বীকার করে নিলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরাও অশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এই জগৎ বাস্তব প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মতবাদের উগ্রতা এত ক্ষেত্রে পরিহার করতে হয়েছে এবং এই চার্বাকদেরই প্রভাব পড়েছে বোধ হয় পুরন্দরপন্থী চার্বাকদের মধ্যে যঁরা ব্যবহারিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চার্বাক নেতিবাদকে কিছুটা পরিবর্তিত রূপদানের চেষ্টা করেছেন। এই চার্বাক গোষ্ঠী হল বস্তুবাদী চার্বাক। এঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত প্রত্যক্ষের দ্বারা সীমায়িত বস্তুজগতের উপকরণে।

এই চার্বাকদের পরিপূর্ণ আলেখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিকদের গ্রন্থে অদৃশ্য। কারণ এই দার্শনিকদের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে কেবল চার্বাকী হেতুবাদ, ভক্তির সাহায্যে যা প্রতিপক্ষের ক্রটি উন্মোচনে উন্মুখ। চার্বাকদের রীতিনীতি এবং আচরণবিধির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় দর্শনের সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে এবং সম সাময়িক অগ্রাঙ্ক কিছু গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চার্বাকদের বিবরণী থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিকেরা চার্বাকী আক্রমণের আবাত থেকে নিজ নিজ মতবাদগুলিকে বন্ধ

করতে চেষ্টা করেছেন—কলে তাঁদের বর্ণনা হয়েছে পারম্পরিক তর্কযুদ্ধের এক বিবরণী। অস্ত্রাশ্রয় ব্যাপারগুলিকে নিজেদের আলোচনার পরিসরে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত করেননি। অস্ত্রাশ্রয় গ্রন্থগুলিতে অবশ্য তর্কযুদ্ধের এ ছবি নেই, আছে কেবল চার্বাকী আচরণবিধির এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই আচরণবিধির সমর্থনে চার্বাক পক্ষের যুক্তির কিছু বর্ণনা।

বাংলায়নের ‘কামদূত’ের বর্ণনা অনুসারে চার্বাকদের জগৎ প্রধানতঃ বর্তমানকে কেন্দ্র করে।^{২৮৫} যে বর্তমান স্থানিষ্ঠিত তাকে উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যতের লক্ষ্যে চার্বাকেরা অগ্রসর হতে চান না, ভবিষ্যৎ যদিও উজ্জ্বল সম্ভাবনার রঙের সঞ্চিত থাকে। এই গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাকেরা পরবর্তী দিনে ময়ূর লাভের আশায় বর্তমান দিনে হস্তগত পারাবতকে উপেক্ষা করেন না এবং ভবিষ্যতে স্বর্ণমুদ্রার প্রতীক্ষায় থেকে বর্তমানের তাম্রমুদ্রাকে বিসর্জন দিতেও তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বিতর্কিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রসারিত করার পরিবর্তে বর্তমানে নিশ্চিতলভ্য বস্তুগুলির দিকে নিয়োজিত করতে তাঁদের আগ্রহ ‘কামদূত’ের বর্ণনায় সুপরিস্ফুট।

“সর্বদর্শনসংগ্রহের” বর্ণনা অনুসারে চার্বাকেরা বৈষয়িক এবং জাগতিক ভোগ-সুখে আকর্ষণ নিমজ্জিত। এই ভোগাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাই তাঁদের জীবনে মূল লক্ষ্য। দুঃখবাদী অধ্যাত্মদর্শনের কোন প্রভাব চার্বাক দর্শনে নেই। চার্বাকমতে জগৎ ভোগসুখের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। এবং এই জাগতিক সুখকে করায়ত্ত করার প্রচেষ্টায় চার্বাকেরা তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে আগ্রহী। বস্তুজগৎ তার মনোহারী রূপ নিয়ে সুখের আকর্ষণে মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে এই আকর্ষণকে দমন করার শিক্ষা আছে এবং এই বস্তু-জগতের বিপরীতগামী পথই দেখানে চরম শাস্তির পথ হিসাবে নির্দেশিত। চার্বাকেরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। বিষয়রসে মগ্ন হয়ে তাঁরা তাঁদের উপভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে আগ্রহী।^{২৮৬} দুঃখের যে সংমিশ্রণ এই জাগতিক সুখে থাকে চার্বাকদের ভোগের পথে তা বাধার সৃষ্টি করে না।

“সর্বদর্শনসংগ্রহের” এই বিবরণীতে চার্বাকদের কর্মোত্তমের এক পরিচয় পাওয়া

২৮৫। কামদূত, ১।২।২২।৩০

২৮৬। ‘অন্যনাত্মালিঙ্গনাদিভ্রতং সুখমেব পুরুষার্থঃ,’ সমং, পৃঃ ৩, ঐ পৃঃ

যায়।^{২৮৭} জাগতিক সুখের উপভোগে তাঁরা প্রায়সী বাধা বা বিপদের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। কণ্টকের উপস্থিতি তাঁদের পুষ্প আহরণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। চার্বাক মতে ধানে তুষ থাকে বলে ধানের ক্ষয়-নিবৃত্তির ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে ধান ফেলে দেবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। মৎস্য ভোজনের সুখ ঝাঁরা আশ্বাদন করতে চান তাঁদের প্রথমে কাঁটায়ুক্ত মাছই সংগ্রহ করতে হয়। যে দুঃখ অপরিহার্য সুখের পথে অগ্রসর হতে গেলে তাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা উচিত। শস্ত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় মাহুঘ মাটিতে বীজ বপন করে। রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হবার মূলেও থাকে তার ভোজনে পতিত্বের আশা। কিছু কিছু আশঙ্কা অনেক সময় এই আশার সঙ্গী হয়, কতকগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিহার্য অমঙ্গল মাতৃশ্বের এই সুখ সম্ভাবনার পক্ষে বহু ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পশুপাখী এবং কীট পতঙ্গের দ্বারা ভূমিতে উৎপাদিত শস্ত বিনষ্ট হতে পারে। রন্ধনকর্তার সুখাত্ম ভোজনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্য অনাহৃত ভিক্ষকের উপস্থিতির সম্ভাবনাকেও পরিহার করা চলে না। চার্বাকেরা কিন্তু এই দুঃখময় সম্ভাবনার ভয়ে ভীত হন না এবং সুখ দুঃখময় জগতে চলার পথে দুঃখকে সব সময়ে উপেক্ষা করে সুখের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

ইহজগতের ভোগসুখকে উপেক্ষা করে কুচ্ছ সাধন চার্বাকদের অভিপ্রেত নয়। সন্ন্যাস বা ত্যাগের পথ তাঁদের অমুমোদন লাভ করেনি। ত্রিদণ্ড, ভিক্ষুর আবরণ ইত্যাদি সন্ন্যাসের উপকরণগুলি চার্বাকমতে বুদ্ধি বা পৌরুষহীন ব্যক্তির জীবিকার উপায়।^{২৮৮}

চার্বাক সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণীতে চার্বাকেরা নিয়ম বন্ধন-বিহীন ইঞ্জিয়-সুখপরায়ণ হিসাবে অভিহিত। এই গ্রন্থগুলির বর্ণনা থেকে মনে হয় যে ভোগের দুর্দম আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করার কোনো বাধন চার্বাক দর্শনে নেই এবং চার্বাকেরা তাঁদের কাজে ঔচিত্য বা নীতিবোধের প্রেরণায় চালিত হন না। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” উদ্ধৃত বিশেষ একটি শ্লোকে উল্লিখিত দ্ব্যুতপায়ী চার্বাক

২৮৭। সঙ্গ পৃ: ৪, প্রচ, পৃ পৃ: ৬৭-৯

২৮৮। ‘.....ত্রিদণ্ড ভিক্ষাবস্তুত্বম্। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেক্তি-বৃহস্পতিঃ।’ সঙ্গ, পৃ: ৫ ‘ভিক্ষোপবাসনিয়মার্কমরীচিদাহৈর্দেহোপ-শোষণবিবিঃ কুধিয়ার্হা,’ প্রচ, পৃ: ৬৮

‘ভিক্ষোপবাসাঐশ্বৰ্যমুচ্যেত’ এবং ‘সর্বদিক্শাসংগ্রহে’

সাধারণের কাছে সুপরিচিত।^{২৮৯} এই চাৰ্বাক স্ব্থের বসের স্বাদে বঞ্চিত হতে অনিচ্ছুক। যুতপানকে যদি তিনি এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বিবেচনা করেন, তাহলে এই যুতপানের ব্যয় বহন করার জন্ত ঋণ কংতেও তাঁর কুপী নেই।

এই বিশেষ শ্লোকটি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। “দৰ্শন-ম-গ্রহেঃ”ই ভিন্ন এক স্থানে এই শ্লোকটির অনুরূপ অপর একটি শ্লোক^{২৯০} দেখা যায় লোকগাথা বা লোকপ্রবাদের পরিচিতি নিয়ে। জয়ন্ত ভট্টের “শ্রায়মঞ্জরী”তেও^{২৯১} দ্বিতীয়-শ্লোকটির উদ্ধৃতি দেখা যায়। এই শ্লোকে বর্ণিত চাৰ্বাক স্ব্থ লেপ্স সন্দেহ নেই, কিন্তু স্ব্থের প্রয়োজনে নীতিবোধ বিসর্জন দেবার কোন ইঙ্গিত এই শ্লোকে নেই। দেহনাশের পরে আত্মার সত্য বিশ্বাসের অভাব এই শ্লোকে পরিষ্কৃত, যে কারণে পারলৌকিক স্ব্থকে কামনা না করে বর্তমান জীবনের সুখেই তাঁরা মগ্ন থাকতে চান। “শ্রায়মঞ্জরী”তে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হয়েছে ‘সুশিক্ষিত’ সংজ্ঞায় বিশেষিত চাৰ্বাকগেষ্টির মনোভাবের উদাহরণ হিসাবে।

চাৰ্বাকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ধর্ম তাঁদের জীবনের লক্ষ্য নয়, অর্থ এবং কাম, বিশেষত কাম তাঁদের নিকটে পুরুষার্থরূপে গণ্য। মনুষ্যজীবনের চারপ্রকার লক্ষ্য পুরুষার্থ-রূপে কথিত হয়। যথা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। চাৰ্বাকেরা অর্থ ও কামের উপাসক।

মোক্ষ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মানুষের সব দুঃখের এবং সেই সঙ্গে জাগতিক ভোগস্ব্থেরও একান্ত অবসান এই মোক্ষ বা মুক্তির মধ্যে। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে মোক্ষ চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশিত হলেও, সাধারণ সংসারী মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা এই লক্ষ্যের পথে প্রসারিত নয়।

সেইজন্ত সাধারণভাবে চতুর্বর্গ হিসাবে অভিহিত হলেও সাংসারিক মানুষের জীবনে পুরুষার্থ প্রধানতঃ ত্রিবর্গাত্মক, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি

২৮৯। ‘যাবজ্জীবং স্ব্থং জীবনং কুত্বা যুতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ’ সঙ্গ, পৃঃ ১৪, শ্লোকটি গ্রন্থে বৃহস্পতিবচন হিসাবে উদ্ধৃত।

২৯০। ‘যাবজ্জীবং স্ব্থং জীবনান্তি মৃত্যোরগোচরঃ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ’, ঐ পৃঃ ২

২৯১। ‘শ্রায়মঞ্জরী’তে উদ্ধৃত শ্লোকে ‘দেহস্য’ শব্দের পরিবর্তে ‘শাস্তস্য’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

বিভিন্ন লক্ষ্যের সমবায়ের গঠিত। ভারতীয় চিন্তায় ‘অর্থ’ শব্দটি ধনসম্পদের বাচক এবং ‘কাম’ শব্দটি ইঞ্জিয়জ সুখের বাচক। সাংসারিক ভোগসুখ অর্থ ও কামের অন্তর্গত। সম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে কিন্তু ‘অর্থ’ ও ‘কাম’ কখনও নির্দেশিত হয়নি। অর্থ ও কাম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ধর্মের দ্বারা। এই ধর্মযুক্ত ‘অর্থ’ ও ‘কাম’ দ্বিবিধ আখ্যায় অভিহিত।

সমসাময়িক রচনার আলোকে চার্বাক সম্প্রদায়কে বিচার করার সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় চিন্তাধারা অর্থ এবং কামের পরিচর্যাকে অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যের বহির্দেশে রাখেনি। অর্থ এবং কামকে যথাক্রমে উপজীব্য করেও অর্থশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্র সনাতনপন্থীদের সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। অবশ্য “অর্থশাস্ত্র”কার কোটিল্য এবং “কামসূত্রের” রচয়িতা বাংস্ভায়ন ধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।^{২১২} নাস্তিকতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে নেই। সেইজন্য অর্থ এবং কামকে অবলম্বন করেও এঁদের বস্তুবাদ কখনও নিন্দিত হয়নি।

ধর্মবিরোধী হিসাবে চার্বাকী আচরণের পরিচিতি প্রধানতঃ সমালোচকদের বিবৃতির মাধ্যমেই আমাদের কাছে উপস্থাপিত। এ সংক্ষেপে চার্বাকপন্থের নিজস্ব অভিমত আমাদের জানা নেই; তবে ধর্ম যদি সনাতন ধারার প্রতি আনুগত্যের ত্রুটি হত তাহলে নিঃসন্দেহে চার্বাকী মনোভাব এই ধর্মের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতার মধ্য দিয়ে চার্বাক মতবাদে যে বিজ্ঞানসম্মত রূপের প্রকাশ, সাধারণ আচরণবিধির মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত তথাকথিত ‘ধর্মের’ সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। আর এই ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় চার্বাকেরা অসমর্থ বলেই চার্বাকী আচরণে সমালোচকেরা অসুসঙ্গীয় সাধারণ মানের অভাব লক্ষ্য করেছেন।

মোট কথা চার্বাকদের আচরণকে ধর্মের বিরোধী বলে অভিহিত করার চার্বাকী নৈতিক মান যে সনাতনীদের নীতিগত মানদণ্ডের বিরুদ্ধ নয় সেটাই প্রকাশ পায়। সনাতনগোষ্ঠীর অনভিপ্রেত যে কোন আচরণই বোধ হয় এইভাবে ‘চার্বাক’ সংজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন দৃষ্টান্ত নিজেকে একাত্ম করেছে।

২১২। ‘ধর্মার্থকামেত্যো নমঃ’, কামসূত্র, ১।১১; অত্রোহস্তানুবন্ধ পরম্পরাহুপস্থাতকং দ্বিবিধং সেবেত’ ঐ ১।২।১; ১।২।৩২

‘তাতিধর্মার্থো যদ্ বিজ্ঞাতদ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্’, অর্থশাস্ত্র, ১।২.২

মোট কথা, ভারতের সনাতনপন্থীদের বিচারে চার্বাকগোষ্ঠী চিরদিন অবজ্ঞার এবং সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের আচরিত অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপই তাঁদের কাছে দুর্নীতিপরায়ণতার পরিচায়ক। এইজন্য চার্বাকদেব বিরুদ্ধে যখন তাঁরা উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ করেন তখন সেই অভিযোগকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়ত আমাদের উচিত হবে না। কিন্তু তাহলেও নিয়মবদ্ধনবিহীন চার্বাকগোষ্ঠীর আচরণে শৃঙ্খলাবোধের যে কিছু অভাব দেখা গিয়েছিল তা অনুমান করা বোধ হয় অসম্ভব নয়।

৫। চার্বাক ও বেদ

বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে চার্বাক দর্শনের মূল ধারাব্যবস্থার আবির্ভাবের যে ইঙ্গিত পণ্ডিতেরা দিয়েছেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই বিদ্রোহের পটভূমিতে চার্বাক শিক্ষাস্থানে বিচার করতে গেলে বৈদিক চিন্তাধারার কিছু পরিচয় প্রয়োজন এবং আমাদের বর্তমান আলোচনা বৈদিক সংস্কৃতির এই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে।

বেদের সংখ্যা চার—ঋক্, সাম, যজুস ও অথর্ব। ‘ঋক্’ এই নামের মাধ্যমে অথর্ব বেদ বহু ক্ষেত্রে পরিচিত, কারণ, অথর্ব বা চতুর্থ বেদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক দেবীতে। প্রত্যেক বেদেই আবার তিনটি বিভাগ—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে বিভক্ত বেদ এক বিশাল সাহিত্য সম্ভার। বৈদিক সাহিত্য হিসাবে এর পরিচিতি এবং যে যুগের পরিধির মধ্যে এই সাহিত্যের সৃষ্টি বৈদিক যুগ বলতে সাধারণতঃ তাকেই বোঝায়।^{২৯৩} সৃষ্টি বিচারের মাপকাঠিতে কিন্তু কেবল সংহিতা এবং ‘ব্রাহ্মণ’ই বৈদিক যুগের সাক্ষ্য বহন করে, কারণ, বৈদিক মন্ত্র এবং ‘ব্রাহ্মণের’ অল্পসংখ্যে উদ্ধৃত হলেও বৈদিক সাহিত্যের অসম্পূর্ণ অংশ উপনিষৎ এক ভিন্নধর্মী ভাবের পরিচায়ক, যার অন্তর্ভুক্তি পরবর্তী চিন্তাধারায় স্থান গ্রহণ করেছে। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক যুগ বিশিষ্ট

২৯৩। ‘মন্ত্র’, ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘উপনিষৎ’—এই তিন বিভাগ সমন্বিত সমগ্র বেদের রচনাকালের আনুমানিক পূর্বসীমা হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ সাল এবং উত্তর সীমা হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক সাধারণভাবে পণ্ডিতদের অনুমোদন লাভ করেছে এবং বৈদিক যুগ এই দুই সীমার মধ্যবর্তী যুগের অর্থেই ব্যবহৃত (I P, i, p. 57)

অর্থে মন্ত্র এবং ‘ব্রাহ্মণের’ যুগকেই বোঝায় এবং চার্বাক দর্শনে বেদ প্রধানতঃ মন্ত্র এবং ‘ব্রাহ্মণ’ পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যের অর্থে ব্যবহৃত।

বৈদিক যুগের চিন্তাধারা মূলতঃ কামনাভিত্তিক। সাধারণ মানুষ স্মৃতি, সম্পদ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির অধিকারী হতে চায়। কামনার লক্ষ্য সেই সব বিষয়। বৈদিক যুগের সমস্ত চেতনার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ এই কামনাগুলির পূর্তি এবং দ্বিতীয়তঃ এই কামনাপূর্তির পথের অন্তরায়গুলির দূরীকরণ। বৈদিক সংহিতায় এই প্রয়াস রূপ পেয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনার মাধ্যমে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে দেবত্বের মহিমা আরোপ করে মানুষ তাঁর পূজা করেছে; দেবতার কাছে তার প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর মঙ্গলময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে সর্বদা আবির্ভূত হন এবং কলরূপকে সংবরণ করেন। ইন্দ্রদেবতার কাছে তার কামনা বৃষ্টি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই অমরোষণও আছে যে দেবতা যেন সংহাররূপী ঝড়কে সন্ত্রাসী না করেন।^{২৯৪} এই প্রার্থনা ছাড়াও মানুষের কামনা পূর্তির উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসাবে যজ্ঞ ইত্যাদি নানা রকম ক্রিয়াকর্মের বিধানও স্থান পেয়েছে বৈদিক সংহিতাতে।

এই যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান সংহিতোত্তর ‘ব্রাহ্মণের’ যুগে অত্যন্ত প্রাধান্য পায় এবং প্রধানতঃ এই অমুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই ‘ব্রাহ্মণের’ যুগের রূপায়ণ।

ক্রিয়াকর্মের খুঁটিনাটিবছল এই সব বৈদিক যজ্ঞের যথাযথ ফল প্রদানের ক্ষমতা বৈদিক নির্দেশনা অনুসারে মন্ত্রাদির বিস্তৃত উচ্চারণ এবং বিভিন্ন ক্রিয়ার অমুষ্ঠানের বিস্তৃততার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ ধরনের বিস্তৃততা পালন সাধারণ লোকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়; ফলে, একটা দুর্বোধ্যতার আবরণ এই যাজ্ঞিক অমুষ্ঠানগুলিকে সাধারণ লোকের বুদ্ধির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখত। অমুষ্ঠানের জটিলতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যজ্ঞামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। অনভিজ্ঞ অথচ যাজ্ঞিক ক্রিয়ায় রত ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থার এক বর্ণনা ‘শতপথ ব্রাহ্মণে’ পাওয়া যায়।^{২৯৫} অমুষ্ঠানগুলির বিবরণ সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তার দশার সঙ্গে এই অবস্থা তুলনীয়। এইভাবে অরণ্যে প্রবেশকারীকে যেভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুর্জনের প্রভাবনা ইত্যাদি প্রতিকূলতার কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়, অনভিজ্ঞ যজ্ঞকাণ্ডেরও সেইভাবে নানা ধরনের দুর্বিপাকের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া

গত্যন্তর থাকে না। অপর পক্ষে, যজ্ঞ সম্বন্ধে ‘বিস্তারিত জ্ঞান’ যাদের আছে, সেই ব্যক্তিদের দ্বারা যজ্ঞ পরিচালিত হলে যজ্ঞাভ্যুত্থানের মাধ্যমে সব রকম বিপদ থেকে পরিভ্রাণ এবং পরিশেষে স্ব্থ, শান্তি এবং স্বর্গলাভ হয়।

যজ্ঞের ব্যাপারে এই ‘বিস্তারিত জ্ঞানের’ দ্বারা অধিকারী, স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক সমাজে তাঁদের সর্বাধিক প্রতিপত্তি ছিল; কারণ, সাধারণ মানুষের স্ব্থ, সমৃদ্ধি এবং স্বর্গের চাবিকাঠি ছিল তাঁদের হাতে। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় নামে বিশেষ এক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং যজ্ঞ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিশেষ এই শ্রেণীর অধিকারে আসে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সাধারণ ব্যক্তিদের এই পুরোহিত বা যাজকদের উপর নির্ভর করতে হত, কারণ যজ্ঞের জটিল ক্রিয়াপদ্ধতির জ্ঞান একমাত্র এঁদেরই অধিগত ছিল। ঋক কামনাপুত্রি যজ্ঞাভ্যুত্থানের লক্ষ্য, সেই যজ্ঞমান বস্তুত: পক্ষে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। এই পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তির জাতিগতভাবে পুরোহিততাকেই বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করতেন। এ সম্বন্ধে Radhakrishnan বলেন : ২৯৬ the highly elaborate nature of the sacrificial ceremonial demands special training for the priestly office. The patriarchal head of the family could no more conduct the complex and minute system of the sacrificial ceremony. Priesthood became a profession and a hereditary one. The priests who possessed the Vedic lore became the accredited intermediaries between god and men and the dispensers of the divine grace. The yajamana or the man for whom the rite is performed, stands aside. He is a passive agent supplying men, money and munitions, the priest does the rest for him.

বৈদিক সাহিত্যে বহু অংশে এই যাজক শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির দেবতা হিসাবে বর্ণিত হয়েছেন। ‘শতপথ ব্রাহ্মণে’ দেবতাকে দু’-শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে^{২৯৭} — স্বর্গর দেবতা আর মানুষ দেবতা বা পুরোহিত, দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞ পরিচালনার ভার যাদের উপর অর্পিত।

২৯৬। I P, i, pp, 125-6.

২৯৭। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।২।২।৬ ; ৪।৩.৪।৪ ; ২।৪.৩।১৪

এই পুরোহিতেরা সমাজজীবনে যে বিশেষ ধরনের স্থযোগ স্থবিধার অধিকারী ছিলেন বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরোহিতদের স্থান অপর ব্যক্তির তুলনায় উচ্চতর স্তরে নির্দেশিত ছিল এবং এঁদের সঙ্গে ব্যবহারে এই বিশেষ ব্যবধানটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সচেতন থাকতেন। এই যাজকদের সব সময়ে সম্মান দেখাতে হত, উপহার দিতে হত এবং এঁদের হত্যা বা উৎপীড়ন করার অধিকার কারও থাকত না। এঁদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় দেশের রাজাকেও এই একই নিয়ম পালন করতে হত। এই যাজকদের সম্পত্তিতে রাজা কোন পরিস্থিতিতেই হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। সাধারণ লোকের সঙ্গে বিবোধের ব্যাপারে বিচারক সব সময়ে যাজকদের পক্ষে রায় দিতেন, কারণ, এই যাজকদের কোন কাজে ত্রুটির সম্ভাবনা অকল্পনীয় ছিল।^{২১৮}

ক্ষমতা এবং অর্থের লোভ মানুষের মধ্যে চিরন্তন এবং এই যাজকসম্প্রদায়ের লোকেরাও তা থেকে অব্যাহতি পাননি। জনসাধারণের অজ্ঞতার পূর্ণ স্থযোগ নিয়ে ক্রমে এঁরা সমাজে এঁদের বিশেষ স্থযোগ স্থবিধার অপব্যবহারে রত হলেন। কেবলমাত্র জাতিগত ব্রাহ্মণতার ভিত্তিতেই পৌরোহিত্যের মধ্যদা দাবী করে বহু লোক সাধারণের কাছে নিজেদের উপস্থাপিত করলেন এবং এইভাবে সমাজে তাঁদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি শুরু হল। পরলোকে প্রচুর স্বর্থ ও সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা এঁদের মধ্যে অনেকের জীবিকার উপায় হয়ে দাঁড়াল।^{২১৯} এই জাতীয় লোকের অস্তিত্ব জি স্বাভাবিকভাবেই যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে অধঃপতনের সূচনা করতে থাকে এবং এইভাবে সংহিতার যুগে যে বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভব, সংহিতোত্তর ব্রাহ্মণের যুগে তা এক বিকৃত আকার ধারণ করে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব যে সময়ে সর্বাপেক্ষা প্রবল, সেই 'ব্রাহ্মণের' যুগেই বেদে যজ্ঞভিত্তিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। পরবর্তী ভাবনা বিভিন্নমুখী ধারায় নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে ভারতের চিন্তাজগতে পরিবর্তন সূচনা করল।

বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান সংহিতা এবং 'ব্রাহ্মণের' পরবর্তী যুগে। উপনিষদীয় সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের কামনাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতধর্মী স্বরের

২১৮। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৫.১১ এবং Keith কৃত অনুবাদ

২১৯। :IP; i, p. 126

পরিচয় বহন করে। যে বৈষয়িক স্তম্ভভোগ বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রধানতম লক্ষ্য তার অসারতা প্রতিপাদিত হল উপনিষদীয় চিন্তায়। নিজেদের কামনাপূতির সহায়ক হিসাবে বৈদিক আশ্রয় বিভিন্ন দেবদেবীর বর্ণনা করেছিলেন। উপনিষদীয় ঋষি বহু দেবতার উৎসরূপে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করলেন। উপনিষদীয় সাহিত্যের বহু অংশে যজ্ঞীয় সংস্কৃতির নিন্দা বা নূতন ব্যাখ্যা লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে পরস্পরসংলগ্ন কুহুবাহিনীকে বহিষ্পবমান স্তোত্রগায়কদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ৩০১

প্রকৃতপক্ষে উপনিষদীয় চিন্তাধারার আবির্ভাবের সূচনা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই পরিদৃশ্যমান। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতার ম্যাদা দিলেও এদের মধ্যে একত্বের অন্তসন্ধানের সংহিতার যুগেই আধ্বমানস উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। বহু দেবতাব মধ্যে প্রাধাত্যের অধিকারী কোন দেবতা—এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্বের সূচনাও বৈদিক সাহিত্যের যুগেই লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিভিন্ন মন্ত্রে বহুর মধ্যে একত্বের অন্তসন্ধানের যে প্রারম্ভিক রূপ প্রকাশমান তারই পূর্ণ পরিণতি উপনিষদীয় চিন্তায়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উপনিষদে বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা পাওগেও উপনিষদকে বেদেরই অন্তর্ভুক্তি বলা চলে।

মুণ্ডক উপনিষদে পরা এবং অপরা এহ দুই বিচার উল্লেখ আছে। ৩০২ পরা বা শ্রেষ্ঠ। বহু উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এবং অগ্ন্যন্ত সব বিষয়ের জ্ঞান অপরা বা নিকৃষ্ট বিচার অন্তর্গত। স্বাভাবিকভাবেই উপনিষৎকার তাঁর নিজ শাস্ত্রের অন্তর্গত বিজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন। কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়নি, নিকৃষ্ট হলেও তা বিচার স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে উপনিষদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে দ্বিমুখী মনোভাব লক্ষণীয়। বৈদিক যাগযজ্ঞবজ্রল ক্রিয়াপদ্ধতি উপনিষদীয় চিন্তার দ্বারা সমর্থিত হয়নি বাট কিন্তু উপেক্ষার দৃষ্টিতে সব সময়ে এগুলির বিচার করা হয়নি, বরং নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা এগুলির তাৎপৰ্য্য বিবেচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে স্মৃচিত হয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পুরাতন ভাবধারার সমন্বয়ের প্রয়াস।

৩০০। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১।১।১০, মুণ্ডক উপনিষদ ১২৭.০০ তে
বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্র বিরোধ স্পষ্ট।

৩০১। ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১।১২।৪-৫

৩০২। মুণ্ডক উপনিষদ, ১।১।৪-৫

উপনিষদের মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা থাকলেও একই ঐতিহ্যে দ্বারা যে উপনিষদীয় সংস্কৃতিকেও প্রাবিত করেছিল তা বোঝা যায় নীচের উক্তি থেকে : ৩০৩ The beliefs of the Vedic religion weighed upon the Upanisad thinkers. Though they did not scrupulously criticise them, they were still hampered by the legacy of the past. They tried to be champions of future progress as well as devotees of ancient greatness. This was obviously a hard task judged from the results. The Upanisad religion while it preached a pure and spiritual doctrine, which had no specific forms of worship, which did not demand a priestly hierarchy, yet tolerated these things, nay, even recognised them. The sacrificial religion was still the dominating force, the Upanisads only added respectability to it.

এবার ৩৪ জৈন দর্শনের আবির্ভাব কালকে কোন কোন উপনিষদীয় রচনা বৈদিক বর্ণে মনে করা যায়। এই দর্শন দুটির মধ্যেও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তির এক প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যায়। বৈদিক যুগের যে নশ্ববতাব চিহ্ন উপনিষদীয় সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও তা পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এই দর্শন দুটিকে উপনিষদের মত বৈদিক সংস্কৃতির অনুরক্তি বোধ হয় না। কারণ এগুলির মধ্যে বেদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজ্রোহ ঘোষণা আছে। অবশ্য ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধারণ ধারা থেকে এই দর্শন দুটি বিচ্ছিন্ন নয়।

বেদের বিরোধী দলে বৈদিক ৩৪ জৈন দর্শনের অন্তর্ভুক্তি হলেও বৌদ্ধ মনো-
 ৩০৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩০৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩১৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩২৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৩৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৪৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৫৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৬৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৭৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৮৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯১। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯২। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৩। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৪। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৫। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৬। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৭। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৮। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৩৯৯। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-
 ৪০০। বেদাঙ্গ বৈদিক মনো-

revealed, and, in appealing to the Veda especially the Upanisads although great freedom and arbitrariness prevail in regard to the explanation of these texts, and every philosopher gleans from them just what he wishes to. Most significant it is, that even the Buddhists, who deny the authority of the Veda, yet concede that it was originally given or 'created' by God Brahman only, they add, it has been falsified by the Brahmanas and therefore contains so many errors'. Winternitz-এর এই উক্তি অহুমরণ করলে দেখা যায় যে বৌদ্ধ মতেও বেদের দৈব উৎস অস্বীকৃত নয় এবং বৌদ্ধরা বেদবচনের গৌরবচ্যুতির জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করেন। কাজেই নাস্তিক পংক্তিতে বৌদ্ধদের স্থান নির্দেশিত হলেও আস্তিকতার প্রভাবকে তাঁরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি।

বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার মূলতঃ এক অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক জগৎকে কেন্দ্র করে। এ জগতের পরিচয় প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক অহুমান, যা চাৰ্বাক মতে একমাত্র প্রমাণ—তার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। জাগতিক স্থখ ও সমৃদ্ধির কামনার পরিপূর্তির লক্ষ্যে বৈদিক সংস্কৃতি তার নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল। এই পথের প্রসার যে অলৌকিক রাজ্যকে ঘিরে সেই রাজ্যের রহস্য উন্মোচনে উপনিষদীয় এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও ব্রতী—যদিও তাদের লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন। বৈদিক চিন্তাধারায় যে অতিজাগতিক রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই দর্শনগুলি তাকে উপেক্ষা করেনি, বরং নিজেদের স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এই রহস্যের সন্ধান করেছে।

একমাত্র চাৰ্বাকী চিন্তার উপরই বৈদিক সংস্কৃতি তার উত্তরাধিকারের কোন ছায়া রেখে যেতে পারেনি। আর বেদের বিক্ষোভ প্রতিদানের মধ্যে চাৰ্বাকের ভূমিকা বোধ হয় প্রধানতম। বস্তুবাদী চাৰ্বাক কাম্য বন্য উদ্বেগকেই তার মূখ্য উপজীব্য করেছে। কাজেই লক্ষ্যের বিচারে বৈদিক দর্শনের মধ্যে চাৰ্বাক দর্শনের মৌল সাদৃশ্য সহজ সিদ্ধান্তের বিষয় হতে পারে, কিন্তু এ সাদৃশ্য নেহা তাই গোঁব। কারণ কামনা পূর্তির উপায়ের নির্দেশনায় উভয় দর্শনের মূল ব্যবধানের ইঙ্গিত নিহিত আছে। কামনাকারীর চিন্তের তাত্ত্বগিক তুষ্টি বৈদিক বিধানের অহুমরণে সম্ভব নয়। বেদের মধ্যে আছে কেবল কামনার পরিপূর্তির প্রতিশ্রুতি, তাও বহু

ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জগতের অন্তরালে এবং লৌকিক অহুভূতির সীমার বহির্দেশে। বৈদিক বিধানের অন্তরালে কামনাকারী তখনকার মত যা লাভ করে তার মধ্যে স্বার্থের স্বাদের সম্পূর্ণ অভাব, বরং অর্থব্যয় এবং সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তা ছাংখ্যের অহুভূতিই বহন করে। স্বখলাভের এই উপায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চার্বাক দর্শনে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছে। লৌকিক স্বখ লাভের জন্য দৈব সাহায্য প্রার্থনায় চার্বাকপন্থী সম্মত নন।

বস্তুত: যাজকগোষ্ঠীর প্রভাবে বৈদিক যজ্ঞীয় চর্চা ক্রমশ জটিল রূপ পরিগ্রহ করে এবং অন্তর্ধানগত আড়ম্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণোত্তর যুগে বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা—যার পূর্ণ রূপায়ণ চার্বাক মতবাদে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ‘.....the inner movement of the mind of the Carvakas seems to have been mainly centred on a revolt against priest-craft: it is in the context of the emptiness and formalism of the latter day Vaidika rites and ceremonies that one can best appreciate the essence of the Carvaka ideology.’^{৩০৫}

ভারতীয় বিশ্বাস অঙ্গুসারে বেদমন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, বৈদিক ঋষির নিকট এই মন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে মাত্র। বেদের অপর নাম ‘শ্রুতি’ ‘or the rhythm of the infinite heard by the Soul’.^{৩০৬} ‘শ্রুতি’ শব্দের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় এক জগতের যোগাযোগের ইঙ্গিত আছে। চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এই বিশ্বাসের বিরোধী এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব চার্বাক মতে সমর্থনযোগ্য নয়। অগ্ন্যজ্ঞ বিভিন্ন গ্রন্থের মতে বেদও চার্বাকদের মতে ব্যক্তিবিশেষের স্বাক্ষর রচিত। “দর্শনদর্শনসংগ্রহে” এবং অগ্ন্যজ্ঞ বৃহস্পতিবচনের যে উদ্ধৃতি আছে তাতে বেদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বেদমন্ত্রের রচয়িতারা চার্বাক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। জর্ভরী তুফরী ইত্যাদি অপ্ৰচলিত এবং আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন শব্দের অগ্নয়ে গঠিত বেদমন্ত্রগুলি যে পণ্ডিতবাক্য হিসাবে বিবেচিত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বৃহস্পতিবচনে তা প্রমাণ করার প্রয়াস দেখা যায়।^{৩০৭} চার্বাক

৩০৫। B. Tiwari, *Secularism and Materialism in Modern India*, p. 351

৩০৬। I P, i, p. 128

৩০৭। ‘জর্ভরী তুফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্বতম’, সনং, পৃ: ১৪

গুরু বৃহস্পতির অভিমত অনুসারে এই মন্তগুলিকে প্রলাপ বলা চলে^{৩০৮} এবং এগুলির প্রণেতার পাণ্ডিত্যে না হলেও ভণ্ডামিতে অনেকের চেয়েই উন্নততর। 'ভণ্ড' ছাড়াও 'বৃত্ত', 'নিশাচর' বা 'রাক্ষস' ইত্যাদি নিন্দাসূচক অল্প নানা শব্দ চার্বাক-পন্থীদের মতে এই সব 'বেদশ্রু কর্তারঃ' সম্বন্ধে প্রযোজ্য।^{৩০৯}

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Strabo-র ভারত সম্বন্ধীয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত 'প্রামাণিক' সংজ্ঞক এক দার্শনিক গোষ্ঠীর উল্লেখ প্রয়োজন। এই বিবরণ অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামীরা 'প্রামাণিক'দের দ্বারা 'মূর্থ' 'ভণ্ড' ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হতেন।^{৩১০}

প্রামাণিকদের মধ্যে বেদবিরোধী চার্বাকদের আবিষ্কার করার প্রবণতা স্বাভাবিক। ভাবেই আসতে পারে, যদিও তথ্যের সমর্থন না পেলে এ সম্বন্ধে স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।

যে রাজকশ্রেণীর লোকেরা 'ব্রাহ্মণ্যের' যুগে দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, চার্বাক দর্শনে তাঁদের নানাভাবে হের প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দেখা যায়। চার্বাক মতে এই সব পুরোহিতেরা বুদ্ধি ও পৌকষবিহীন। এ কারণে জীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন করতে না পেরে এরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।^{৩১১} স্বর্গ ইত্যাদি যে সব স্বথপ্রদ স্থানের বর্ণনা বেদে আছে এবং মানুষকে যাব প্রলোভন দেখিয়ে পুরোহিতেরা বঞ্চনা করেন সেগুলিতে চার্বাকদের কোন অনুমোদন নেই। স্বর্গের সম্বন্ধে স্বর্গের দেবতাদেরও চার্বাক ধর্ম-মাগ প্রবেশাধিকার নেই।

৩০৮। 'বৃত্তপ্রলাপশ্রুতঃ', প্রচ, পৃ: ৬৫, 'বৃত্তপ্রলাপমাত্রহেন', সমং, পৃ: ৫

৩০৯। 'ত্রয়ো বেদশ্রু কর্তারঃ ভণ্ডবৃত্তনিশাচরাঃ' সমং পৃ: ১৫

৩১০। 'The Pramanai are philosophers opposed to the Brachmanes, and are contentious and proud of argument. They ridicule the Brachmanes, who study philosophy and astronomy as fools and impostors. (The Early History of Bengal, F J Monahan, p 147)

৩১১। 'অগ্নিহোত্রঃ.....জীবিকৈতি বৃহস্পতি,' প্রচ, পৃ: ৭১, 'অগ্নিহোত্রা-দেজীবিকামাত্র-প্রয়োজনহাং' সমং, পৃ: ৫; 'অগ্নিহোত্রঃ.....ধাত্বনির্মিতা', ঐ, পৃ: ১৩; সর্বমতসংগ্রহ, পৃ: ১৫; সর্বমতসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, ২১৪

বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে চার্বাকেরা বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির সন্ধান পেয়েছেন “সর্বদর্শন সংগ্রহ” মতে চার্বাক প্রদর্শিত এই ত্রুটিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—অনৃত ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি।^{৩১২} বৈদিক প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের ঠিক এই জাতী অভিযোগের উল্লেখ তায়স্বত্রের মধ্যেও দেখা যায়।^{৩১৩} মন্ত্রগত অনৃত বা অসত দোষের উদাহরণ প্রসঙ্গে কতকগুলি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। পুত্রকাম্য বাক্তি তাঁর কামনা পূরণের জন্য পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হবেন, পশুকাম্য কামনা পূর্তি হবে ‘চিত্রা’ যজ্ঞের মাধ্যমে—বেদের বিধান এই রকম। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নির্দেশিত যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠানের পরেও পুত্রলাভ বা পশুলাভ অনেক সময় দেখা যায় না।^{৩১৪} চার্বাক মতে এই ধরনের ব্যাপার বৈদিক মন্ত্রের অসত্যতা প্রতিপাদন করে। বেদের অপর একটি নির্দেশ—স্বর্গলাভে অভিলষী ব্যক্তির অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। চার্বাকেরা এ জাতীয় বিধানের মধ্যে মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পান। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার স্বর্গপ্রাপ্তি সত্যই হয় কিনা সে বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অপর পক্ষে পুত্রোষ্ট্র ইত্যাদি যজ্ঞ, যেগুলির ফল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষেই যার সঠিকতা বিচার করা সম্ভব, সেগুলির সম্বন্ধে বেদমন্ত্র যে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সব সময়ে সক্ষম নয় তা এই যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান এবং সেগুলির ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। কাজেই বৈদিক মন্ত্রের সত্যতায় বিশ্বাস রাখা সম্ভব নয়। আর স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কীয় বেদের বিধান নিছক প্রতারণামূলক।^{৩১৫}

‘ব্যাঘাত’ শব্দ পরস্পর বিরোধিতার ছোতক এবং বেদের মধ্যে বহু স্থানে একটি মন্ত্রের সাহায্যে অপর একটি মন্ত্রে নির্দেশিত বিধানের বিরোধিতা করা হয়েছে।^{৩১৬}

৩১২। সসং, পৃঃ ৪

৩১৩। তায়স্বত্র ২।১।৫০ (তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাত পুনরুক্ত্যদোষেভ্যঃ)

৩১৪। ‘পুত্রকামেষ্ট্রো-“পুত্রকামঃ পুত্রোষ্ট্রা যজ্ঞত” ইতি। নেষ্ট্রো সংস্থিতায়্য পুত্রজন্ম দৃশ্যতে,’ হাতা, ২।১।৫০

৩১৫। ‘দৃষ্টার্থস্ত বাক্যসানুতত্বাদদৃষ্টার্থমপি বাক্যম্ “অগ্নিহোত্রং জুহ্ব্যং স্বর্গকাম” ইত্যাদ্যনুতমিতি জায়তে’ ঐ ; এই প্রসঙ্গে তদ্ব্যাপন্নবসিংহ, পৃঃ ১১৪ ; ‘অদৃষ্ট বিষয়ে বেদবাক্যাণ্যং প্রামাণ্যং কথং বেৎসি,’ ‘বৈদিক-দেশত্বেন ইতি চেৎ, ন, অর্থবাদবাক্যেন ব্যভিচারায়’।

৩১৬। ‘বিহিতব্যাঘাতদোষাচ্চ ! হবনে “উদিতে হোতব্যম্, অনুদিতে হোতব্যম্.....” ঐ

অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কোন ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগে আবার কোন ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের পরে আত্মতি প্রদানের বিধান দেখা যায়। ‘মা হিংশাং’ এই বচনের দ্বারা হিংসা বা জীবহত্যা কোণায়ও নিষিদ্ধ হয়েছে, আবার বিরুদ্ধার্থক অপর বচনের দ্বারা গোহত্যা অনেক ক্ষেত্রে বেদের সমর্থন লাভ করেছে। একটি মন্ত্রে রুদ্রের সংখ্যা এক, আবার অপর একটি মন্ত্রে এই সংখ্যা বহু। বেদবিদদের মধ্যে আবার দুটি দল—কর্মবাদী ও জ্ঞানবাদী। এই দুটি দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতা বেদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। এইভাবে ব্যাঘাত বা বিরুদ্ধাচরণের দোষে দুই বৈদিক মন্ত্র চার্বাক মতে প্রামাণ্যের মর্যাদা লাভের যোগ্য নয়। এ ছাড়াও পুনরুক্তি^{৩১৭} বা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দোষ বেদবচনে আরোপিত হয়েছে।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসাসূত্রে পূর্বপক্ষ হিসাবে বেদবিরোধীদের যে মত উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে চার্বাক মতের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সূত্রবর্ণিত মত অনুসারে—

‘ইহার চারটি শৃঙ্গ, তিনটি চরণ, দুইটি মস্তক এবং সাতটি হস্ত’, বেদমন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত এই জাতীয় উক্তি অসম্ভব এবং অবাস্তব পদার্থের বিদ্যমানতার উল্লেখ করে।

‘হে ওষধি, তুমি একে রক্ষা কর; হে কুঠার তুমি একে হিংসা করো না, হে প্রস্তর সমূহ, তোমরা শোন’—ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি, প্রস্তর, কুঠার ইত্যাদি জড় বস্তুসমূহের সম্বোধন করার বৈদিক প্রচেষ্টা হাস্যকর।

‘বেদমন্ত্রে পরস্পর বিরোধিতার উদাহরণ হিসাবে পূর্বমীমাংসাসূত্রে বর্ণিত পূর্বপক্ষে ‘অদ্বিত্বিত্বী (জ্যো) এবং অদ্বিত্বিত্বী অন্তরীক্ষ’ ও ‘রুদ্র একজন, দ্বিতীয় নাই এবং জগতে অসংখ্য সহস্র রুদ্র’—এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ আছে।

‘সংযোব জর্জরী তুর্ফরীতু’ ‘ইন্দ্রঃ সোমশ্চ কাণুক’ ইত্যাদি মন্ত্রের কোন অর্থ হয় না। (মী ১।২।৩৪—৩৮, ভাস্কর্য)

বেদের নিত্যত্ব এবং অপর্যায়ের খণ্ডন প্রসঙ্গে এই পূর্বপক্ষীয় মতে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, বেদে ‘কীকট’ নামে জনপদ, ‘প্রমদ’ নামে রাজা, ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই সব জনপদ বা নরপতির অস্তিত্বের পরবর্তী বেদের রচনাকাল। বেদের কোন কোন অংশে প্রাবাহনি উদ্ভাবক ইত্যাদি মরণশীল মানুষের উল্লেখ আছে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে বেদের এই বিশেষ অংশসমূহ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের অস্তিত্বের পরবর্তী যুগে রচিত।

৩১৭। পুনরুক্তিদোষ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্রামায়ণে ‘ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিকৃত্তমাম্’ এই বচনটি উদ্ধৃত হয়েছে।

কাঠক, পৈপ্পলাদ, কোথুম ইত্যাদি বেদ শাখাগুলির বিশেষ বিশেষ নামের মধ্যেও কঠ, পিপ্পলাদ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বেদকর্তার অস্তিত্বের পরিচয় স্থপরিষ্কৃত। কাজেই বেদকে নিত্য বা অপৌরুষেয় মনে করার কোন কারণ নেই,— বেদবিরোধীদের এটাই অভিমত এবং জৈমিনির মামাংসাসূত্রে পূর্বপক্ষ হিসাবে এই মতের উল্লেখ দেখা যায়। ৩১৮

পূর্বমামাংসাসূত্রের শবরস্বামীকৃত ভাষ্যে বেদের অপ্ৰামাণ্যবাদীদের মতের এক বিবরণ দেখা যায়। ৩১৯ এহ মত অনুসারে যে বস্তুর উপলব্ধি বিষয়বোধের সঙ্গে একাত্ম নয় তাকে অসৎ বলা উচিত—উদাহরণ হিসাবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা শশশৃঙ্গের উল্লেখ করেন। পশু প্রভৃতির বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়, কিন্তু পশুকামা ব্যক্তি পশুলাভের আশায় যজ্ঞ কর। সত্ত্বেও কামা পশু অদৃশ্য থাকে। যে কোন ক্রিয়ার ফল হিসাবে কোন বস্তুর সম্ভাবকে স্বীকার করতে হলে ক্রিয়ার সমকালীন বস্তুটির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। শরীরের মর্দনজনিত সুখ শরীর মর্দন করার সময়েই হয়, পরে নয়। বেদের অপ্ৰামাণ্যবাদীদের মত অনুসারে বৌদ্ধ যজ্ঞে যে ফলের প্রতিশ্রুতি থাকে সেই ফল যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে উপলব্ধ হয় না। প্রতিশ্রুত ফলের সম্ভাব যখন দেখা যায় যজ্ঞ সে সময় অবিদ্যমান থাকে। অবিদ্যমান এই যজ্ঞফল ফলের কারণ হিসাবে কল্পনা করার স্বপক্ষে বেদবিরুদ্ধবাদীরা কোন যুক্তি দেখাতে পান না। ফলপ্রাপ্তির সমকালীন অগ্ন্য নানা উপায়ের বর্তমানতা দেখা যায়, যেগুলিকে স্পষ্টভাবে এই ফলের কারণরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। শাবরভাষ্যে উল্লিখিত এই মত অনুসারে দৃষ্ট এই সব কারণগুলিকে উপেক্ষা করে অদৃষ্ট বৈদিক যজ্ঞাদিকে এই ফলের কারণ হিসাবে উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না। স্বর্গ ইত্যাদি অদৃষ্ট ফলেও বৌদ্ধ যজ্ঞসমূহের কারণতা স্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

শ্রীহর্ষের “নৈষধীয়” কাব্যে চার্বাক মতের মাধ্যমে বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। যাজকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল হিসাবে তাঁরা পুত্রলাভকে নির্দেশ করেন। পুত্রজন্মের বিকল্প পুত্রজন্মগ্রহণ না করা, এবং এই ছাট বিকল্পের একটিকে ফল হিসাবে যজ্ঞকারী লাভ করতে বাধ্য। যজ্ঞকারীর পুত্রলাভ হলে ধৃত যাজকেরা তাঁদের নির্দেশিত যজ্ঞকেই পুত্রলাভের কারণ হিসাবে প্রচার করেন। পুত্র জন্মগ্রহণ না করার ক্ষেত্রে যাজকেরা যজ্ঞের অঙ্গবৈকল্যকে

সমস্ত ব্যাপারের জ্ঞান দায়ী করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন যে যজ্ঞানুষ্ঠান যথাবিহিত নিয়মানুসারী না হওয়ার ফলে যজ্ঞমান যজ্ঞের মাধ্যমে অভিলষিত ফললাভে ব্যর্থ হইয়েছেন। শ্রীহর্ষের বর্ণনা অনুযায়ী ধৃত ব্রাহ্মণদের এ ধরনের কৈফিয়ৎ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। চার্বাক মতে বেদের কোন কোন অংশের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করার পর অবশিষ্ট অংশকে প্রামাণ্যের মর্যাদা দেওয়া অর্থহীন; কারণ এতে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সুতরাং বেদের কোন অংশই প্রমাণ নয়—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই শ্রেয়ঃ। নৈষধে যে চার্বাকদের মত আলোচিত হয়েছে তাঁরা বৈদিক বচনে পরলোকের অস্তিত্বে সন্দেহের বিষয় উল্লেখ করেছেন। পরলোক প্রসঙ্গে বেদ বচনেই যখন সন্দেহ বর্তমান, তখন বেদবাক্যে আস্থাবান ব্যক্তিদের পরলোক সম্বন্ধীয় চার্বাকী ধারণায় ক্রটির অনুসন্ধান করা অসমীচীন। ৩০০

বেদ এবং বেদানুসারী ধর্মশাস্ত্রসমূহের বচনে নানা ভাবে ব্রহ্মচর্যের বিধান আছে; মাহুষের উচ্ছৃঙ্খল কাম প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপদেশ এই গ্রন্থ-গুলিতে প্রচারিত। নৈষধের অন্তর্গত চার্বাকী মতে বৈদিক দেবতা এবং ধর্মশাস্ত্রকার-দেব ব্যক্তিগত চরিত্রে অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বেদানুসারী নীতিবাক্যগুলির অর্থহীনতায় কোন সন্দেহ থাকে না। যে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্রোধ সংযত করতে অসমর্থ তাঁরাই নানাভাবে ক্রোধকে দমন করার পরামর্শ দেন। বেদাদি শাস্ত্র সমূহের প্রবক্তা ব্রাহ্মণদের নিজস্ব আচরণ এবং নির্দেশনার মধ্যে এ ধরনের পরস্পর-বিরোধতার প্রচুর নমুনা পাওয়া চাশ্চক্যের। এঁদের উপদেশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিচরণ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত বৃহস্পতিবচনের মধ্যে লৌকিক ব্যবহারের সঙ্গে তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির অর্থহীনতা এবং অর্থহীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা যায়। “প্রবোধচন্দ্রোদয়ের” বর্ণনায় যজ্ঞের সাফল্য ফল “কর্তৃক্রিয়াদ্রব্যবিনাশ”—মৃত্যুর মাধ্যমে যজ্ঞকর্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই যজ্ঞক্রিয়া অতীতের গহ্বরে প্রবেশ করে, যজ্ঞে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। যে অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত সব অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তার সাহায্যে যদি যজ্ঞকারীর জ্ঞান স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয়, তাহলে দাবানলে বনের যাবতীয় বৃক্ষ ভস্মীভূত হবার পরও সেই বিনষ্ট বৃক্ষ থেকে

আমরা অনুরূপভাবে প্রচুর ফল আশা করতে পারি।^{৩২১} বেদমতে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সেই পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। বৃহস্পতিবচনে ঐ ক্ষেত্রে মন্তব্য করা হয় যে এই বিশ্বাস যজ্ঞে পশুবলির প্রকৃত কারণ হলে যজ্ঞমান পশুর পরিবর্তে নিজ পিতাকেই যজ্ঞের বলি হিসাবে মনোনীত করতে পারেন; কারণ, পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অন্তর্গত ব্যয়সাপেক্ষ অল্প পদ্ধতির তুলনায় এই উপায় অনেকাংশে সহজতর।^{৩২২}

চার্বাক মতে দেহনাশের পরই জীবের যাবতীয় অস্তিত্বের অবসান। কাজেই মানুষের মরণোত্তর আত্মার তৃপ্তি বিধানের জন্য শ্রাদ্ধাদি যে সব অমুষ্ঠানের বিধান বেদে আছে, চার্বাকী বর্ণনায় সেগুলিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাপিত দ্বীপ যেমন দ্বত ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও আলোকদানে অক্ষম জীবনদ্বীপ যে ব্যক্তির নির্বাপিত হয়েছে, সেও এইভাবে শ্রাদ্ধের মাধ্যমে উৎসর্গীকৃত বিবিধ ভোজ্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভোজনজনিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না।^{৩২৩} শ্রাদ্ধের অমুষ্ঠানের মূলে অন্তর্নিহিত এই ধারণার স্বীকৃতি থাকে যে ভোজ্যবস্তুর কাছে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থেকেও ভোজ্যবস্তু উপভোগ করা সম্ভব—যার ভিত্তিতে অমুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে অমুপস্থিত মৃত আত্মার পক্ষেও শ্রাদ্ধামুষ্ঠানে দেয় ভোজ্যবস্তুর মাধ্যমে পরিভূপ্তির কল্পনাতে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। চার্বাক মতে এ জাতীয় ধারণার প্রকৃত সার্থকতা থাকলে দূরষাত্রী পথিক সঙ্গে কোনদিন খাদ্যাদি বহন করত না; কারণ, গৃহের অভ্যন্তর থেকে কোন ব্যক্তি যদি তার উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করত, তাহলেই পথে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হত। অনুরূপভাবে এক গৃহের অন্তর্গত অধিবাসীদের প্রত্যেকের কাছে খাদ্য সরবরাহ করারও কোন প্রয়োজন হত না, উপরের তলার ব্যক্তির নীচেব তলায় রাখা খাবারের সাহায্যেই উদরপূর্তি করতে সক্ষম হত।^{৩২৪}

৩২১। স্বর্গঃ কৰ্ত্তৃক্ৰিয়াদ্রব্যবিনাশে যদি যজ্ঞনাম্। ততো দাবাগ্নিদহ্মানাং ফলাং স্যাদ্ ভূরি ভূরুহাম্ ॥ পূপূঃ ৬৫-৬; সর্বমতলংগ্রহ, পূপূঃ ১৫-৬

৩২২। “নিহতস্য.....কস্মিন্ হন্যতে”। প্রচ, পূঃ ১৬ ‘পশুশ্চেন্নিহতঃ..... কস্মিন্ হিংস্রতে’। সসং, পূঃ ১৩

৩২৩। ‘মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতৃপ্তিকারণম্। নির্বাপন্ত প্রদীপন্ত স্নেহঃ সংবধয়েচ্ছিত্বাম্ ॥’ প্রচ, পূঃ ৬৬

৩২৪। ‘গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং.....কস্মিন্ দীযতে’, সসং, পূঃ ১৪

রামায়ণে ৩১৫ জাবালির মাধ্যমে যে চার্বাক মতবাদের প্রকাশ, বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তার ভিতরও সুপরিস্ফুট। শ্রাদ্ধাহুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রসঙ্গেও জাবালি একই ধরনের যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রাদ্ধে অর্পিত ভোজ্য বস্তুর দ্বারা যদি পরলোকস্থিত আত্মার ভোজনস্পৃহা নিবৃত্ত হয়, তাহলে একইভাবে প্রবাসী এক দূরগামী ব্যক্তিরও তৃপ্তি পেতে পারেন। বৈদিক শ্রাদ্ধের দ্বারা নির্দেশ দেন শ্রাদ্ধের বিধানের পরিবর্তে তাঁদের এইভাবে ইহলোকস্থ নিজ নিজ বন্ধু ও আত্মীয়ের সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে ৩২৬ মায়ামোহকৃত বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞের নিন্দার মধ্যে পশুবলি ও শ্রাদ্ধাহুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রাধান্য লাভ করেছে। যজ্ঞে পশুবলির সমর্থনে বেদবিহিত নির্দেশ এই মতে অর্থোক্তিক; কারণ, হিংসার পথে কখনও ধর্মের অনুষ্ঠান হতে পারে না। যজ্ঞায়িতে দ্ব্যতাহতির মাধ্যমে যজ্ঞকারী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ফলের অধিকারী হতে পারেন—বেদের এ ধরনের বিধানকে মায়ামোহের উক্তিভে বালকের বচন বলা হয়েছে; কারণ, পরিণতবুদ্ধি কোন ব্যক্তির মুখে এ জাতীয় বাক্য শোনা যায় না। যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতার ভোজ্য হিসাবে শমী ইত্যাদি কাষ্ঠের ব্যবহার প্রসিদ্ধ। এই সব কাষ্ঠের তুলনায় পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত কোমল বৃক্ষপত্র গুণগত বিচারে শ্রেয়ষের দাবী রাখে। বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত নাস্তিক মত অনুসারে বেদের নির্দেশ কার্যতঃ এই সব দেবতাদের পশু অপেক্ষাও হান প্রতিপন্ন করে।

বৈদিক যজ্ঞগুলির অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ক্রিয়াপদ্ধতি শালীনতার মাপকাঠির বিচারে সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য। “সর্গদর্শন-সংগ্রহে” উদ্ধৃত বৃহস্পতি বচনে অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গীকৃত কোন বিশেষ আচারের নিন্দা দেখা যায়। এই জাতীয় অন্ত্রীল আচারের দ্বারা বিধান দেন বৃহস্পতিবচনে তাঁদের “ভণ্ড” সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। ৩২৭

৩২৫। “অষ্টকোপিতদৈবতামিত্যয়ং প্রসূতো জনঃ। অন্নসো্যাপদ্রবং পশু যুতো হি কিমশিষ্যতি ॥ যদি ভুক্তমিহাত্মন দেহমগ্নস্ত গচ্ছতি। দত্তাং প্রবসত্য শ্রাদ্ধ ন তৎ পথ্যদানং ভবেৎ ॥” ২।১০৮।১৪-১

৩২৬। “নৈতদ যুক্তিসংহ বাক্যং হিংসা ধর্মায় নেয়তে।প্রবাসিনঃ” ॥ ৩।১৮।২৪-২৭ বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত বৈদিক যজ্ঞের অকার্যকারিতার উল্লেখ দেখা যায়, ২।১৪।২১-৩

৩২৭। “অশ্বজাত হি শিল্পং তু প্রতীগ্রাহক প্রকীর্তিতম্। ভৈগন্তব্যং পরং চৈব গ্রাহজাত প্রকীর্তিতম্ ॥” সঙ্গ, পৃঃ : ৫

বৈদিক কর্মকাণ্ডকে ভারতীয় দর্শনকারেরা সকলে সমর্থন না করলেও বেদ সম্পক্ষে চার্বাকী মন্তব্য বহুক্ষেত্রে বেদ সমর্থকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য যুক্তির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না; কাজেই যুক্তির মাধ্যমে চার্বাকী আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এঁদের ভূমিকা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত নয়। বৈদিক মন্তব্য ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে অলৌকিক জগতের ইঙ্গিত মেলে, সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই ভারতের বিভিন্ন দর্শন তাঁদের মতবাদের ব্যবহারিক ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। বেদের মাহাত্ম্যের মূলে আছে তার এই অলৌকিকত্ব। লৌকিক কোন প্রমাণের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিকপী এই কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য নিকপণের প্রয়াস সার্থক হতে পারে না।^{৩২৮} এ ব্যাপারে বেদের প্রামাণ্যের সম্পক্ষে চার্বাক মতের সমালোচকদের এটাই বক্তব্য যে বৈদিক কর্ম পদ্ধতি ঋদের দ্বারা অনুমোদিত তাঁরা প্রকৃত সংযমী এবং সর্বপ্রকার প্রতারণার উপরে। তাঁদের মতে বৈদিক কর্মকাণ্ড এই কারণেই উপেক্ষণীয় নয়।^{৩২৯}

বীতরাগ অথবা কৃতধর্মা পুরুষের উক্তি হিসাবে বেদকে অনেকে প্রামাণ্য দিতে ইচ্ছুক। বেদপ্রামাণ্যের সমর্থক এই দার্শনিকেরা যুক্তি দেখান যে ‘আপ্ত’ সংজ্ঞায় পরিচিত এই ব্যক্তিদের বচন সব সময়েই অবিসংবাদী এবং সত্য। কারণ ক্ষীণদোষ এই পুরুষদের মিথ্যা বলার কোন হেতু থাকতে পারে না।

“তদ্ব্যাপন্নবসিংহে”^{৩৩০} এই শ্রেণীর দার্শনিকদের সমালোচনা দেখা যায়। জয়রাশি বলেন যে, পুরুষের আপত্তিসম্পন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হতে পারে না। একমাত্র অনুমানের সাহায্যেই জানা সম্ভব কোনও ব্যক্তি প্রকৃত আপ্ত কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে অনুমানের কার্যকরিতা চার্বাকদের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

আপ্তের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও আপ্তোক্তিকে বিনা বিচারে প্রামাণ্যের মর্যাদা

৩২৮। বেদবচনের প্রামাণ্যের মূল হিসাবে অর্থের সঙ্গে শব্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে অনেকে নির্দেশ করে থাকেন। এ জাতীয় ধারণাও লৌকিক প্রমাণ নিরপেক্ষ এবং জয়রাশি তাঁর গ্রন্থে এই মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। (তদ্ব্যাপন্নবসিংহ, পৃ: ১১৩-৪)

৩২৯। ন্যায়কুসুমাজলি, ২।৩

৩৩০। ‘অন্তে তু আপ্তোক্তেন প্রামাণ্যম্। আপ্তাঃ সাক্ষাৎকৃতজ্ঞানঃ। তৈর্যত্বম্ সমাপ্তং তৎকিলাবিসংবাদকম্’, তদ্ব্যাপন্নবসিংহ, পৃ:

দেওয়া যেতে পারে না। প্রামাণ্যের হেতু হিসাবে জয়রাশির মতে দুটি বিকল্পের উল্লেখ করা যায়—প্রথম, কেবলমাত্র সত্তা বা অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় জ্ঞানজনকত্ব। প্রথম বিকল্পটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন, কারণ কেবলমাত্র সং অথচ অকারক বস্তুর প্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ নয়। দ্বিতীয় বিকল্পকে আপোক্তির প্রামাণ্যে হেতু হিসাবে নির্দেশ করলে প্রশ্ন উঠতে পারে—আপ্তবচনের জ্ঞানজনকত্ব একক অথবা সহকারী কারণ যুক্ত? এক্ষেত্রে প্রথম বিকল্পটির সম্ভাব্যতা জয়রাশি অগ্রাহ্য করেন; কারণ, একক কোন কিছুর জ্ঞানজনকত্ব স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় বিকল্পের ক্ষেত্রে, যে সহকারী কারণের সঙ্গে সংযুক্ত আপোক্তি জ্ঞানজনক হিসাবে কল্পিত, সেই সহকারী কারণের দৃষ্টত্বের সম্ভাবনা পরিহার্য নয়। দৃষ্ট সহকারী কারণের দ্বারা যুক্ত বচন আপোক্ত হলেও তা থেকে বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। উদাহরণ প্রসঙ্গে জয়রাশি একাধিক অর্থযুক্ত শব্দ কিভাবে শ্রোতার অন্তরে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি জন্মায় তার উল্লেখ করেন। নূতন কঞ্চলযুক্ত কোন বালককে বোঝাতে হয়ত কোন ব্যক্তি ‘নবকঞ্চলযুক্ত মাণবক’—এই বাক্যাংশটির প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হোক, বাক্যাংশটির মাধ্যমে শ্রোতার মনে অনেক ক্ষেত্রে নব বা নয় সংখ্যাবিশিষ্ট কঞ্চলের দ্বারা যুক্ত বালকের ধারণা হয়। ক্ষেত্রে বিশেষে বক্তা এবং শ্রোতার চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। অমুখ্যায়ী ব্যাপারটি বিপরীত ক্রমান্বসারীও হতে পারে—বক্তা হয়ত নয়টি কঞ্চলযুক্ত বালকের অর্থে বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন, কিন্তু শ্রোতার কর্ণে ‘নব’ শব্দটি ‘অভিনব’ অর্থ প্রকাশ করে। অমুকপভাবে বেদবাক্য আপোক্ত হওয়া সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে আপ্তের অনভিপ্রেত অর্থের বাঞ্ছনা করতে পারে।

চার্বাকের ভারতীয় দার্শনিকদের দ্বারা সাধারণভাবে স্বীকৃত তিনটি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। প্রমাণগুলির মধ্যে প্রথম দুটি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্বন্ধে চার্বাকী মনোভাবও ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। ভারতের দার্শনিকদের কাছে তৃতীয় প্রমাণ অর্থাৎ আপ্তবাক্য বহুক্ষেত্রে বেদের সঙ্গে অভিন্ন। এই তৃতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণা কিরূপ তা বেদ বিষয়ে চার্বাকী মনোভাবের আলোচনাতে স্মৃষ্ট হবে।

বেদকে ধারা অপৌরুষেয় বলেন তাঁদের মত অনুসারে পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা বৈদিক সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি।^{৩৩১} মীমাংসকেরা বেদের প্রামাণ্যের সপক্ষে এই

৩৩১। ‘অন্তে তু কুমতিমতানুসারিণো বদন্তি, বেদন্ত প্রামাণ্যমন্তথা—
অপৌরুষেয়ত্বেন।’ তত্বোপলব্ধিসংহ পৃঃ ১১৬

অপৌরুষেয়তাকে নির্দেশ করেন। পুরুষের চিত্ত রাগ ও দ্বেষ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে তার দ্বারা সৃষ্ট যে কোন বস্তু মালিন্যযুক্ত হতে পারে। বেদের সৃষ্টিতে পুরুষের কোন কার্যকরিতা না থাকায় বৈদিক চিন্তায় এ মালিন্যের সম্পর্কে নেই এবং এই কারণেই বেদের প্রামাণ্য সংশয়াতীত।

বেদের অপৌরুষেয়তায় দ্বারা বিশ্বাসী বৈদিক বচন তাঁদের মতে অসম্বন্ধ। এ প্রসঙ্গে তাঁরা আরও বলেন যে, নির্দিষ্ট স্থানে যা উৎপন্ন, দেশ বা কালের ব্যবধানে তার সত্যতা অবিকৃত থাকে না এবং বহুক্ষেত্রে তা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। সূর্য কিরণে জলের প্রতীতির ফলে যে ভ্রান্ত মরীচিকার উদ্ভব, তার মূল দেশগত ব্যবধানে। কালের ব্যবধানে উৎপাদ্য ভ্রান্তির উদাহরণ প্রসঙ্গে তাঁরা আরও পটে ক্ষেত্র-বিশেষে স্বর্গের প্রতীয়মানতার উল্লেখ করেন। পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে বা কালে সৃষ্ট না হওয়ার ফলে বেদ নিত্য এবং বৈদিক নির্দেশ এ ধরনের দেশ বা কালের অন্তরের অপেক্ষা থাকে না, কাজেই বেদবচনে এঁদের মতে ভ্রান্তির কোন আশঙ্কা নেই।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্বের সমর্থক মীমাংসকদের এই জাতীয় আলোচনা চার্বাকী গ্রন্থ “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে” উপস্থাপিত করা হয়েছে, বিরোধী যুক্তি-জালের মাধ্যমে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। ৩৩২ মীমাংসকেরা বলেন যে পুরুষ কর্তৃক বেদের সৃষ্টির ঘটনা কোন ব্যক্তির স্মরণে না থাকার জন্য বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং সেই সঙ্গে নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য। “তত্ত্বোপপ্লবসিংহের” মতে মানুষের স্মৃতিতে বেদকর্তার অস্তিত্ব না থাকা বেদের নিত্যত্বে প্রমাণ হতে পারে না, কারণ, কৃপ, আরাম ইত্যাদি অনিত্য বহু বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেগুলির কর্তা বিন্যস্তির অতলে অবলুপ্ত। বেদের অপৌরুষেয়ত্বের সমর্থকেরা দেশ এবং কালের উচ্ছেদকে এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তার অস্মরণের জন্য দায়ী করতে পারেন; অর্থাৎ, কর্তা তাঁদের মতে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রাচীনতা বা ভিন্নদেশবর্তিতার জন্য বিন্যস্ত। জয়রাশি ভট্টের মতে যে ভাবেই হোক কৃপ ইত্যাদি মানুষ সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে কর্তার বিন্যস্তি যদি বস্তুগুলির নিত্যতা প্রমাণে অসমর্থ হয়, তাহলে ‘কর্তার অস্মরণ বস্তু বিশেষের নিত্যতা প্রমাণের হেতু’—মীমাংসকদের এই সাধারণ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না এবং এই উক্তির সমর্থনে বেদের নিত্যত্বও প্রমাণিত হতে পারে না।

তাছাড়া বেদের কর্তাকে কেউ স্মরণ করতে পারে না—এই হেতুও অসম্বন্ধ। বৈশেষিকদের ধারণায় বেদ কর্তার দ্বারা সৃষ্ট। বহু ব্যক্তি বেদকে ব্রহ্মার দ্বারা

প্রণীত বলে মনে করেন। যে ‘অস্মরণ’কে মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্বের হেতু হিসাবে গ্রহণ করেন, “তত্ত্বোপপ্লবসিংহে” সেই ‘অস্মরণ’ পদের তাৎপর্য নানাভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস দেখা যায়। প্রশ্ন তোলা হয়েছে—‘অস্মরণ’ এখানে প্রতিটি ব্যক্তির অথবা কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যক্তির স্মরণের নিবৃত্তি? প্রতিটি ব্যক্তির স্মরণের নিবৃত্তিকে হেতু হিসাবে গ্রহণ করলে হেতুকে অসিদ্ধ বলতে হবে। কারণ, প্রত্যেকটি মানুষের মানসিক অবস্থার অবগতি সাধারণের সাধ্য-বহির্ভূত। এ ব্যাপার যদি কারও সাধ্যায়ত্ত হয় তবে তাকে সর্বজ্ঞ বলা চলে। যদি কেবলমাত্র কয়েকটি পুরুষের অপেক্ষায় ‘অস্মরণ’কে হেতু হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়, তাহলে হেতুটিকে অসম্পূর্ণ বলতে হবে। কোন ব্যাপারকে কয়েকটি ব্যক্তির অস্মরণের বিষয় বললে ব্যাপারটি অপর কয়েকটি ব্যক্তির স্মরণ-সীমায় আছে এরূপ ধারণা হয়। ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক বেদ রচিত হওয়ার ব্যাপার কয়েকজনের অস্মরণের বিষয়—এই হেতু থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে বেদের কর্তা বিद्यমান থাকা সত্ত্বেও তা কতিপয় ব্যক্তির স্মরণবহির্ভূত। কাজেই জয়রাশি ভট্টের বিবেচনায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির জন্য বেদকর্তার স্মরণবহির্ভূতত্ব অথবা ‘অস্মরণমান-কর্তৃকত্ব’কে হেতু হিসাবে নির্দেশ করার সমর্থনে কোন যুক্তি নেই।

এই ‘অস্মরণমানকর্তৃকত্ব’র ভিত্তিতে বেদবচনের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার মীমাংসকী প্রচেষ্টা আরও অত্যাধিকার প্রতীত করার চেষ্টা হয়েছে। জয়রাশি ভট্ট বলেন যে সমগ্র বেদ প্রণয়ন করার পরেও যদি কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিজ কর্তৃত্ব অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রচার করেন যে তিনি বেদের কর্তা নন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বেদের রচনা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য মানুষের স্মৃতির পটে কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারবে না এবং বেদ পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই সৃষ্টির কাহিনী কালক্রমে মানুষের স্মরণ সীমার বাইরে চলে যাবে। কাজেই কেবলমাত্র স্মরণ করতে না পারা থেকে কোন ঘটনার অস্তিত্বের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

বেদকে অপৌরুষেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মীমাংসকদের প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ। পুরুষকে তাঁরা দোষের অধিকরণ বা আশ্রয় রূপে গ্রহণ করেছেন এবং পুরুষোৎপাদ্য সব কিছুই তাঁদের মতে দোষ যুক্ত। পুরুষ এভাবে দোষের আশ্রয় হিসাবে তাঁদের কাছে পরিগণিত না হলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনে তাঁদের এ জাতীয় ঔৎসুক্যের প্রয়োজন হত না; কারণ, সেক্ষেত্রে পৌরুষেয় হলেও বেদ অপ্রমাণ হবার কোন আশঙ্কা থাকত না। মীমাংসকদের এই মনোভাবের সমালোচনা “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রন্থকারের

মতে পুরুষকে দোষের আশ্রয় বিবেচনা করলে প্রতিপুরুষবর্তী ইন্দ্রিয়গুলিকেও দোষাত্মক বলাতে হয় এবং এই দোষ যুক্ত ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে উৎপাদিত বিজ্ঞান সমূহও অপ্রমাণ প্রতিপন্ন হয়। ফলে প্রকৃত প্রমাণের পর্যায়ে কোন কিছুকেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

গ্রন্থকারের মতে মীমাংসকী এই প্রচেষ্টার মধ্যে ত্রুটির আরও নিদর্শন আছে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হলে পুরুষগত দোষের মত পুরুষবর্তী গুণ থেকেও বেদ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে। ফলে পৌরুষেয় দোষের অভাব বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মকলা সাধন করলেও পৌরুষেয় গুণের ব্যাবৃত্তিতে বৈদিক বচনে অপ্রামাণ্যের শঙ্কাকেও পরিহার করা চলে না। মীমাংসকেরা বলতে পারেন যে পুরুষগত গুণ ও দোষ উভয়েরই ব্যাবৃত্তির পর স্বাভাবিক গুণের প্রভাবে বেদ প্রামাণ্যরূপে পরিগণিত হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে স্বাভাবিক দোষের প্রভাবে বেদের অপ্রমাণ হবার আশঙ্কাও অস্বীকার্যভাবেই এসে পড়ে।

আরও, অপৌরুষেয় হওয়ার ফলে বেদে কর্তৃদোষের নিরাকরণ সম্ভব হলেও শ্রোতৃদোষ দূরীকৃত হতে পারে না। বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে বৈদিক বচন বহু ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

মীমাংসকেরা বেদবচনের নিত্যত্ব স্বীকার করে বৈদিক নির্দেশে দেশ ও কালগত ব্যবধানের বিলোপ করতে চান; কারণ তাঁদের মতে দেশ বা কালগত ব্যবধান ভ্রান্তির কারণ। মীমাংসকদের এই ধারণার অর্থোক্তিকতা প্রতিপাদন করার জন্য “তত্ত্বোপপ্লবসিংহ” গ্রন্থে শ্বত্বির দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শ্বত্বির বিষয় দেশ বা কালগত কোন ব্যবধানেরই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমাণের পরিসরে ভ্রান্তি সংজ্ঞাই শ্বত্বির ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

বাধা অর্থে বিপরীতজ্ঞানকে বোঝায়। বেদের বচনকে বাধারহিত হিসাবে মীমাংসকী নির্দেশনার অর্থ বৈদিক বচনের বিপরীত জ্ঞানের অভাব। ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহের’ মতে এই বেদবচনের যথার্থ্যকেই এই অভাবের একমাত্র কারণ বলা চলে না, বাধার উৎপাদক কারণবৈকল্য থেকেও এই অভাবের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আরও, যে সব জ্ঞান বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, সেগুলিও বিপরীত জ্ঞানের আবির্ভাবের আগে বাধারহিতই থাকে। কাজেই বাধারহিতত্ব কোন জ্ঞানের প্রামাণ্য সাধন করতে সমর্থ নয়; এই প্রসঙ্গে ‘বাধারহিত’ শব্দটির নানাভাবে অর্থ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শব্দটি প্রত্যেক পুরুষের অথবা কেবলমাত্র কয়েকটি পুরুষের অপেক্ষায় প্রযুক্ত হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মানসিক

ভাব কারও পক্ষে জানা সম্ভব না হওয়ায় প্রথম বিকল্প অর্থহীন। দ্বিতীয় বিকল্পের ক্ষেত্রে হেতুটি অসম্পূর্ণ বা অনৈকান্তিক; কারণ কয়েকটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে সাধারণ একটি ধারণায় উপনীত হওয়া যুক্তিসাপেক্ষ নয়।

জয়রাশি ভট্টের মতে চোদনা বা বেদবচন থেকে উদ্ভূত বিজ্ঞানের নির্বিষয়কেই আন্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা উচিত। বৈদিক বচন থেকে আমাদের যে জ্ঞান হয় তার কোন বাস্তব রূপায়ণ নেই। পুত্রলাভ বা স্বর্গলাভের কামনায় যারা যজ্ঞ করেন যজ্ঞের সমকালীন পুত্র বা স্বর্গ কোন বস্তুরই সম্ভাব তাঁদের দৃষ্টিগোচরে আসে না। কাজেই চোদনা বচনের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের মিথ্যা অনস্বীকার্য।

বলা যেতে পারে যে চোদনাজনিত বিজ্ঞান থেকে প্রতীয়মান অর্থের সম্ভাব তৎক্ষণাৎ না হলেও কালাবসানে হয় এবং এইখানেই তার যথার্থ্য। জয়রাশি ভট্টের মতে বেদবচনের দ্বারা অভিহিত অর্থের ভবিষ্যৎকালীন রূপায়ণকে বচনানুসারী বিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রিত করা যেতে পারে না। কারণ যে সময় এই অর্থ রূপায়িত হয় সেই সময়ে এই অর্থানুসারী জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকে। আবার জ্ঞান যখন বর্তমান থাকে অর্থের তখন সম্ভাব থাকে না। কাজেই বেদবচনানুসারী জ্ঞান ও অর্থের একত্র অবস্থিতি কোন সময়ে না থাকায় বেদবচনের যথার্থ্য সংশয়সাপেক্ষ।

মোট কথা বেদের প্রামাণ্য যে অলৌকিকতাকে কেন্দ্র করে, যুক্তি বা অন্য লৌকিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ—চাৰ্বাকেরা যুক্তির সাহায্যে তার আবরণ উন্মোচন করতে চান। এ প্রচেষ্টার অবশ্য ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্ব আছে। অতীন্দ্রিয় যে জগতের অস্তিত্বের ঈঙ্গিতে বেদবচনের প্রকৃত মাহাত্ম্য নিহিত, সেই অতীন্দ্রিয়তাই বহু ক্ষেত্রে যাজকসম্প্রদায়ের যথেষ্টচারিতায় মাধ্যম হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে চাৰ্বাক মতবাদের আবির্ভাবের জন্ম বৈদিক অলৌকিকতার এই অপপ্রয়োগকে অনেকাংশে দায়ী করা চলে।

যাই হোক যথেষ্টচারিতার পথের দিকে অলৌকিকতা বহু ক্ষেত্রেই প্রসারিত। তাই যাজক সম্প্রদায়ের অনাচার দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছেন তাঁরা অলৌকিকতাকে প্রামাণ্যের আসর থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত করে এই যথেষ্টচারিতার যুলোচ্ছেদে অগ্রসর হয়েছেন। চাৰ্বাক মতবাদের আবির্ভাব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের এই আতিশয্যের যুগে নিভূর্ণ লৌকিক প্রমাণের উপর এই দর্শনে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাক্ষাৎভাবে যার বিচার করা যেতে পারে একমাত্র সেই বস্তুই চাৰ্বাক দর্শনে সত্য; সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ বাতে আছে, তার অস্তিত্ব এই মতে গ্রাহ্য নয়। প্রমাণ সম্বন্ধে চাৰ্বাকদের এই নীতির আলোচনা আমরা

আগে করেছি। একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করার চার্বাকী প্রবণতার মূলে এই জাতীয় মনোভাবই যে কার্যকরী, 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়ের' টীকাকার মণিভদ্রের বর্ণনা থেকে তার আভাস মেলে। সাক্ষাৎ বিচারে যার পরিমাপ করা যায় না জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রবেশাধিকার যদি পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারপথে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে এই পরোক্ষ প্রবেশপথকে ব্যবহার করে প্রতারণাপ্রবণ যাজকগোষ্ঠীর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক কিছু ধারণাই সাধারণের বুদ্ধিগোচরে আনার চেষ্টা করতে পারে। টীকাকারের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতারণার এই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করার জগুই চার্বাক পন্থীর। অনুমান, আগম ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারপথ প্রথম থেকেই রুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত। ৩০২

৬। চার্বাক সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন

চার্বাক মতবাদের আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে চার্বাক দর্শন প্রধানত যুক্তিনির্ভর। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করাকেই সাধারণভাবে চার্বাকী নীতি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। চার্বাক সর্বক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ। চার্বাকের নীতি নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় উজ্জল নয়, চার্বাকী প্রচেষ্টা প্রধানতঃ নূতন দৃষ্টির আলোক নিয়ে প্রাচীনের বিশ্লেষণ এবং এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে নানাভাবে তার ত্রুটি প্রদর্শন। চার্বাক নীতির মাধ্যমে যে বিরোধিতার মনোভাব সুপরিষ্কৃত, যে কোন জাতির রাজনীতি, সমাজনীতি বা দর্শননীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিরোধিতার প্রয়োজন আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধিতা না থাকলে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে শাসকের যে যথেষ্টচারিতার সুযোগ আছে, তার পরিচয় কারও কাছেই অবিদিত নয়। ভারতের সামাজিক আচরণ পদ্ধতি তার দর্শননীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে যাজকদের যথেষ্টচারিতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজজীবনে যে আতিশয্যের সূত্রপাত হয়েছিল তার প্রতিবাদের মাধ্যমেই চার্বাকী বিদ্রোহাত্মক নীতির সূচনা। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অনাচারের প্রতিরোধের ভূমিকাতেই চার্বাক প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ, কিন্তু ভারতীয় সমাজনীতির সঙ্গে দর্শননীতির এই অচ্ছেদ্য যোগের জগুই দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রেও চার্বাকের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় কার্যকর।

চার্বাক দর্শননীতিতে বহু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে—বেণুলির উল্লেখ আমরা

আগেই করেছি। কেবলমাত্র সমালোচনার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে চাৰ্বাকী প্রতিরোধস্পৃহা অনেক সময় এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে বাস্তবতার সঙ্গে যার সামঞ্জস্যবিধান করা যায় না। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে চাৰ্বাকের প্রকৃত ভূমিকা কি তা অনেক সময় তুৰ্বোধ্যতার অন্তরালে গোপন থাকে। ‘ভক্তোপপ্লবসিংহে’র আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তবে এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখা উচিত যে চাৰ্বাক নীতি মূলতঃ প্রতিরোধাত্মক। বৈদিক পুরোহিত গোষ্ঠীর আতিশয্য রোধের প্রয়োজন নিয়ে ভারতীয় চিন্তাজগতে চাৰ্বাকী চিন্তার সূচনা।

ভারতীয় চিন্তাজগতে চাৰ্বাকের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে একটা নূতন যুগের সূচনা করেছিল। বিশ্বাসঃ বেদী যুলে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবার ফলে ভারতীয় জনমানসে যে আবলতা ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল তার অপসারণের প্রচেষ্টার মধ্যে চাৰ্বাকী চিন্তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। চিরাচরিত সব কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপ্তবাক্য নামে যা প্রচলিত, তা সর্বক্ষেত্রে আমাদের পথের নির্দেশ-প্রদানে অসমর্থ—ভারতীয় জনচিন্তে এই বোধের সূচনা চাৰ্বাক দর্শনের প্রধান অবদান। চাৰ্বাকের যুক্তিবাদী প্রবণতা আমাদের প্রতিদিনের ধারণার বিষয়গুলিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘাচাই করে দেখার প্রেরণা দিয়ে বহুকালের মজ্জাগত বিশ্বাসের বিক্ষোভ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

চাৰ্বাকী বিদ্রোহের প্রতিবাদে অপর দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্ত হয়েছে। এর ফলে একটা তর্কযুদ্ধ দানা বেঁধেছে। জগতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমালোচনার একটা পরোক্ষ প্রভাবও দৃষ্ট হয়। সমালোচনাকারীকে প্রতিরোধ করতে প্রবৃত্ত হলেও কিছুটা আত্মসমীক্ষার কাজে সকলেই অগ্রসর হয় এবং বিরোধীপক্ষের সমালোচনার আলোকে নিজেকে ঘাচাই করে দেখার ফলে বিলম্বে হলেও সমালোচনার পাত্র আত্মগত ক্রটি সম্বন্ধে সচেতন হয়। পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলে একের মানসিক প্রবণতা অপরের মধ্যে কিছুটা সংক্রমিত হতে বাধ্য; উদ্বেগ যদিও সেক্ষেত্রে প্রধানতঃ বিরোধিতা। যুক্তি ও বিশ্লেষণের যে ধারা চাৰ্বাক-বাদের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে তার প্রাবনে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের ক্ষেত্রও বহুলাংশে প্রাবিত। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে থাকলেও তাই এই দর্শনে যুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রমাণ ও প্রত্যয়ের বিচারে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ চাৰ্বাকের মত ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনেরও মাধ্যম হয়েছে।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের অতুসারী হিসাবে যে পূর্বমীমাংসা দর্শনের পরিচিতি সেই

মীমাংসার আচার্য কুমারিল ভট্টের মধ্যেই তর্কের প্রবণতা সমৃদ্ধিক। সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা। যে যে কারণে সমর্থনযোগ্য নয় সেই কারণগুলিকে তিনি বিভিন্ন ভাবে যুক্তি অবলম্বনে পরিস্ফুট করার প্রয়াস পেয়েছেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডন করার জন্য বেদকে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রতিপন্ন করার যে নৈয়ায়িকী প্রচেষ্টা তাকে প্রতিহত করার জন্যই কুমারিল ভট্টের এই উদ্দেশ্য। বুদ্ধের মধ্যে সর্বজ্ঞতা অনুসন্ধানের বৌদ্ধ প্রয়াসকেও কুমারিল প্রতিকূল করতে চান একই মনোভাবের সমর্থনে। এ প্রসঙ্গেও মীমাংসাকাচার্য যে যুক্তিজালের অবতারণা করেছেন তা আমাদের চার্বাক আশ্রিত যুক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ৩৩৪

শ্রুতিকে আশ্রয় করলেও ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিটি শাখা নিজস্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বকীয় চিন্তাধারার আশ্রয় নিয়েছে। যুক্তির আলোর বিচার করে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে, শ্রুতিকে যখন সে প্রমাণের পুরোভাগে আসন দিয়েছে, তখনও তার অবলম্বন যুক্তি। ভারতীয় চিন্তারাজ্যের এই প্রবণতাকে চার্বাকী চিন্তার পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

যুক্তির দর্শন যে নিজ ক্ষেত্রে কতখানি সূক্ষ্মতা অর্জন করতে পারে চার্বাকী গ্রন্থ ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ পার্শ্বে আমরা তা ধারণা করতে পারি। চার্বাক দর্শনের অগ্ন্যগ্ন গ্রন্থের অস্তিত্ব আমাদের কাছে অবলুপ্ত হলেও এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরিণত হেতুবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে এই জাতীয় চিন্তার দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট এবং এই পুস্তকটিকে কোন ক্রমেই একমাত্র অথবা আদি চার্বাকী প্রচেষ্টারূপে নির্দেশ করা চলে না। তাছাড়া, সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের অগ্ন্যগ্ন গ্রন্থে চার্বাকী যে মতবাদ উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুরূপ চার্বাকী চিন্তার সাক্ষ্য প্রকাশিত। এ বিষয় নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

যুক্তি বা তর্কের রাজ্যে চার্বাকী চিন্তার যথেষ্ট প্রসার থাকলেও সর্বাঙ্গিক বিচারে অগ্ন্যগ্ন দর্শনের পুরোভাগে চার্বাকের স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে না। চার্বাকী চিন্তা কোন নির্দিষ্ট মতবাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় না, অপরের মতকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেই তার পরিহৃষ্টি। ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ গ্রন্থে চার্বাকী চিন্তার এই প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরস্পরবিরোধী দুটি মতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা যখন পরস্পরের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত, চার্বাক জয়রাশির

আক্রমণের লক্ষ্য তখন বিরোধী মত দুটির প্রত্যেকটিই। প্রকৃতপক্ষে চাৰ্বাক প্রধানতঃ তর্কের দর্শন—তর্কই এখানে লক্ষ্য, অত্যান্ত দর্শনের মত স্থানিদিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমমাত্র নয়। তর্ক বা Logic-কে এভাবে একমাত্র প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে ত্রুটি আছে। তর্কের অহুশীলনে বুদ্ধির পরিতৃপ্তি হতে পারে বটে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অন্তরের বৃত্তকার প্রশমন হয় না। এই প্রসঙ্গে Radhakrishnan-এর বক্তব্যের উল্লেখ প্রয়োজন; Intellectual pugilism is not sufficient by itself. The zest of combat cannot feed the spirit of man. If we cannot establish through Logic the truth of anything, so much the worse for Logic. ৩৩৫

মানুষের স্বাধীন ক্রিয়াপদ্ধতিতে আরোপিত যে কোন বন্ধনের বিরুদ্ধে চাৰ্বাকী অভিযান রূপায়িত। বৈদিক বিধিনিষেধের নিগড় অপসারণের প্রচেষ্টায় এই মতবাদের সূচনা। বৈদিক যুগের আতিশয্যরোধ করার মধ্যে এই মতবাদের মূল নিহিত থাকায় বিপরীত গতিতে এর মধ্যেও আতিশয্যের প্রকাশ স্পষ্ট। মানুষের আচরণ বিধিতে কিছু বন্ধনের প্রয়োজন আছে, যা স্থূল বস্তুকেদ্রিক জগৎ থেকে তার দৃষ্টিকে অপসারিত করে আদর্শের রাজ্যে নিবদ্ধ করে। পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি নির্দেশনার মাধ্যমে ভারতের অধ্যাত্মদর্শন এই আদর্শের জগতের আভাস দেবার চেষ্টা করেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে চাৰ্বাক মতবাদ এই ধরনের সবকিছু ধারণাকেই অস্বীকার করেছে। ফলে চাৰ্বাক দর্শনে স্বাভাবিকভাবেই নীতির আদর্শ থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যেতে পারে এবং ‘চাৰ্বাক’ সংজ্ঞা প্রাথমিক পর্যায়ে যুক্তিবাদী মতবাদের প্রতিক্রিয়া হলেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশব্দ হিসাবে পরবর্তী যুগে ব্যবহৃত হয়েছে।

চাৰ্বাকী নীতি প্রধানতঃ প্রতিবেদাত্মক এবং নেতিবাচক হলেও প্রতিবেদের রূপ থেকে চাৰ্বাক দর্শনে একমাত্র ইতিবাচক কর্তব্যের ইঙ্গিত “যাবজ্জীবং সুখং জীবং” এই বাক্যাংশের মধ্যে আবিষ্কার করা যেতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা সুখভোগের দিকে, সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখকে উচ্ছেদ করা চিরদিনই তার প্রয়াসের অঙ্গ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দার্শনিক গোষ্ঠীর যাবতীয় প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যের রূপায়ণের পথেই প্রসারিত। চাৰ্বাকেতর ভারতীয় দর্শনের আচার্যরা যখন মোক্ষ বা নির্বাণের

নির্দেশনা দেন তখন স্রুথের পথরোধকারী দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকে উপলক্ষ্য করেই তাঁরা অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে বহুদূর প্রসারী। জন্ম-জন্মান্তরের স্রুথ দুঃখকে একত্র গ্রথিত করে সামগ্রিকভাবে দুঃখের উচ্ছেদ করতে তাঁরা উদ্যোগী। চার্বাকের দৃষ্টি আবদ্ধ নির্দিষ্ট জীবনের সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে, স্রুথভোগের আকাজক্ষাকে সে এই খণ্ডিত জীবনের পটভূমিতেই চরিতার্থ করার অভিলাষী। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের বৃহত্তর অংশ এই চার্বাকী চিন্তারই অংশীদার। মোক্ষ, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর বিষয়বস্তু এবং মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা বর্তমান জীবনকে সর্বতোভাবে স্রুথী করার প্রয়াসেই ব্যয়িত।

চার্বাক দর্শনে যদি উচ্ছৃঙ্খলতার কোন ইঙ্গিত থাকে তাহলে মানুষের স্রুথস্পৃহার এই সাধারণ স্বীকৃতির মধ্যে তাকে আবিষ্কার করা যাবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে জাগতিক সব কিছু কর্মোত্তমকেই উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। স্রুথস্পৃহার চরিতার্থতাকে কেন্দ্র করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনে কর্মোত্তমকে যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার আলোচনা আমরা আগেই করেছি। চার্বাকী এ কর্মোত্তম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। “সর্বদর্শনসংগ্রহ” ও অন্যান্য গ্রন্থে বস্তুবাদী চার্বাকদের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎ স্রুথের প্রতিশ্রুতি কোন ক্ষেত্রেই তাঁদের বর্তমান কর্মোত্তমের প্রতিবন্ধকতা করেনি। স্রুথ-দুঃখময় বর্তমানের সব রকম কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন—এ ব্যাপারে বাধার কোন সম্ভাবনা তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি।

উচ্ছৃঙ্খলতার যে অভিযোগ চার্বাক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার মূল চার্বাক দর্শনের বিদ্রোহাত্মক প্রবণতার মধ্যে অন্বেষণ করা উচিত। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষের স্রুথস্পৃহাকে সামগ্রিক ভাবে চরিতার্থ করতে গেলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষকে কোন না কোন নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ হতে হয়। যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব চার্বাক দর্শনের প্রাণ, বিশেষ কোন নিয়ম বা বন্ধনের স্বীকৃতি তার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। এই বিদ্রোহাত্মক বা প্রতিবেদাত্মক পটভূমিকায় মানুষের ভোগাকাজক্ষাকে অহুমোদনের প্রচেষ্টায় স্বভাবতঃ নীতিবোধবিহীন বিশেষ এক মতবাদের চেহারা পরিস্ফুট হয়। শৃঙ্খলাহীন নৈতিকতার উৎস এই উভয় ধারণার অন্তর্ভুক্ত সংমিশ্রণে। প্রকৃত পক্ষে বন্ধনবিহীন সম্পূর্ণ নেতিবাচক পটভূমিতে ভোগস্পৃহার চরিতার্থতা একমাত্র স্বীকৃতি পেলে দুর্নীতিপরায়ণতা তার মধ্যে আসতে বাধ্য। পরবর্তী যুগের লেখকেরা চার্বাকদের চরিত্রচিত্রণ করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়স্রুথ-পরায়ণ, নীতিবোধবিহীন ভোগোন্মত্ততার যে ছবি এঁকেছেন, তা কিছুটা অতিরঞ্জিত

হলেও সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য নয় এবং এর মূল চার্বাক দর্শনের নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত।

চার্বাক দর্শনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ প্রধানতঃ দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। প্রথমটি নেতিবাচক। অপরের দ্বারা সাধারণভাবে স্বীকৃত সব কিছু ধারণার বিরোধিতার মধ্যেই এটির রূপায়ণ। যুক্তি বা তর্ক এক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের অবলম্বন এবং যুক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রকাশিত। চার্বাক দর্শনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় ধারা সূত্রের অধেষণাকে কেন্দ্র করে এবং বোধ হয় উক্তর যুগের চার্বাকী মতবাদে এই ধারাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। চার্বাক দর্শনের প্রাথমিক এবং মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্য এ যুগে অবলুপ্ত হয়নি এবং প্রথম ধারার পটভূমিতে দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্তির ফলে দর্শনটি বহুক্ষেত্রে সংযমহীনতার পরিচায়ক হয়েছে।

উক্তরযুগের চার্বাকী ভোগবাদী নৈতিকতা সাধারণ মানুষের স্থূল মানসিকতার শাস্ত্য বহন করে এবং বোধহয় চার্বাকদের এই ভোগানুরক্তিকে কেন্দ্র করেই অনেকে ধারণা করেন যে চার্বাক দর্শনে সাধারণ মানুষের ভোগ সূত্রের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত এবং এই দর্শনটির মধ্য দিয়ে আমরা জনসাধারণের চিন্তাধারার পরিচয় পাই। চার্বাক দর্শনকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে কিন্তু দর্শনটির সম্বন্ধে ঐ ধরনের মন্তব্য করা চলে না। আমরা দেখেছি যে চার্বাক দর্শনের মূল হেতুবাদে নিহিত, যুক্তির পরিপন্থী অন্ধ বিশ্বাস চার্বাক সিদ্ধান্তে কোন দিন স্থান পায়নি। সাধারণ মানুষের জীবনধারা পর্যালোচনা করলে কিন্তু দেখা যায় যে সেখানে বিশ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তির পথ-রোধে সচেষ্ট। বিভিন্ন ছবিপাকের প্রতিবেদক হিসাবে দৈব প্রতিকারে বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়। ঐ জাতীয় বিশ্বাসের সঙ্গে চার্বাকী মূল নীতির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে ‘চার্বাক’ ও ‘লোকায়ত’—একই দার্শনিকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য প্রযুক্ত দুটি বিভিন্ন সংজ্ঞার গুণরত্নকৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ প্রয়োজন। ৩৩৬ চার্বাকগোষ্ঠীর ‘লোকায়ত’ নামের কারণ হিসাবে তিনি এই সম্প্রদায়ের লোকদের বিচারবিহীন সাধারণ লোকের মত আচরণের নিদর্শন দেখান। চার্বাকী স্থূল ভোগপ্রবণতা সম্ভবতঃ তাঁকে এই জাতীয় মন্তব্যে উৎসাহিত করেছে। ‘চার্বাক’ এই সংজ্ঞাটিকেও গুণরত্ন ব্যাখ্যা

৩৩৬। ‘চর্যয়ন্তি ভক্ষয়ন্তি তদ্বতঃ ন মনস্তে পূত্ৰপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্বাকাঃ • লোকা নির্বিচারঃ সামান্য লোকাভ্যুদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি’, তর্করহস্যদীপিকা, পৃ: ৩০০

করেছেন কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে। তাঁর মতে পাপ-পুণ্য, পরোক বস্তুজাত ইত্যাদিকে চর্চন অথবা ভক্ষণ করার জন্য এই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা 'চার্বাক' আখ্যায় অভিহিত। কষ্টকল্পিত হলেও গুণরত্নের এই ব্যাখ্যা চার্বাক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ নেতিবাচকতার রূপ সুপরিষ্কৃত করেছে।

ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের বস্তুধর্মী প্রকৃতির উপর অনেক সময় প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের 'প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব জগৎটাকে ছেড়ে মানুষের অধ্যাত্ম জগৎটির দিকেই মনোযোগ দেবার চেষ্টা।' ৩৩৭ তাই লোকায়ত দর্শনের বস্তুধর্মী চেহারার পরিচয় দিতে গিয়ে এই অধ্যাত্মজগৎ ছাড়াও যে বস্তুজগতের দিকে এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতীয় দর্শনের নজর আছে, তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। ভারতের অধ্যাত্ম দর্শন যে অধ্যাত্ম জগতের অভিমুখী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তব বা ভোগাত্মক জগৎও এই দর্শনের কাছে উপেক্ষণীয় নয়, এই বাস্তব জগতেরই বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে নানাভাবে নিয়মিত করে অধ্যাত্ম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা আধ্যাত্ম দর্শনে দেখা যায়। কর্ম বা কর্মফলের উপর প্রাধান্য ভারতীয় দর্শনে দেওয়া হয়েছে এই কারণেই। অপর পক্ষে চার্বাক দর্শনের রূপায়ণ যে সব সময়েই বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করে হয়নি, চার্বাকী গ্রন্থ 'ভ্রমোপপ্লবসিংহ' তার সাক্ষ্য বহন করে।

৩৩৭। লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা: ৫৮-৯



সংক্ষেপিকা

প্রচ	...	প্রবোধচন্দ্রোদয়
শাঙা	...	শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসীমাংসাস্থত্বের শাৰীৰিক ভাষ্য
যল	...	যড়্ দৰ্শনসমূচয়
সসং	...	সৰ্বদৰ্শনসংগ্রহ
ERE	...	ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS
HIL	...	HISTORY OF INDIAN LITERATURE
HIP	...	HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY
IP	...	INDIAN PHILOSOPHY

সংশোধন

পৃঃ	পং	আছে	হবে
৩	১০	ইহাৰ	এৰ
৫	১৭	লোকায়েত	লোকায়ত
১২	৮	ষে	সে
১৩	৭	এতং	এ
১৬	২	কঠোপানিষদের	কঠোপনিষদের
৩৭	৬	হতে	হয়ে
৫৪	২	আসক্তি	আসক্তি
৭৪	৫	অকাৰ্যকৰিতার	অকাৰ্যকাৰিতার
৮৩	১৭	ব্যাপকতা	ব্যাপকতা
৮৪	২৩	সামন্তকে	সামান্তকে
৯৬	৪	লোকয়ত	লোকায়ত
১১২	পাদটীকা পং ১	জীবেদনং	জীবেদনং
-	-	যুজ্	যুজ্

নিৰ্দেশিকা

অ—হ

অজিত কেশকঞ্চলী, ১৬ পৃ, ৩৫	উজ্জ্বাতকর, ৮৭
অথর্ববেদ, ১২১	উপাধি, ৮৩
অদৃষ্ট, ২, ৫২ পৃ, ৫৫, ৬৭, ৮৬	ঋগ্বেদ, ২২, ৩২ পৃ, ১২১
অষ্টমত বেদান্ত, ৩৭, ৭৬, ১০৫	ঐতরেয় উপনিষদ, ১৫
অধর্ম, ৫৩, ৫৫, ৮৬	কঠোপনিষদ, ১৬
অধ্যাত্ম, ১৫, ৪৪, ৫০ পৃ, ৫৫ পৃ, ৬১, ৭৫, ৮৬, ৯২, ৯৯, ১১৭	কমলশীল, ২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৫৭, ৭৭, ৮২, ৯৭ পৃ, ১১১
অনিরুদ্ধ, ৬০	কঞ্চলাশ্বতর, ৩৫ পৃ, ৯৯
অহুমান, ৩৩ পৃ, ৫৭ পৃ, ৬০, ৭৭ পৃ, ১১০, ১১৬	কর্মফল, ১২ পৃ, ১৭, ৩৭, ৫২, ১১৫
অপূর্ব, ৫৩	কর্মফলবাদ, ১৩, ৫২, ৫৫, ৬১, ১১৪ পৃ
অভিনিবেশ, ৫৪	কর্মাশয়, ৫৩ পৃ
অমরকোষ, ৭, ২৭	কাম, ১১২ পৃ
অমর সিংহ, ৭	কামসূত্র, ১১৭ ১২০
অর্থশাস্ত্র, ২০ পৃ, ২৩, ১২৫	কার্যকারণতাব, ৮৪ পৃ, ৮৮, ৯৮
অশ্বর, ১৪ পৃ	কুমারিল, ৪৪, ৬০, ৬২
অস্মিতা, ৫৪	কুল্লুক ভট্ট, ২৮, ৩০
আত্মা. ১৫ পৃ, ৩৮, ৪৬ পৃ, ৫১ পৃ, ৫৫, ৬৭, ৭৫, ৯২ পৃ, ১১৫	কেশকঞ্চলী, ১৭
আত্মিকী, ২০ পৃ, ২২ পৃ, ২৭ পৃ, ৭২	কেমী, ১৭
আপ্তবাক্য, ৬০ পৃ, ৭৩ পৃ, ৮২	ক্লেশ, ৫৪
আন্তিক, ৮ পৃ, ৫২, ৬১, ৬৩	কোটিল্য, ২০ পৃ, ২৩, ২৬
আন্তিকবাদ, ১০	খণ্ডনখণ্ডান্তম্. ৩৪
ইন্দ্র, ১৫, ১২২	গীতা, ১৪
ঈশ্বর, ১২ পৃ, ৪১, ৬১ পৃ, ১১৫	গৌতম, ৬২, ৭৮
ঈশ্বর প্রাণিধান, ৬৫	গৌতম ধর্মসূত্র, ২৯
ঈশ্বরবাদ, ৬১	গৌতম বুদ্ধ, ৪৫ পৃ
উদয়ন, ৮৭	চাৰ্বাক (গোষ্ঠী), ১, ৭, ৩৫ পৃ, ৫৭, ৬৮ পৃ, ৭৫ পৃ
	চাৰ্বাক (ব্যক্তি বিশেষ), ৩, ৩১, ১৮ পৃ

চাৰ্বাক (মতবাদ), ২ পৃ, ৬, ৮, ১৪ পৃপৃ,

৭৫ পৃপৃ, ১২৭ পৃপৃ

চাৰ্বাক (মতাম্বুসারী), ৩৫, ৩৮, ৪১ পৃ,

৭১, ৭৫ পৃপৃ,

১২৮ পৃপৃ

চাৰ্বাকপন্থী, ১৫, ৩১

চাৰ্বাকী, ১ পৃ, ১১, ১৪ পৃপৃ, ৩৩ পৃপৃ

৭৫ পৃপৃ, ১২৮ পৃপৃ

চাৰ্বাক সূত্র, ৫, ৩৮

চৈতন্য, ১৫, ৩৫, ৩৮, ৪৮ পৃ, ৫১, ২৪

পৃপৃ, ১০৩ পৃপৃ

ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১৪ পৃপৃ, ১২৫

জ্যাম্বন্তর, ৫২, ৬৭

জ্যাম্বন্তরবাদ, ৫২, ১১১, ১১৩ পৃ

জয়ন্ত ভট্ট, ২, ৫, ৩২ পৃপৃ, ৬২ পৃ, ৭৫,

৮১, ৮৪, ৯০, ১০৬, ১১০

জয়রাশি ভট্ট, ৪, ৩৬, ৭১, ৭৫, ৮০

জল্ল, ২১

জাবালি, ১১, ৩১

জৈন, ২, ১০, ১৭, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৭,

৫২, ৫৫ পৃ, ৫২, ৬১, ১২৩ পৃ

জৈমিনি, ৬২

তত্ত্বসংগ্রহ, ২, ১০, ২২, ১১১

তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ২, ৫, ৩৬, ৩৮, ৬২,

২২

তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, ১, ৪ পৃ, ২০, ৩৩ পৃপৃ,

৪৩, ৬৭, ৭০ পৃপৃ, ৮৪,

১১২ পৃ

তন্মাত্র, ২৩

তীর্থঙ্কর, ৪৭, ৫৮, ৬৭

ত্রয়ী, ২০, ১২১

দণ্ডনীতি, ২০ পৃ

দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ৭, ২৪, ২৬, ২৯

৩২, ৪১

দিব্যাবদান, ২৪

দুৰ্যোধন, ১২, ১৮

দেহাত্মবাদ, ১৫, ৩৫, ২১ পৃপৃ

দ্বৈষ, ৫৪

দ্রোণদী, ১২ পৃ, ১২ পৃ

ধর্ম, ১২ পৃ, ৫২ পৃ, ৫৫ পৃ, ৮৬, ১১২ পৃপৃ

ধারণা, ৬৪ পৃ

ধান, ৬৪

নাস্তিক, ৮ পৃপৃ, ২৮ পৃ, ৩১, ৩৩, ৩৫,

৪৪, ৫২, ৬১, ১১৬

নাস্তিকবাদ, ৮ পৃপৃ, ২০, ৩৪

নির্বাপ, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৫৬

নৈয়ায়িক, ৪৮, ১০৩

ন্যায়, ২, ২৫, ৪৪, ৪২, ৫২, ৫৬ পৃ, ৫২,

৬২, ৬৫, ৭৩, ৭৫

ন্যায় পরিশুদ্ধি, ২০

ন্যায়বাস্তবিক, ৮৭

ন্যায়ভাস্কর, ২৮, ২১

ন্যায়মঞ্জরী, ২, ৫, ২৮, ৩০, ৩২ পৃপৃ, ৬২,

৭১, ৮১, ৮৪, ৯০, ৯৬, ১০৬,

১১২

ন্যায়সূত্র, ২৫, ৪২, ৭২, ৭৪, ৭৮, ৮৬

পঞ্চপাণ্ডব, ১২

পঞ্চশিখ, ১৪

পতঞ্জলি, ৮ পৃ, ২৪

পরলোক, ২ পৃ, ৪১, ১১০

পানিনি, ৮ পৃ	বৃহস্পতি ৩, ৫ পৃপৃ, ১৪, ১২ পৃপৃ,
পান্নাসি, ১৭	৩১ পৃ
পূৰ্ণস্বর, ৩৬, ৩৮, ৪১, ২০, ১১৬	বৃহস্পতি সূত্র, ৩৪
পূৰ্ণ, ৫৬	বেদ, ২ পৃ, ১৪, ১৬, ২০ পৃ, ২৩, ২৮,
পূৰ্ণার্থ, ১১২	৩৩, ৪৩, ৫৮ পৃ, ১২১ পৃপৃ
প্রকৃতি, ৫৬	বেদান্তদৈশিক, ৬২
প্রজাপতি, ১৫	বেদান্তসার, ৩৮, ১০৭
প্রত্যক্ষ ১১, ৩৩, পৃপৃ, ৪০, ৫৭ পৃপৃ,	বৈদিক, ২, ১২, ১৬, ২৩, ২৭ পৃপৃ,
৬৭ পৃপৃ, ৮২ পৃপৃ, ১১০, ১১৬	৪৫ পৃ, ৬০, ১২১ পৃপৃ
প্রত্যক্ষগ্রহণবাদী, ৬৭ পৃ ৭৬ পৃ	বৈশেষিক, ৪৪, ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৫
প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২ পৃ, ৬, ২০	বৈশেষিক সূত্র, ৬২
প্রভাকর, ৪৪, ৬২	বৈষ্ণব, ৬৬
গ্রহণ, ৫৭ পৃপৃ, ৬৭ পৃপৃ, ৭৪	বোধিসত্ত্ব, ৫২
বস্তুবাদ, ১৭, ৩৬, ৪৩, ৫৬, ৭৫, ১১৫	বৌদ্ধ, ২, ১০, ২৬, ২২ পৃ, ৩২, ৩৫, ৩৭,
বাচস্পতি, ৪, ৬, ২২	৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫১ পৃ, ৫৫ পৃ, ৫৯,
বাৎস্তায়ন (কামসূত্রকার) ১১৭	৬০ পৃ, ৭৫ পৃ, ৯২, ১২৬ পৃ
বাৎস্তায়ন (ন্যায়ভাষ্যকার), ২৭, ৮৬,	ব্যাখ্যি, ৭৮ পৃপৃ
১০৪ পৃ	ব্যাস, ২২
বার্তা ২০ পৃ	ব্রহ্মজ্ঞান, ১২৫
বাহুস্পত্য, ৩, ৬, ১২ পৃপৃ, ৩১ পৃ	ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১০৩, ১০৭
বিজ্ঞান, ২২ পৃপৃ, ১১১ পৃপৃ	ব্রহ্মা, ১৮
বিজ্ঞানভিদ্ধ, ৩৬, ৪৮, ১০৫	ব্রাহ্মণ্য, ১১, ২৩ পৃ, ২৬, ২৯
বিজ্ঞানসম্বতি, ১১১ পৃপৃ	ভরত, ১১
বিতণ্ডা, ২২, ২৫, ৭৪	ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র, ৬৭
বিজ্ঞানন্দী, ৭৬	ভট্টাচার্য বিনয়তোষ, ৩৫
বিরেকথ্যাতি, ৫৫	ভট্টোজী দীক্ষিত, ২
বিরোচন, ১৫	ভাগবত পুরাণ, ২৮
বুদ্ধধোষ, ২৫	ভাণ্ডারি, ২৪
বুদ্ধদেব, ১১, ১৬, ৩৫, ৪৬ পৃ, ৫৬	ভূতচৈতন্যবাদ, ২১ পৃপৃ, ১০৬ পৃ
বুদ্ধদায়ন্যক উপনিষদ, ১৫	মহু, ২, ৩১

মহুসংহিতা, ২, ২৭ পৃপৃ	লক্ষণসার, ৩৫
মহাভারত, ১২ পৃপৃ, ১৮ পৃ, ২৬ পৃ, ৩১, ৬৪	লোকায়ত. ৩, ৫ পৃপৃ ১০, ২১ পৃপৃ, ৩১, ৩৩
মহাবীর, ৪১, ৪৭	লোকায়ত সূত্র, ৫, ৬৮, ৭৭
মহাভাষ্য, ৮ পৃ, ২৪	শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২২ পৃ
মহাভূত, ১৭, ২১ পৃপৃ	শঙ্করাচার্য, ২, ২২, ৪২, ৮৯, ১০৩, ১০৫ পৃপৃ
মাধবাচার্য, ২, ৫, ৮, ১০, ৪৪	শঙ্ক, ৫৮ পৃ, ৬৬
মায়ামোহ, ৬	শান্তরক্ষিত, ২, ৩৫, ২২ পৃপৃ, ১১১
মীমাংসক, ৫২	শাস্ত্রী, দক্ষিণারম্ভন, ২২, ৩২
মীমাংসা, ৪৪, ৫৩, ৫৬, ৫৭ পৃ	শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, ৪২
মীমাংসা সূত্র, ৬২	শূন্যবাদ, ৩৭
মুক্তক উপনিষদ, ১২৫	শৈব, ৬৫
মেধাতিথি, ২ পৃ, ২৮, ৩০	শ্রীকৃষ্ণ, ১৮
মৈত্রেয়গীয়া উপনিষদ, ৬, ১৫ পৃ	শ্রীধরস্বামী, ১৫
মৈত্রেয়ী, ৪৩	শ্রীমচ্ছঙ্করদ্বিজয়, ৪২
মোক্ষ, ১২, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫৩ পৃপৃ, ১১৫	শ্রীহৰ্ষ, ৩৪ পৃ
১১২	শ্রুতি, ৫৮ পৃ, ৬৬ পৃ, ১২৮
যজুৰ্বেদ, ১২১	ষড়্ দৰ্শনসংমুচ্চয়, ২, ৭, ৬৮
যজ্ঞ, ১৩, ১৬, ১২২ পৃপৃ	সদানন্দ, ৩৮, ১০৭
যাগযজ্ঞ, ১০, ৪৫, ১২৫	সমাধি, ৬৫
যাজক, ১২৩ পৃ	সৰ্বদৰ্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ২, ১১, ৮৬, ৯৬
যুধিষ্ঠির, ১২ পৃ, ১৮	সৰ্বদৰ্শনসংগ্রহ, ২ পৃ, ৮, ২৪, ৪৪, ৭২, ৮১, ৮২, ১১৭ পৃ
যোগ, ২৩, ৪৪, ৪৮ পৃ, ৫৩ পৃ, ৫৬, ৫৯, ৬৩ পৃ	সৰ্বমতসংগ্রহ, ২, ৭
যোগভাষ্য, ৫৩	সামবেদ, ১২১
যোগসূত্র, ৫৩, ৫৫	সাংখ্য, ২৩, ৪৪, ৪৮ পৃ, ৫৬, ৫৯, ৬৩
যোগাক, ৬৪ পৃ	সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৪৮
রাগ, ৫৪	সূত্রকৃতাক, ১৭
রাম, ১১	অশিক্ষিত (চাৰ্বাক), ৩২ পৃপৃ, ১১০
রামায়ণ, ১১ পৃ, ১৪, ১৮, ৩১	

স্বভাববাদ, ৭৭, ৮৫ পৃ

হৰিভদ্র স্মৃতি, ২, ৭ পৃ, ১০

হেতু, ২৬, ২০, ২২ পৃ, ৭৮

হেতুবাদ, ২২, ২৬ পৃ ৭৪, ৭৬, ৯১,
১১৬

A—Z

Cowell, ২৪

Dauids Rhys, ২৪

Farquhar, ৬৬

Frauwallner, Erich, ৪২

Plato, ৭৭

Radhakrishnan, ৪৫, ১২৩

Raju, P. T., ৭

Thomas, F. W., ১৯

Vallee Poussin, Louis de la,

৩১

Winternitz, ৪৩

গ্ৰন্থপঞ্জি

১। সংস্কৃত ৰচনা

শতপথ ব্ৰাহ্মণ

কঠোপনিষদ, বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিৰীয় উপনিষদ,

মুণ্ডক উপনিষদ, মৈত্ৰায়ণীয় উপনিষদ

সাংখ্যদৰ্শনম্—কালীবৰ বেদান্তবাগীশ

পাতঞ্জলদৰ্শনম্—কালীবৰ বেদান্তবাগীশ

AMARAKOSA (Kashi Sanskrit Series), Varanasi, 1970

ARTHASASTRA (Kautilya), Bombay, 1960

BHAGAVADGITA, Poona, 1909

BRAHMASUTRA of Badrayana with commentary of
Samkaracarya and Ramanuja (SBE),
1890—1904

KAMASUTRA of Vatsyayana, Benares

KHANDANAKHANDAKHADYAM of Sri Harsa

MAHABHARATA, Poona, 1929-30

MAHABHASYA (Patanjali), Bombay, 1906

MANAVA DHARMASASTRA, Bombay, 1929

NYAYAKUSUMANJALI (Udayana), Benares, 1912

NYAYAMANJARI (Jayanta Bhatta), Benares, 1936
(Kashi Sanskrit Series, No. 106)

NYAYAPARISUDDHI (Chowkhamba)

NYAYASUTRA with Vatsyayana's Bhasya, Poona, 1939

PRABODHACANDRODAYAM (Kṛṣṇa Misra), Benares,
1955

SARVADARSANASAMGRAHA of Sayana.-Madhava
(Govt. Oriental series
vol. I) Poona, 1924

SARVAMATASAMGRAHA (ed, Mm. T. Ganapati
Sastri), Trivandrum, 1918

SARVA-SIDDHANTA-SAMGRAHA, (ed, Prem Sundar Bose) Calcutta, 1929

SLOKAVARTTIKA (ed, Rama Sastri), Chowkhamba Sans. Series, 1898

TATTVARTHA-SLOKAVARTIKA of Vidyanandin (Gandhi Natharanga Jaina Grantha Mala)

TATTVASAMGRAHA of Santaraksita with **TATTVA-SAMGRAHAPANJIKA** of Kamalasila (Gaekwar Oriental Series, vol. xxx)

TATTVOPAPLAVASIMHA of Jayarasi Bhatta (Gaekwar Oriental Series)

VEDANTASARA of Sadananda, Srirangam, 1911

VIJNANAMRTABHASYA of Vijnanabhiksu, Chowkhamba, Benares (on Brahma-mimamsasutra)

২। আধুনিক রচনা।

চাৰ্বাক দৰ্শন—শ্ৰীদক্ষিণাৱৰ্ত্তন শাস্ত্ৰী, কলিকাতা।

ন্যায়দৰ্শন—শ্ৰীকৃষ্ণময় ভট্টাচাৰ্য (বিশ্ববিদ্যালয়-গ্ৰন্থ)

ভাৰতদৰ্শনসংগ্ৰহ—শ্ৰীউমেশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য (লোকশিক্ষা গ্ৰন্থমালা)

Barua, B. M., **A HISTORY OF PRE-BUDDHISTIC INDIAN PHILOSOPHY**, Calcutta, 1921

Bhattacharya, K. C., **STUDIES IN PHILOSOPHY**, vol. i
Brahma, N. K., **PHILOSOPHY OF HINDU SADHANA**,
Calcutta, 1932

Dasgupta Surendranath, **A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY**. vols. I, iii & iv
Cambridge, 1921-55

- Davids, Rhys, **DIALOGUES OF THE BUDDHA**, vol. i
 Farquhar, J. N., **AN OUTLINE OF THE RELIGIOUS
 LITERATURE OF INDIA**, Oxford,
 1920
- Frauwallner, Erich, **HISTORY OF INDIAN PHILO-
 SOPHY**, vol. ii
- Ghosal, U. N., **A HISTORY OF POLITICAL IDEAS**,
 Oxford Press, 1966
- Hiriyanna, **OUTLINES OF INDIAN PHILOSOPHY**, vol.
 Hopkins, E. W., **THE GREAT EPIC OF INDIA**,
 Calcutta, 1969
- Keith, A. B., **A HISTORY OF SANSKRIT LITERA-
 TURE**, Oxford, 1928
- Kierman, Thomas P., **ARISTOTLE DICTIONARY**, New
 York, 1962
- Monahan, F. J., **THE EARLY HISTORY OF BENGAL**,
 Varanasi, 1974
- Radhakrishnan S., **INDIAN PHILOSOPHY**, vols. i & ii,
 London, 1966
- Raju, P. T., **THE PHILOSOPHICAL TRADITIONS OF
 INDIA**, London, 1971
- Shastri, H. P., **LOKAYATA**, Dacca, 1925
- Stockhammer, Moris, **PLATO DICTIONARY**, London,
 1963
- Tiwari, B. G., **SECULARISM AND MATERIALISM IN
 MODERN INDIA**, Jabalpur
- Winternitz, M., **A HISTORY OF INDIAN LITERA-
 TURE**, vol. i, Calcutta, 1927